ভাই মনা,

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা কাব্যে সুকান্তের স্থান

উত্তর-কৈশোর ও প্রাক্-যৌবনের সন্ধিকালে একালের অন্যতম জনপ্রিয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। মৃত্যুর পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই তিনটি দশক কবির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা কোন কালে কোন সমাজেই স্রষ্টার মৃত্যু বয়সের হিসেবে বা জীবৎকালের সীমানা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। স্রষ্টার মৃত্যু তখনই অনিবার্য হয়ে যায় যখন সমাজ ও জীবন ধারা সৃষ্টির দর্পণে দূরলক্ষ্য বা অলক্ষ্য হয়ে ওঠে। নিয়ত পরিবর্তনশীল, অগ্রগতির ভেলায় ভেসেচলা জীবন ও সমাজ নিত্য জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে স্রষ্টার সৃষ্টিকে হৃদয়ের অতি নিকটে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো পরম নির্ভরতায় যদি না পায় তাহলে সে সৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট কাল ও যুগে মূল্যবান হয়ে উঠলেও কালান্তরে বিবর্ণ মৃত শবে পরিণত হয়। গবেষকের গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, সমালোচকের বিদগ্ধ অভিজ্ঞান-পত্র জনমানসে অপস্রিয়মাণ সেই সৃষ্টিতে পারে না প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে। পণ্ডিতের অহমিকা ও সাধারণ রস ভোক্তার সংবেদনশীলতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তাই অনেক সময় দেখা যায় পণ্ডিতের জ্ঞানলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েও বহু সৃষ্টি জনমানসের প্রিয় সামগ্রী হয়ে রয়েছে। 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা না হলে ব্যর্থ হয় গানের পসরা' বিশ্ব কবির এই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত উপলব্ধিই সবচেয়ে বড় সত্য। 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা'র কষ্টি পাথরেই শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যায়ন, কাল থেকে কালান্তরে উত্তরণের এটাই শর্ত। কোন স্রষ্টার পক্ষেই এই শর্ত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

সুকান্তের সৃষ্টি ধারা একুশ বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তী তিন দশক ব্যাপী তাঁর কবিতাগুলি যেন সহস্রবার লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে পুনর্লিখিত হয়ে চলেছে গভীর ভালবাসায়, ক্ষত বিক্ষত জীবনের রক্তাক্ষরে। জীবৎকালে ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর কবিতাগুলির উৎকর্ষ বিচার হতো বয়সের মাপকাঠিতে, সেখানে সস্নেহ প্রশ্রয়ের অভিভাবকসুলভ মনোভাব প্রাধান্য পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ একুশ বছরের কবি সুকান্ত সৃষ্টির উৎকর্ষ বিচারে, সহৃদয় সংবেদনশীলতায় তাঁর সমকালীন অগ্রজদের মাথা

ছাপিয়ে জনপ্রিয়তার অনেক উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত। বয়সটা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ আজ অর্থহীন কেননা নিজের জোরেই সুকান্তের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী আসন অধিকার করে আছে। সুকান্ত-কাব্য আজ বাংলার ঘরে ঘরে, মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে, সংগ্রামী জনগণের মিছিলে মিছিলে পরিব্যাপ্ত।

আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতে আজ সুস্পষ্ট তিনটি স্তম্ভ তিনটি বিশেষ কালের সমগ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিবাচক ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন শোষিত মানুষের মুক্তির আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করেছে সেই সময়ের অগ্রপথিক কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুস্পষ্ট শ্রেণী সংঘর্ষের পটভূমিতে বিপ্লবী দর্শন ভিত্তিক সংগ্রামের কালের সার্থক প্রতিনিধি কবি সুকান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই একশো বছরের বাংলা কাব্য ধারায় এই তিনটি স্তম্ভ নিঃসন্দেহে যেমন কাল পরিমাপক তেমনি দিক্ নির্দেশক। এ বক্তব্যে হয়তো কারও কারও আপত্তি হতে পারে। বিশেষ করে তথাকথিত বিদগ্ধ সমালোচকদের কেউ কেউ নজরুল ও সুকান্তকে উপরোক্ত স্থান দিতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা নজরুলকে শিল্পমূল্য বিচারে এবং সুকান্তকে রাজনৈতিক কবি ও স্বল্পবয়স্ক বলে বাতিল করতে চান। এমন কি এও দেখা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত আধুনিক বাংলা কাব্য বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থে কবি সুকান্তের নামটি পর্যন্ত অনুল্লিখিত থাকে। আবার এটাও ঘটনা রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ও সুকান্তের উপর যত বেশী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে এমনটি আর কোন কবির সম্পর্কেই হয় নি। বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে, অফিসে-দপ্তরে, সাধারণ মানুষের মধ্যে নজরুল ও সুকান্ত সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাও গভীরভাবে অভিনিবেশের দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে অনেক তো শ্রদ্ধেয় কবি রয়েছেন কিন্তু জয়ন্তী ও স্মরণ অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রগণ্য স্থান রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তের। কাব্যগ্রন্থ বিক্রীর ক্ষেত্রে ও আবৃত্তির আসরেও এই তিন কবিরই শীর্ষস্থান। এক কথায় বাংলা কবিতার পাঠক ও অনুরাগীদের নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের পরে দুটি বিশিষ্ট স্থান নজরুল ও সুকান্তের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তার অর্থ এ নয় যে মধ্যবর্তী অন্যান্য কবিরা শ্রদ্ধার আসন থেকে বঞ্চিত। যথাযোগ্য সম্মান দিতে বাঙালী পাঠক কখনও কুণ্ঠিত নন তথাপি এই তিন জনের প্রতিই তাদের হৃদয়াবেগ স্বতোৎসারিত। কোন পণ্ডিত সমালোচক

হয়তো এরজন্য বাঙালী পাঠকের অশিক্ষিত মনস্কতার প্রতি কটাক্ষ করবেন। কিন্তু পাঠক সমাজের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; তাদের হৃদয় দুয়ার খোলা সেখানে। যে স্রষ্টারা ঢেউ তোলেন, আবেগ সৃষ্টি করেন, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের ছবি আঁকেন, জীবনে আশার সুর ধ্বনিত করেন; পাঠকের সমস্ত ভালবাসা তাঁদের প্রতি ধাবিত, এমনকি পুজো করতেও কুণ্ঠা নেই।

পাঠকের একটিই দাবী, কবি হবেন **unacknowledged legislator of the world,** আর কবির সৃষ্টি **must form a bridge of communication between himself and his reader**। তাই কবিতা হল কবি ও পাঠকের দুটি হৃদয়ের ভাব সেতু। কবিতার বিষয় মানুষ, মানুষের প্রেম, ভালবাসা, যন্ত্রণা, সংশয় ও সংগ্রাম। কবি অলৌকিক জগত থেকে আগন্তুক নন, তাঁর বসবাস জনগণের পনেরো আনা অংশের পাড়ায় পাড়ায়। সামন্ত যুগে যেমন সভাকবির ফরমায়েসী কাব্য ছিল তেমনি আবার গীতাশ্রয়ী কবিতা সহজ আবেগে আবৃত্তি হতো গণজীবনের ঘাট চালায়। ইতোমধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে মুদ্রণ যন্ত্রের আশীর্বাদে কবির কণ্ঠ ও পুঁথি থেকে কাব্য যন্ত্রস্থ হয়েছে, পাকা হরফে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। পঞ্চানন কর্মকারের ছেনি ও হাতুড়ির গুতোয় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ যেমন এর দ্বারা লাভবান হলেন তেমনি আবার জনগণের এক বিরাট নিরক্ষর অংশ বঞ্চিত হলেন কাব্যরস থেকে, কবিতা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। পাচালী, কথকতা, সুর করে গ্রাম সভায় কাব্য পাঠ ধীরে ধীরে অনাগরিক ব্যাপার বলে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগলো। উন্মেষশালী ধনতান্ত্রিক সমাজে কবির সামাজিক ভিত্তি বদলেছে, কবি তাঁর পণ্য নিয়ে খোলাবাজারে বিক্রয়ার্থী। কাব্য পণ্য হয়েছে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ কাব্য চর্চায় অধিকার লাভ করেছে, তাদের ঐশ্বর্য কবিয়ালদের সৃষ্টির প্রতি নাগরিক উপেক্ষা এনে দিয়েছে।

অবশ্য চিত্রের অপর দিকও রয়েছে, সেখানেও ঘটেছে মৌলিক পরিবর্তন। কবিতায় জনগণের অধিকার ও দাবী কিন্তু ভিন্নভাবে সম্প্রসারিতও হয়েছে। ধনতান্ত্রিক যুগে শ্রেণী স্বার্থবোধ বেশী করে জনগণকে দুই মেরুতে ঠেলে দিয়েছে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিরোধমূলকতা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত মানুষেরা সংগঠিত হচ্ছে। সমাজ-জীবনের এই অস্থিরতা কবি-শিল্পীকে বিচ্ছিন্নতার স্বেচ্ছানির্মিত গৃহকোণে শুধুমাত্র বাতায়ন নির্ভর হয়ে থাকতে দিচ্ছে না।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজস্থিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দাবীগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের মানসভূমিতে ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিল। ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে য়ুরোপীয় সাজসজ্জায় সযত্নে গড়ে তোলা কবির আশৈশব মানসলোক অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়ে গেল কবির যৌবনে। 'মানসী'কে ছুটি দিয়ে কবি সংসারের তীরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আবেদন করলেন তাঁর জীবন দেবতার কাছে :

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।" (এবার ফিরাও মোরে। চিত্রা)

পারিবারিক জমিদারী পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে কবি পা দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের গ্রামের মাটিতে। নবজাগরণের পটভূমিতে গড়ে ওঠা কবির উদার—চৈতন্য নিরন্ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হৃতশ্রী গ্রাম বাংলার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এক নতুন দায়িত্ববোধে উদ্বোধিত হয়ে উঠলো। কবি ঘোষণা করলেন :

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।" (ঐ)

অনুভবে চাওয়া এবং সামগ্রিকভাবে অঙ্গীকার পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা—এর মধ্যে বহু বিস্তৃত বন্ধুর পথ, বিশেষতঃ সেই যুগে যখন যুগটাই শ্লথগতি সম্পন্ন। কিন্তু কবির মনে গভীর আকুতি, অপরিচিত সংসার জগতে মানুষের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করবেন, তাদের কাছে বিশ্বস্ত হবেন। তাই তাঁর শুভযাত্রা জনতার মাঝখানে—

"...বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।—কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও?

আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।" (ঐ)

ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথপদ দ্বন্দ্বগুলি রবীন্দ্র-মানসে জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধাক্কায় শেষ দুটি দশকে সুস্পষ্ট চরিত্র গ্রহণ করেছিল। শেষ জীবনে কবি যেমন ধনিক সভ্যতার সৃষ্ট সংকট ও ফ্যাসিবাদের দানবীয় মূর্তি সম্পর্কে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন তেমনি অনিবার্য দ্বিধা দুর্বলতা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের বিপুল নির্মাণ কার্যের মধ্যে যেন বিকল্পের সন্ধানও পেয়েছিলেন। তাই সারা বিশ্বে যুদ্ধের দামামা ধ্বনির মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরাজেয় মনুষ্যত্বের জয়গান শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই প্রখর রবীন্দ্র-দীপ্তির মধ্যেই কিছু কিছু কবি সচেষ্ট ছিলেন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় কিন্তু কাজটা বড় সহজ সাধ্য ছিল না। কেননা প্রথাবদ্ধ কাব্য রচনায় রবীন্দ্র প্রতিভার অনুকরণ ও অনুসরণ সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে তখন অনিবার্য ছিল। কারণ সাহিত্যের ভাব ও প্রকরণে রবীন্দ্রসৃষ্টি-ধারা কোন কিছুই সম্পর্কের বাইরে রাখে নি। রবীন্দ্র সাহিত্যে নিত্য নতুন পালাবদল ঘটেছে, সে পালাবদল যেমন সৃষ্টি প্রকরণে তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যে। তাই কবি বুদ্ধদেব বসুকে বলতে শোনা যায়, "রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই।" (আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনের ভূমিকা)।

তথাপি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগ-স্বভাবের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য-স্বভাবের অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখা দিল। এই অমিলের কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অর্থাৎ পরিবেশগত। এ সময়টা ছিল দারুণ ভাঙাগড়ার। য়ুরোপের মানুষ তখন পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু মৌলিক আবিষ্কারের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবনদর্শন ও প্রাচীন মূল্যবোধ সমূহের ভিত্তিতে কাঁপন সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই আলোড়নকে আরও দ্রুত পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিল। বাংলার জীবন ও সাহিত্যে এই পরিবর্তনের হাওয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত না হলেও বেশী বিলম্বও হয় নি। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চিরতরে যুদ্ধশেষের ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বিশ্ববাসী দেখেছিল তা দ্রুত মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নও ব্যর্থ হলো। মানুষের মধ্যে স্বস্তির পরিবর্তে আশঙ্কা, সংশয় আরও দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো।

ভারতবর্ষের মোহভঙ্গ আরও গভীর হলো মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার

পরিকল্পনা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনার ফলশ্রুতিতে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও বিপরীত পক্ষে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভারতীয় জীবনে আশ্চর্য এক জঙ্গমতা নিয়ে এলো। রবীন্দ্রনাথ এই উভয় পথের কোনটিকেই মেনে নিতে পারেন নি। যদিও সমাধানের পন্থা হিসেবে কোন বাস্তব পথের সন্ধানও তিনি দিতে পারেন নি। কিন্তু এই উভয় ধারার বিরুদ্ধে সমাধানের পথ নিয়ে এলেন মার্কসবাদীরা। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। বোম্বাইয়ে ডাঙ্গের সম্পাদনায় 'সোশ্যালিস্ট' পত্রিকা (১৯২৩) এবং মুজফফ্‌র আহ্‌মদের সম্পাদনায় 'জনবানী' পত্রিকা (১৯২৩) কে কেন্দ্র করে ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ জনগণের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। অসহযোগ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যাবলীর অসারতা প্রতিপন্ন করে একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করা অপরদিকে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করা এই নীতি নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে অগ্রসরমান হলো।

এই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কবিদের সৃজন ক্রিয়া আন্দোলিত হতে থাকলো। ঊনবিংশ শতকের ভিক্টোরীয় শান্তি ও প্রাচীন যুগের ধ্যানধারণা সংশয়ের দোলায় চকচকিত। মহাযুদ্ধ পরবর্তী এই অবস্থাকে কবি ইয়েট্‌স সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন :

> "Things fall apart ; the centre cannot hold
> Mere anarchy is loosed upon the wor'd
> The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
> The ceremony of innocense is drowned ;
> The best lack all conviction, while the worst
> Are full of passionate intensity.
>
> (The Second coming)

কিন্তু একালেও একদল কবি ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর প্রতিভার বলয়গ্রাসে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্র রোমান্টিকতাই দেখেছিলেন, লক্ষ্য করেন নি বিশ্বকবির হৃদয় নানা দ্বন্দ্ব সংক্ষোভে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে জঙ্গমতার মন্ত্র তাঁরা শিখলেন না। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, "তাঁদের লেখায় দেখা দিল সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস যা 'স্বভাব

কবির' কুললক্ষণ ; শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি বলে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করলেন তাঁরা ; আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পররর্তীদের সতর্ক করে গেছেন।" (সাহিত্য চর্চা)

এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের চারিত্র্যলক্ষণ নির্দেশ করে কবি কালিদাস বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের রচনার sequence ছিল প্রধানত rhetorical, যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জনের রচনার sequence emotional, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনার sequence প্রধানত logical, করুণানিধানের রচনার sequence এই গুলির কোনটি নয়, এই sequence-এর কোন ইংরাজী নাম দিতে পারিলাম না। ইহা স্বপ্নাবেশের sequence।"

রবীন্দ্র সমকালের উত্তরসূরীদের মধ্যে অন্ততঃ চারজন—সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল ও নজরুল —ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাঠকমনে মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ করে আঙ্গিক, ছন্দ প্রকরণ ও কারু বৈচিত্র্যের জন্যই দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। অবশ্য সমকালীন বিষয়বস্তু, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশীয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাব ও মেজাজের দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রধর্মের অনুসারী। বিভিন্ন কবিতায় সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের ঊর্ধ্বে একটা মানবতাবোধের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর কাব্যে গভীরতা ও সমকালীন সমাজজটিলতার বড় অভাব ছিল। জীবনানন্দের ভাষায়—"তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) কবিতায় মননধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহভাবে আমাদের আঘাত করে। কিন্তু আঙ্গিকের দিকেও সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে মনে হয়না।" (কবিতার কথা)।

সত্যেন্দ্রনাথে যে মননশক্তি ও দার্শনিকতার অভাব ছিল তার প্রাচুর্য লক্ষ্য করি আমরা যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালে। সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত কবি মোহিতলাল রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা ও ভাবালুতা থেকে আত্মমুক্তি ঘোষণা করতে গিয়ে ধর্মের নিগড়ে পা দিয়ে তন্ত্রধর্মী দেহবাদী হয়ে পড়লেন—"ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা।" দেহবাদী শৈব কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রকাব্য সংস্কারের বিরোধীতায় সোচ্চার হলেও জনমানসে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেন না; কারণ তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। পনেরোআনা

মানুষের দুঃখ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেনি, জাতীয় চেতনা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদাসীন। তাঁর জীবন দর্শন ব্যক্ত হয়েছে 'পান্থ' কবিতায়ঃ

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি মিথ্যা সনাতনী
সত্যেরে চাহি না তবু সুন্দরের করি আরাধনা।"

প্রেম প্রকৃতি শিব সুন্দর বিষয়ে রবীন্দ্র ভাবনায় অবিশ্বাসী কবি যতীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেকখানি পাঠকচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে তিনি দুঃখবাদী কবি রূপে খ্যাত। বৃত্তিগত কারণে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল যদিও নাগরিক মানসিকতাই তাঁর সৃষ্টি-উৎসকে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত রেখেছে। কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির প্রথাসিদ্ধ ব্যবহারের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মতে 'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারেনা বারোটার বেশী রাতি।' অনন্ত তাঁর কাছে খাঁচার মতো, প্রকৃতি তাঁর কাছে মরুমায়া, মরুশিখা, মরীচিকা। জনৈক কবির ভাষায়—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্রমাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গোরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার সুর ধ্বনিত হয়েছে যতীন্দ্রনাথের কাব্যে। তাঁর কবিতার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের গদ্যগন্ধী তুচ্ছতা, প্রকাশভঙ্গির চমক, ও সিদ্ধরসের বাত্যয় ভিন্ন রসের স্বাদ এনে দিল বাংলা কাব্যে। সংশয়, ব্যঙ্গ, ধর্মে অনাস্থা, নেতিবাদ আধুনিক কাব্যের এই কুললক্ষণগুলি তাঁর কাব্যেই বলাচলে প্রথম সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়। যতীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব পাঠককে সাময়িকভাবে হলেও মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। "যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিটিই প্রকৃতপক্ষে পাঠককে মুগ্ধ করে" (কবি অজিত দত্ত)। লঘু রোমান্টিকদের তরল কল্পনাপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে যতীন্দ্রনাথ বললেনঃ

"কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি!
('ঘুমের ঘোরে, মস্ত ঝোঁকে', মরীচিকা)

রবীন্দ্র বিরোধীতা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে আধুনিকতার উপাদান থাকা সত্ত্বেও মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ কিন্তু সচেতন পাঠক মন ধরে রাখতে পারলেন না। রবীন্দ্র প্রতিভা অম্লান তাঁর নিত্য পালাবদল ও গতিশীলতার জন্য। নিত্য স্রোতস্বিনীর উপলখণ্ডে শেওলা জমতে পারেনা, তাই নিত্য সচেতন

রবীন্দ্র-সৃষ্টি পাঠক মনে চিরজাগরূক থেকেই গেল। অপরদিকে সত্যসুন্দর দাস বেনামে মোহিতলাল 'প্রবাসী'র পাতায় ক্রমশ উনিশ শতকীয় সত্য-শিব সুন্দরের আদর্শের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়লেন এবং উগ্র রক্ষণশীলতা ও প্রাদেশিকতার প্রচারক হলেন। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ক্রমশ নৈরাশ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে পড়লো। কিন্তু বাংলার সমাজে তখন গণজাগরণের ঢেউ উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবমন উদ্বেল, তাকে রূপ দিতে ও মূর্ত করে তুলতে যতীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হলেন, অথচ যতীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল। তিনি যতখানি রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন ততখানি সমাজ ভাবনায় ভাবিত ছিলেন না।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অগ্নিময় শপথে, রুশ দেশের সর্বহারা বিপ্লবের শিক্ষায় ও সমাজের অভ্যন্তরে পর্বত প্রমাণ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরুদ্ধতায় যখন বাঙালী মন টগবগ করে ফুটছে তখন তাকে কাব্যরূপ দিতে এগিয়ে এলেন কবি নজরুল ইসলাম। তাই প্রথম আবির্ভাবেই তিনি জনচিত্ত শুধু জয় করলেন তাই নয় একটি উন্মাদনার স্রোত বইয়ে দিলেন। রবীন্দ্র প্রভাবের একক শাসনের জগতে নজরুল অনায়াসে দ্বিতীয় আসন লাভ করলেন। সমকালীন অন্যান্য কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির জন্য সচেতনভাবে উগ্র প্রচেষ্টা করেও সামান্য প্রকরণ গত বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন ছাপই রাখতে পারেন নি, জনচিত্ত জয় করা তো দূরের কথা। তাঁরা বাংলার রাজনীতি, সমাজ চৈতন্য ও যুব মনের চাহিদা সম্পর্কে অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েছিলেন কিন্তু নজরুল স্বীয় জীবন অভিঘাত ও পরিবেশ প্রভাবকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ করে সে সময়ের একজন তরুণ কবি বলছেন, "বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে। মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করেছিল এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী"। এই উক্তি সাক্ষ্য দেয় যুগ লক্ষণাক্রান্ত চারণ কবি নজরুল প্রথম আবির্ভাবেই সমকালকে কেমন প্রভাবিত করেছিলেন এবং স্বীয় দর্পণে মেলে ধরেছিলেন। দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি ও সিন্ধুর আবেগ উচ্ছ্বাস তাঁর কাব্যে সোচ্চার হয়ে উঠলো। রবীন্দ্র—নাথের কাব্যে আত্মসমাহিতি তরুণ মনকে সশ্রদ্ধভাবে মুগ্ধ করলেও সর্বাংশে তৃপ্ত করতে পারেনি। কালের অনিবার্য দ্বন্দ্বে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল যা রবীন্দ্রনাথের আত্মস্বীকৃতিতেই ভাষা পেয়েছে :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি

আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক--
রয়ে গেছে ফাঁক।" (ঐকতান।)

রবীন্দ্র সৃষ্টি গভীরভাবে স্পর্শ করে কিন্তু আঘাত করে উন্মাদ করে দেয়না। নজরুল আত্মসমাহিতির কবি নন, হাত ধরে আঘাত করে হৈ চৈ করে ঘর থেকে টেনে বের করে আনার কবি। যুব চিত্তে যে স্বভাব-প্রতিবাদীরূপ সুপ্ত থাকে তাকে নজরুল উদ্বুদ্ধ করেন, সমকালীন রাজনৈতিক চাহিদার সমান্তরালে দাঁড় করিয়ে দেন। তাই নজরুল কাব্য বিচারে যেমন পিছনের কথা স্মরণ করা দরকার তেমনি সমকালের ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা তাঁর আত্মকথন অনুসারে 'বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবী।'

দেড়শত বৎসরাধিক কাল ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অবাধ শোষণের পথ পরিষ্কার করার জন্যই শ্রেণী স্বার্থে রেলপথ যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি ভারতবর্ষে আমদানি হয়েছিল। কার্লমার্কস বলেছিলেন এই আধুনিক শিক্ষার প্রভাব জনচিত্তে দেখা দেবে। সামন্ততান্ত্রিকতার পদে পদে নিষেধে। ডোরে জনচিত্তে অগ্রগতির গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হয়েছিল তা ক্রমশ নানা পথে ধাক্কা খেতে খেতে, সংগ্রাম করতে করতে মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করলো অপরদিকে ধর্মের ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণের প্রয়াস দেখা দিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবও এদেশের পরাধীন মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপনা যোগাল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই-এ প্রথম অধিবেশনের মাধ্যমে কংগ্রেসের জন্ম হল। এই সংগঠনের নেতৃত্বে রইলেন জাত বুর্জোয়াদের প্রভাবশালী দল। তাঁরা কোন বড় আঘাত করার নীতি গ্রহণের পরিবর্তে আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাছ থেকে সমস্যা সমাধানের পথ বেছে নিলেন। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দাবি ও ইংরেজের চণ্ডনীতি ক্রমশ জাতীয় কংগ্রেসকে আন্দোলনের পথে নামিয়ে আনলো। স্বরাজ প্রাপ্তি হল কংগ্রেসের লক্ষ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ ধর্ম আন্দোলন মিলিত হয়ে দেশব্যাপী এক গণ-জাগরণ সৃষ্টি করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেশের প্রথম সর্বহারার বিপ্লব সমগ্র ভারত তথা এশিয়া ভূমিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করলো এবং বিভিন্নদেশে মুক্তি আন্দোলনের নীতি ও আদর্শে সঞ্চার করলো নতুন চেতনার।

মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশ্যম্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টি এনেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব, সাম্যবাদের বিজয়ের শিক্ষা বাঙলার শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা দাবি করল এবং শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ চিন্তা, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রতারণা নতুন করে বিচারের সূত্রপাত ঘটাল। বাঙলা কাব্য সাহিত্যে এই বিশেষ রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কাব্যাদর্শ, বিভিন্ন সময় সাহিত্য বিষয়ক মতামত ও জনপ্রিয় কবিতাগুলি পর্যালোচনা করলে এই সত্যই ঘোষিত হবে যে, নজরুল শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে 'বিদ্রোহী' কবি মাত্র নন তিনি বিপ্লবের অগ্রচারী কবি। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে, সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব গ্রহণে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য সদাজাগ্রত সৈনিক-স্বরূপ। সংগ্রামে শ্রমিক কৃষক তথা মেহনতী মানুষই যে প্রধান শক্তি এ সত্য তাঁর বিপ্লবী এই কঠোর চেতনায় ধরা পড়েছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান নেতা শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাহচর্য ও শিক্ষা তাঁর চেতনা ও মতাদর্শ গঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশই কবিকে বাঙলা দেশে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে। এ সাফল্য খুব বিরল ক্ষেত্রেই ঘটে। এ সম্ভব হয়েছিল কেননা ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়ে বাঙলার জনমনে প্লাবন এনেছিল। 'বিদ্রোহী'র কবি বাঙলার সাহিত্য-পাঠক মনে চির-চেনা হয়ে গেল। ভাব, ভাষা, ভাবনায় বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নবাগত এই কবির কবিতা প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। এই কবিতার সুরই নজরুলের সমগ্র রচনার মূল সুর। এই কবিতার 'আমি'ই নজরুলের কবি ব্যক্তিত্ব—এই আমিই বারবার তাঁর কাব্যে ঘুরে ঘুরে এসেছে। কেননা কবি হিসেবে নজরুল কাব্য বিষয়ের থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন বা নির্বিকার নন। বিশেষত এই পর্যায়ের প্রায় অধিকাংশ কবিতাই কবির বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের মূর্ত রূপ। তাই নজরুল চরিত্রের এই 'আমি'কে অনুধাবন করতে হবে। 'বিদ্রোহী' বাঙলা কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীক কবিতা। এই কবিতার 'আমি' বিচ্ছিন্নভাবে কবির ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির উদ্ভিন্ন প্রকাশ নয়। সমকালীন সমাজ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত হবার জন্য যে মানসিকতার উত্তুঙ্গে পৌঁছেছিল

তার ভিত্তিতে ছিল অত্যাচার-অবিচার তথা প্রথাসিদ্ধতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মত বীর্যবন্ত চিরউন্নত শির—যুবশক্তি। শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখছেন: "দেশের অবস্থা এখন খুবই গরম। তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।" নজরুলের 'আমি' এই সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রতীকিত রূপ।

'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'কে শান্ত নিরুপদ্রব গৃহকোণ থেকে বিচার করলে ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে 'বিদ্রোহী'র কবির ছন্নছাড়া জীবনের কথা। অভাব-অনটনহীন পিতৃ কর্তৃত্বাধীন শান্ত গৃহকোণ তাঁর জন্য শৈশবে অপেক্ষা করে ছিল না। নিদারুণ অভাবে কৈশোরেই জীবিকার জন্য পথে নামতে হয়। দরিদ্র ঘরের দুখু মিঞা, লেটোর নাচের দলের বাচ্চাচি, পরবর্তী কালের বাঙালী পল্টনের 'হাবিলদার' নজরুল ইসলাম যে বিচিত্র দুর্গম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই ইনিয়ে বিনিয়ে তথাকথিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে, প্রথা মেনে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। আশৈশব এমন বিচিত্র যন্ত্রনাময় অভিজ্ঞতার অধিকারী কোন কবিই বাংলাদেশে তখন আসেন নি। তাই তাঁর সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও বিষয়ের কবিতা 'বিদ্রোহী' যেমন সাধারণ পাঠককে উন্মাদ করেছিল তেমনি রক্ষণশীল কবি-সমালোচকদের টিকি দাঁড়িতে টান দিয়েছিল। 'বিদ্রোহী'র 'আমি' তাই তৎকালীন যুবসমাজের প্রতিনিধি নায়ক।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নজরুল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্দীপিত হয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং প্রথম সংখ্যাতেই 'ধূমকেতু' কবিতাটি ছাপা হয়। এই কবিতাটি 'বিদ্রোহী' কবিতার পরিপূরক। এখানে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের প্রতি চরম আঘাত হানা হয়েছে। শেলীর Prometheus-এর মতো নজরুলের বিদ্রোহ অদম্য আপোষহীন, সেখানে ঈশ্বরেরও রেহাই নেই—

"এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান মিতা!
হেকে তো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালিয়েছি বুকে চিতা।"

নজরুলের ভাঙার গান নিরন্তর ভাঙার জন্যই নয়, গড়ার জন্য। কবি নতুন সমাজ গড়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তিনি বলছেন :

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন জীবন হারা
অসুন্দরকে করতে ছেদন।"

নজরুল একটি পত্রে তাঁর ভাঙার গানের বিষয়ে লিখেছিলেন, "নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি, শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নতুন করে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্র পারি ভাঙি আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি।·· আমার বিদ্রোহও যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, এ আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তির-পূর্ণতম স্রষ্টার।" মনীষী রোমাঁ রোলাঁর একটি নাটকের সংলাপেও একই সুর :

"Where order is injustice, disorder is
beginning of justice "

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মুক্তির গানই যে নজরুল গেয়েছেন তাই নয়, তিনি সাম্যবাদ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ চেতনা থেকে হলেও শ্রেণীহীন সমাজের চিত্র এঁকেছেন। 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের' সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকায় কবির 'সবহারা' কাব্যগ্রন্থের বেশীর ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদ নজরুলের উত্তমরূপে হয়তো অধীগত ছিল না। কিন্তু বিপ্লবী মুজফ্ফর আহ্মদের সাহচর্য ও রুশ বিপ্লবের শিক্ষা কবির চিত্তে এক সাম্যবাদী আবেগ সৃষ্টি করে যা মার্কসবাদের তন্নিষ্ঠ ব্যবহার নয় আবার সামাজিক বিপ্লব সাধনে সাম্যবাদও নয়। তাঁর সাম্যবাদে ঈশ্বরের অস্বীকৃতি নেই। বরং 'অগ্নিবীনা' পর্যায়ের ঈশ্বর বিদ্বেষ এ পর্যায়ে অনেকখানি কমে এসেছে। কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির ঘোষণা পরিশেষে সবহারারই জয় সুনিশ্চিত করে—

শোন অত্যাচারী! শোনরে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।"

'চির বিদ্রোহী' কবি নজরুল ইসলামের শেষ দিকের রচনা। 'শেষ সওগাত'

এর কবিতা 'চিরবিদ্রোহী' তেও কবির আযৌবন বিদ্রোহী চরিত্র অম্লান রয়েছে। কবি তাঁর প্রথম বিদ্রোহের কবিতায় বলেছিলেন :

"আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—।"

আর জীবনমৃত্যুর ঠিক পূর্বে 'চির বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন :

"বিদ্রোহ আর আসবে কিসে, ভবন ভরা দুঃখ শোক!
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়
শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখে মুক্ত হোক।"

সুতরাং যে সমস্ত মহল বলতে চান নজরুলের 'বিদ্রোহী' আকস্মিক, এ প্রকৃতপক্ষে সমাজদ্রোহ নয়, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নজরুলকে হেয় করতে চান। নজরুলের কবি জীবনের মূল সুর অর্থাৎ Swan Song বিদ্রোহের সুর, সর্বহারার সর্বজয়ের মহান প্রশান্তি। বিদ্রোহ কেন, কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কাদের সংগঠিত শক্তিতে বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রশ্নগুলি নজরুলের কবিতায় সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হলেও নানা বাধা বিপত্তি, পথ বিভ্রান্তি ও আত্মমুখীন আবেগাতিশয্যের জন্য বিপ্লবের দর্শন এবং বিপ্লবী দর্শনভিত্তিক বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি বিজড়িত না থাকতে পারার ফলে বিদ্রোহের বাণী পরিপূর্ণভাবে বিপ্লবের বাণীতে উত্তরিত হতে পারল না।

নজরুলের এই অপূর্ণতা সুকান্তে এসে সম্পূর্ণ হল। সুকান্ত বাংলা সাহিত্যের সফল বিপ্লবী কবি। শ্রেণী দৃষ্টি, বৈপ্লবিক সমাজ বিজ্ঞান চেতনা, বিপ্লবী লক্ষ্য, বিপ্লবী সংগঠনের আওতায় নিজেকে গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে সুকান্তের মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল না। সুকান্ত যুগন্ধর কবি, সমকালের শ্রেষ্ঠ ফসল। তাঁর সৃষ্টির অন্তর্শক্তি এত প্রবল ও অমোঘ যে কাল পরিক্রমায় শত অন্ধকার, শত বাধার মধ্যেও ধ্রুবতারার মতো অম্লান। অসংখ্য বাধা বিপত্তি ও কালানুক্রমণে অনেক কিছু মূল্য হারিয়েছে কিন্তু সুকান্তের কবিতায় বিন্দুমাত্র মরচে পড়ে নি বরং নতুন নতুন পরিস্থিতিতে তার জনপ্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমকালে যে সব অগ্রজ কবিরা বাংলা কাব্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সমর সেন, উল্লেখযোগ্য। স্বভাব ধর্মে,

সমাজ চেতনায়, সৃষ্টি ক্ষমতায় এঁরা সকলেই যে সমগোত্রীয় ছিলেন এমন নয়, বরং একজনের সঙ্গে আরেকজনের সুস্পষ্ট চারিত্রিক বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সকলেরই অবদান রয়েছে সেটা হলো কবিতাকে এঁরা বুদ্ধি মার্গের উচ্চ কোঠায় আবদ্ধ রেখে পাঠক সাধারণের হৃদয় থেকে প্রায় নির্বাসন দিলেন। অলংকরণে, অঙ্গ সজ্জায়, বিষয় বৈচিত্র্যে, কঠিন রঙ বেরঙের পাথরে গগনচুম্বী হর্ম্যরাজী রচনায় এঁরা বাংলা কাব্যের জগতে চোখ ধাঁধান অনেক আয়োজন করলেন বটে কিন্তু রবীন্দ্র নজরুলের ধারায় বাংলা কবিতা যে পাঠক ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিল তা প্রায় ঘুচে গেল। বিদগ্ধ দ্বারবক্ষীর উন্মুখ সঙিনের ভয়ে হৃদয় প্রধান পাঠক দূর থেকে সেলাম জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে গেছে।

এঁরা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির তাড়নায় ভিক্ষার হাত বাড়িয়েছেন য়ুরোপীয় সাহিত্যের দরবারে। সেখানে তখন কঠিন কবিতা রচনার আন্দোলন চলছে। এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, মালার্মে, রিলকে, পাউণ্ড এঁদের উপজীব্য। কেউ কেউ আবার আংশিকভাবে ডে লুইস, লুই আরগঁ, লুই ম্যাকনিসের দ্বারা প্রভাবিত। দেশের মাটিতে মূল প্রতিষ্ঠা না করতে পারা, বৈশিষ্ট্য রচনার উৎকট প্রয়াস ও বিদেশী কবিদের সার্বিক অনুকারীতা অধিকাংশ ক্ষেত্র রস সৃষ্টির পরিবর্তে বুদ্ধিজীবীর গবেষণার বস্তুতে পরিণত করেছে। ফলে পাঠক সাধারণের হৃদয়-আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সুসজ্জিত বৈঠকখানা বা স্টাডির সজ্জাংশ হয়ে দাঁড়াল। কবিতা কণ্ঠে আবৃত্তি হতে ভুলে গেল। এই তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়করবরূপে ইনটেলেকচুয়াল; প্রয়োজন সাধকও হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান নয়।...এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরছে। প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।" (আধুনিক কাব্য)।

এই মাধুকরী বৃত্তির স্বীকৃতি রয়েছে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়: "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না" (কাব্যের মুক্তি। স্বগত পৃঃ ৩৪)। আরও স্পষ্ট করে বলেছেন "কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে, এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্য বর্জনীয়, তবে ভুক্তা—বশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগর পরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।" (ঐ পৃঃ ২১)।

জীবনানন্দের কণ্ঠের সেই একই কথা: "অন্ততঃ যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁ্যাবার ও ইয়েটস ও এলিয়টের সদর্থক বা নঞর্থক মনন বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।" (কবিতার কথা, পৃঃ ২৩)।

রবীন্দ্র ঐতিহ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন শ্রদ্ধেয় কবি বিষ্ণু দে:

"রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা, খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।"
(২৫শে বৈশাখ, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')।

কিন্তু বিষ্ণু দেব এই 'সমুদ্রের দিকে চলি' অঙ্গীকার অধিকাংশ আধুনিক কবির ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যতম বহু প্রচারিত আধুনিক কবি বুদ্ধদেব বসু নিজেকে প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, দেহজ কামনার অভিশাপে দগ্ধ বলে আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ "মনে হলো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তার জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।" (সাহিত্য চর্চা, পৃঃ ১৪৭)।

তাই কবি বুদ্ধদেব বসুর কাছে 'যৌবন আমার অভিশাপ', আর এই যৌবনের আদিম বন্যতারই পদাবলী তিনি রচনা করে গেছেন সারা জীবন। দেহ সর্বস্বতা তাঁর কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, সৃষ্টি ক্ষমতার এমন সচেতন অপব্যবহার এবং একমুখীনতা খুবই বিরল। তাঁর একটিই উপলব্ধি:

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার!

* * * *

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।

রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি ;—
(বন্দীর বন্দনা)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব যখন নানা জটিলতায় সংক্ষুব্ধ, মানুষ যখন মুক্তি চিন্তায় পাগল, ভারতের মাটিতে যখন সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে জোয়ার ভাঙা প্রবাহ তখন আদিম প্রবৃত্তির মধ্যেই যৌবনের চরিতার্থতা সন্ধান ও পাঠককে সেদিকে নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে সমাজদ্রোহীতা। 'আসঙ্গ বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক' বুদ্ধদেব বসু তাই বাংলা কাব্যেব ক্ষেত্রে কোন সদর্থক মূল্যবোধ সৃষ্টিব গৌরবেব অধিকারী নন। ববং প্রতিক্রিয়ার ক্ষীণ ধারাটিকেই অবক্ষযবাদী বিদেশী কবিদেব সাহায্য নিয়ে পরিপুষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন।

সেদিক থেকে জীবনানন্দ অনেক বেশী আন্তবিক, যুগ ও কালের মধ্যবিত্ত সুলভ সংশযী প্রত্যয়হীনতাব এক ট্র্যাজিক রস তাঁব কাব্যেব সারা শরীরে ছড়িযে আছে। তাই তাঁব হতাশা তীব্র ও মর্মসন্ধানী। সুধীন্দ্রনাথের না-ধর্মী কবিতা বাংলা সাহিত্যেব মেদ বৃদ্ধি কবেছে এবং সে মেদ পাঠকের দৃষ্টিতে বাহুল্য বলেই গৃহীত হযেছে। বিষ্ণু দের সাম্যবাদী আদর্শ অতি বুদ্ধি মার্গীতাব গহন অবণ্যে অনেক সময পথহাবা হযেছে তথাপি তাঁব মধ্যে সুস্থতার ফল্গুধারা বর্তমান। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ববং অনেকটা সরল, পাঠকেব সঙ্গে কুস্তী লডাব প্রস্তুতি সেখানে কম। The waste Land এব পটভূমিতে এলিয়ট জীবন ও সমকালকে দেখেছিলেন, কিন্তু জীবনানন্দ দেখেছিলেন হেমন্তের চালচিত্রে। ফসলেব যুগ অর্থাৎ সৃষ্টিব যুগান্তে জীর্ণতাব, অবক্ষয়ের এক মহাকালেব কবি জীবনানন্দ। ব্যক্তিসর্বস্ব বোমান্টিকতা, বেদনাবিধুব চিত্ততা, সমাজে শুধু নেতির সমাবোহ যেমনটি জীবনানন্দে বিধৃত এমনটি আব কোথাও নেই। জীবনানন্দে উন্নতমানেব কাব্য আছে, কিন্তু নেই প্রাণবন্ত জীবন, তাই মৃত্যু চেতনা পরিকীর্ণ তাঁর সৃষ্টি করুণ পসরা নিয়ে এক কোণে শবের মতোই পড়ে আছে। 'জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ' জীবনানন্দের এ উপলব্ধির সঙ্গে সংগ্রামী চৈতন্য, বিংশ শতাব্দীর মানুষের উপলব্ধির কোন মিলই নেই। তাই তাঁর morbidity একান্ত ব্যক্তিগত অসুস্থ মানসিকতার, যুগেরও নয় কালেরও নয়।

বুদ্ধি বিলাসী আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দেই বুঝেছিলেন কবির সমস্যা ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত না থেকেও তাত্ত্বিক জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে তিনি নেতিবাদ, দেহসর্বস্বতা, morbidityর পথে পা না বাড়িয়ে মানুষের জয়যাত্রায় আস্থা স্থাপন করলেন এবং বৈদগ্ধ্যের সুউচ্চ মিনার থেকে এক আশাবাদের স্বপ্নজাল রচনা করলেন। বৈদগ্ধ্যের কাঠিন্য ভেদ করে তাঁর কাব্যের সঙ্গে হয়তো পাঠকের হৃদয়ের মিলন হয় নি কিন্তু পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে তা সমর্থ হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন সততার কারণেই খুব স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁর যৌবনের গুরু টি, এস, এলিয়টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং তিনি অকুণ্ঠভাবেই তা প্রকাশ করেছেন :

"এলিঅট মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থমকে গেছেন ক্যাপিট্যালিসমের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খটকা মাত্র।… অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তাই এলিঅট অসম্বদ্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি স্বরূপের মতবাদে।" (এলিঅট, 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ')। তাই কবি বিষ্ণু দের দৃপ্ত ঘোষণা :

"আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রুর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা,
নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।" (অন্বিষ্ট)

লুই আরগঁ যেমন নাৎসী কবলিত ফ্রান্সের অত্যাচারিত আক্রান্ত চেহারাটি তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন তেমনি বিষ্ণু দে'ও যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, শোষণ বিধ্বস্ত বাংলার কাব্যরূপ এবং মানুষের বিজয়ের ইংগিত দিয়েছিলেন। কিন্তু আরগঁর মতো বহু ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা প্রকরণ বাহুল্য, বৈদগ্ধ্যের দুর্ভেদ্যতায় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। এলুয়ার বা আরগঁ এই ত্রুটি কাটাতে খানিকটা সমর্থ হয়েছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে, কিন্তু বিষ্ণু দে পারেন নি নিজেকে প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে।

য়ুরোপীয় কাব্যের সংসারেও তৎকালে একই অবস্থা। জ্যাক লিণ্ডসে বলছেন : "Poetry is a lost art in England for the moment, in the United States, in Canada, because the poets are writing to poets, to critics, to professional intellectuals." বাংলাদেশেও বিশের দশক থেকে একদল কবি প্রচুর লিখেছেন কিন্তু সেসবই সমালোচক,

বুদ্ধিজীবী ও profe sional intellectualদের জন্য। কবিতাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়গ্রাহ্য করার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে, কবিতার হাড়গোড় নিয়ে কবি ও সমালোচকদের মধ্যে টানা হেচড়া করতেই এঁদের পরম তৃপ্তি। আর জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা এঁদের মধ্যে এমন এক আত্মতৃপ্তির জন্ম দিল যে সাধারণ মানুষ কবিতা বোঝে না এটা ভাবতে বা প্রকাশ করতে এক ধরণের উৎকট আনন্দ পান। বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর বহুবর্ণাঢ্য পত্র পত্রিকা এঁদের আশ্রয়। এই সব কবিরা দলবেঁধে প্রাতিষ্ঠানিক মহলের দেওয়া পুরস্কার মালা গলায় পরেন, উচ্চকাঙ্খী অনুজ কবিরা অগ্রজ কবিদের কবিতা বহু কায়ক্লেশে মুখস্থ করেন, আবৃত্তি যাঁদের জীবিকা তাঁরা মাঝে মাঝে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে আবেগাপ্লুতভাবে সেই সব কবিতার রেকর্ড করেন। আর ব্যবসায়িক পত্রিকাগোষ্ঠীর ভাড়াটে সমালোচকরা এঁদের নিয়ে জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন।

এই জাতীয় কাব্যের পৃষ্ঠপোষক স্বভাবতই উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা। এদের দৃষ্টিভঙ্গি কলাকৈবল্যবাদী, কবি সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ববোধকে এরা স্বীকার করে না। কেননা সমাজ পরিবর্তনের সচেতন প্রয়াস তাদের অপছন্দ, কারণ স্থিতাবস্থায় কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে। তারা চায় কবি শিল্পীরা স্থিতাবস্থার সুনিপুণ প্রচারক হবেন। তাই যে সব স্রষ্টা সামাজিক দায়িত্ববোধে বাস্তব, গণজাগরণ মুখী সৃষ্টি উপহার দেন তাঁদের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা এদের লক্ষ্য। ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও সমাজপ্রভুরা একাজ করার জন্য একদল বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের লালন পালন করেন। প্রগতিশীল কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে এদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেছেন :

"আমরা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের চরণচারণ কলাকৈবল্যবাদী সমালোচকরা ও বড় বড় খবরের কাগজের বশংবদ ভৃত্যরা আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে যে সব আলোচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন, সেগুলির মধ্যে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি লোকপ্রিয় কবিদের নামোচ্চারণও করেন না। একেই বলে অভিসন্ধিমূলক সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে নীরবতার চক্রান্ত (conspiracy of silence)। এর দ্বারা এই সব সমাজবিরোধী সমালোচকরা মনে করেন এইভাবে লোকপ্রিয় কবিদের উপেক্ষা করলেই বোধ হয় বাংলাকাব্যের ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম মুছে যাবে! এই অশ্রদ্ধেয় ধারণা যে কত বড় ভুল তার প্রমাণ, যত দিন যাচ্ছে ততই লোকপ্রেমিক বিপ্লবী কবিদের স্বীকৃতি সম্মান লোক সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ কাব্যরসিক

বাঙালী পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিপুল বিত্তশালী বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু কবি সাহিত্যিকরা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পাচ্ছেন না। আত্মম্ভরী বিদ্যাদিগ্‌গজ সমালোচকবর্গ যাদের নিয়ে মাতামাতি করেন সেই সব আত্মপ্রসাদ গদগদ কবিদের এক একজনের পাঁচশো কপি বই-এর পাঁচ বছরেও সংস্করণ শেষ হয় না। 'জনপ্রিয়তা' কথাটাকে নিয়ে ওরা হামেশাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন এবং ঠিক এই কারণেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের মন্দিরে যারা নিত্য সেবিত, সেই লোকমান্য কবিরা এঁদের চোখে কবি নয়।" (মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভায় প্রদত্তভাষণ)।

এ সব সত্ত্বেও ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার গুণে পাঠক হৃদয় জয় করেছিল। এঁদের কবিতা আগ্রহের সঙ্গে আবৃত্তিও হতো। পরবর্তীকালে সমর সেন প্রায় কবিতার জগৎ থেকে সরে গেছেন। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা ভাব ও উপস্থাপনার পুনরাবৃত্তি দোষে আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়েছে। আর বিশ্বাসের ভিত্তি বদল হওয়ায় সুভাষের কবিতা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েও চল্লিশের দশকের আবেগ একালে সৃষ্টি করতে পারছে না। দুর্বোধ্যতার অপবাদ সুভাষকে কেউ দেবেন না, বোঝা যায় বরং অতি সহজেই বোঝা যায় কিন্তু তাঁর কবিতার সেই সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গেছে। এক ধরণের স্যাঁতসেঁতে, বিবর্ণ আদুরে আদুরে ভাব যেন সমস্ত কবিতার অঙ্গে আশ্রয় করে থাকে। তাৎক্ষণিক ভাল লাগা সৃষ্টি হয় কিন্তু হৃদয়ও স্পর্শ করে না, মস্তিষ্ককেও নাড়া দেয় না।

এই পর্যায়ে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। একমাত্র যার সৃষ্টিমাধ্যমে আধুনিক কবিতার সঙ্গে পাঠক সাধারণের আজও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ মাত্র এই কটি বছর এই অসামান্য শক্তি সম্পন্ন কবি লিখতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর রচনার অন্তর্সত্য, সংবেদনশীলতা এমন কালজয়ী যে উত্তরোত্তর তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। কি এমন শক্তি নিহিত রয়েছে তাঁর কাব্যে যা যুগ পরম্পরায় অমলিন থাকে এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে অমোঘ হয়ে যায়। যে বয়সে চিন্তা বুদ্ধি মস্তিষ্ক অপরিণত থাকে, অনুকারবৃত্তি লেখকদের প্রধান আশ্রয় হয় সেই বয়সে অর্থাৎ মাত্র একুশ বছর বয়সে এমন শক্তি কবি কোথা থেকে পেলেন যাতে বয়সের ধর্মকে অতিক্রম করা যায়, অগ্রজ কবিদের পথ পন্থাকে পরিহার করে মার্কসবাদী

শিক্ষার আলোকে স্বীয় অগ্রগতির পথ রচনা করে তোলা সম্ভব হয়। সুকান্ত আজ প্রায় তিরিশ বছর নেই কিন্তু তার অগ্রজ কবিরা আজও লিখে চলেছেন। সুকান্ত-কবিতার আবৃত্তি কণ্ঠে কণ্ঠে, কবিতা সুরারোপিত হয়ে গানে রূপান্তরিত হয়ে জনগণের হৃদয়ে হৃদয়ে।. তাঁর অগ্রজরা এই ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন না। অতি অল্প বয়সে শোষিত মানুষের পার্টির কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। অসামান্য সৃষ্টি ক্ষমতা, নিবীড় অভিজ্ঞতা সেই সঙ্গে সাহিত্যিক সততা মিলে যে সৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তা পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য। সুকান্তের প্রেরণা হল শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণা। শুধু মঙ্গল করার বা সহানুভূতি প্রকাশের বন্ধ্যা ইচ্ছা নয়, সংগ্রামে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কবি এখানে সৈনিক কবি। নিজের কবি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুকান্ত বলেছেন : "কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।" তাঁর ঘোষণা :

> "লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
> বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন"

যে বয়সে মানুষের ব্যক্তিত্বই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না, সে বয়সে কবি নিজেকে চিনতে পেরেছেন শুধু তাই নয়, নেতৃত্বের যথার্থ দৃষ্টান্তটি আঁকড়ে ধরেছেন। একালের সত্য হল শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা মানুষের নিজস্ব সমাজ গড়ে তোলা। শোষণ ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমেই সমস্ত মানুষের কল্যাণ। এই শ্রেণীযুদ্ধে শোষিত মানুষকে উদ্দীপ্ত করে সুকান্ত ঐতিহাসিক কবিধর্ম পালন করেছেন। কবির বিশ্বাস :

> "আমার হৃদযন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা
> পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
> তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে স্বপ্ন।
> কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
> যে দিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখে মুখে
> সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।
> আজ তোমরা এখনো ঘুমে।"

বিশ্ববিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রতি এমন নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস ও প্রতীতি বাংলা কবিতায় বিরল-দৃষ্ট। এখানেই সুকান্তের বৈশিষ্ট্য, কালজয়ী হওয়ার কারণ। কবিতাকে শব্দ বিলাস থেকে মুক্ত করে বিষয় ভাবনায়, বিপ্লবী চেতনায় সংগ্রামের তীব্রতা দিয়ে পুনর্জীবিত করেছেন কবি সুকান্ত। সুকান্ত এক দুর্দমনীয় কবি-ব্যক্তিত্ব যিনি উপযুক্ত শিল্প মাধ্যম রচনা করে কবিতাকে পাঠক মনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ; অবক্ষয়, অকারণ বাচালতা অথবা বিকৃতি জনিত ব্যর্থতা থেকে কাব্যকে নতুন জীবন দান করেছেন।

সমকালীনতা সুকান্ত কাব্যের প্রাণবস্তু। তৎকালীন অনেক অগ্রজ কবির মতো সুকান্ত কাব্যশরীরে ভাষা ও উপস্থাপনার জটিলতা সৃষ্টি করার চাতুর্য অনুশীলন করেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি রাজনীতি করতে গিয়ে কবি হতে পারলেন না। তাঁর কবিতা প্রচারমূলক। যে কবি অঙ্গীকারাবদ্ধ জনগণের কথা বলবার জন্য, যে কবি জনগণের পার্টির একজন কর্মী, তাঁর কবিতা প্রচারমূলক হবেই। যিনি সাহিত্যে সাম্যবাদ প্রচার করেন তিনি প্রচারবাদী আর যিনি ভাববাদ প্রচার করেন তিনি প্রচারবাদী নন ? জনগণের পক্ষে কথা বলা প্রচার, আর বিপক্ষে কথা বলা প্রচার নয় ? সাম্যবাদ এ যুগের একটি বিশিষ্ট দর্শন যা উত্তরোত্তর প্রসারমান। আর এই দর্শনকে কাব্যরূপ দেবার জন্য যুগের দাবীতেই সুকান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভাবাদর্শ নিরাবলম্ব নয়, তার জন্য আধার চাই আর সেই আধার হলেন স্রষ্টা, সে যুগে কবি সুকান্ত। রাজনীতিকে সোচ্চার রেখেও যে সার্থক কালজয়ী কবিতা রচনা করা যায় সুকান্ত এদেশে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বোধ হয় কবি এ দিক দিয়ে বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। মায়াকভস্কি, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত, ল্যাংস্টন হিউজ প্রমুখ বিশ্ববন্দিত কবির পাশাপাশি সুকান্তর অবস্থান নিশ্চয়ই চিন্তা করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সুকান্তের আবির্ভাব কালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ

বাংলা সাহিত্যে কবি সুকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি রাজনৈতিক কবি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় তিনি ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের কমিউনিস্ট কবি। সুকান্তের কাব্যসিদ্ধি যদিও বিস্ময়কর, বয়সের তুলনায় প্রায় অবিশ্বাস্য, তবুও আকস্মিক নয়। কেননা তিরিশের দশক থেকে ভারতবর্ষে ও সমগ্র বিশ্বে আগ্রাসী যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও ফ্যাসিবাদী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের যে সংগ্রাম চলছিল সুকান্ত তারই কনিষ্ঠতম শরিক। শুধু আন্তর্জাতিক পটভূমিতে নয় ভারতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথকে সামনের সারিতে রেখে প্রগতি লেখক শিল্পীরা যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য প্রস্তুত করে ছিলেন। সেই পটভূমিতেই সুকান্তের আবির্ভাব ও সৃষ্টিধারা প্রবাহিত। তাই সুকান্তের বিস্ময়কর কৃতিত্বের মর্মানুসন্ধান করতে হবে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘনঘটার মধ্যে। এত অল্প বয়সে সৃষ্টির মধ্যে সমকালকে দলিল রূপে বিধৃত করে রাখা নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা—বিশেষ করে তাঁর সমকাল ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনে সর্বাপেক্ষা জটিল সময়। উভয়তঃ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সময়ের জটিলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতগুলি অনুধাবন না করলে সুকান্তের আবির্ভাব ও বিকাশের তাৎপর্য আমাদের কাছে ধরা পড়বে না।

রুশ বিপ্লবের বিজয়বার্তা ভারতের মাটিতে উপস্থিত হলেও কিংবা ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ঢেউ উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পড়লেও তিরিশের দশকের মাঝামাঝি বা চল্লিশের দশকের প্রারম্ভের পূর্বে মার্কসবাদে দীক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। তখনও 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লবীদলের প্রতি মধ্যবিত্ত মানুষের অসীম শ্রদ্ধা। সন্ত্রাসবাদী-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি মোহ-ভঙ্গের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জেলে বন্দী ও আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবীরা জেলের মধ্যেই মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কেবলমাত্র ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিদেশ থেকেই মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে ১৯৩১-৩২ সাল থেকে মার্কসবাদের আলোকে ভারতবর্ষের সমাজবিন্যাস বিচারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের বিচারও শুরু করেন। ১৯৩১ সালে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি চলতে থাকে যদিও সুধীন্দ্রনাথ নিজে মার্কসবাদী ছিলেন না। এ পর্যায়ে বিশেষ করে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

ইতিমধ্যে তিরিশের দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। ১৯২২ সালে উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা মুসোলিনী ইতালীর শাসন তন্ত্রে আরোহণ করে বিশ্বে ফ্যাসিবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করেন, সেই পথ ধরেই ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হিটলার জার্মানীর ক্ষমতা দখল করেন। তারপর নাৎসী বাহিনীকে দিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাতে রাইখস্টাগে আগুন দিয়ে সুকৌশল প্রচারে তার দায়ভাগ কমিউনিস্টদের কাঁধে চাপিয়ে কমিউনিস্ট নিধন শুরু করেন। সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে সেই আক্রমণ সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের উপরও নামিয়ে নিয়ে আসতে দ্বিধা করেন নি। ঐ বছরের ১০ই মে বার্লিনের রাজপথে বিশ্ববিখ্যাত সমস্ত লেখকের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব প্রত্যক্ষ করলেন জার্মানবাসী। ১৯৩৩ সালেই জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হল, ১৯৩৫-৩৬ সালে ইতালী দখল করে নিল আবিসিনিয়া। ফ্যাসিবাদের এই দানবীয় চেহারার বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত বিবেকসম্পন্ন মানুষকে সংগঠিত করার জন্য রোমাঁ রোঁলা, গোর্কী ও অঁ্যারি বারবুস প্রমুখ প্রতিরোধ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন এবং ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আঁদ্রে মালরো, আলডুস হাক্সলি, জন স্ট্র্যাচি, আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফস্টার প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বুদ্ধিজীবীরা অংশ গ্রহণ করেন। য়ুরোপ প্রবাসী খ্যাতনামা ভারতীয় সাহিত্যিক মুলুকরাজ আনন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৩৫ সালের সপ্তম অধিবেশনেই প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভ ইতিহাসখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট থিসিস' পেশ করেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে এই 'যুক্তফ্রন্ট থিসিস' এক মহামূল্যবান তত্ত্বরূপে আজও পরিগণিত।[৬] এর সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত দত্ত-ব্রাডলি দলিল যুক্ত হয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণফ্রন্ট' রচনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

ভারতের মাটিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রধান দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরাই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও কংগ্রেসের একাংশের নেতারাও এই দানবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। নেহেরু 'Glimpses of World 'তে বলেছেন :

"Whenever the workers become powerful and actually threaten the capitalistic state, the capitalist class naturally tries to save itself. Usually such a threat from the workers comes in times of violent economic crisis. If the owning and ruling class cannot put down the workers in the ordinary democratic way by using the police and army, then it adopts the fascist method." ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেও নেহেরু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক ভাষণে প্রতিরোধের আহ্বান জানান। এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য এই সংগঠন গড়ে ওঠার পিছনেও কমিউনিস্টদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

ভারতে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট সজাগ ছিল এবং অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৯২৮ সালের ২৪শে মে ভারতের তৎকালীন বড়লাট ভারত সচিবকে লিখছেন :

"আপনার যা বিধান আমাদেরও তাই। এরা এখনও শিশু এবং কিছু দিনের মধ্যে একটা ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এমন নয়। তবু বিপদের গুরুতর আশঙ্কা এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। তারা দুর্বল থাকতে থাকতেই তাদের নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ করবার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য। তাদের দ্রুত অগ্রগতি হয় এমন যে কোন প্রচেষ্টায় আমাদের বাধা দিতে হবে। তা আমাদের বন্ধ করতেই হবে।" (কমিউনিজম্ ইন্ ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১)

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রখর দৃষ্টি সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ যখন দ্রুতগতিতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন আর তারা চুপ করে থাকতে পারল না। ১৯৩৪ সালের ২৩শে জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রিমিনাল ল' অ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টে বেআইনী বলে ঘোষিত হল। ১৯৩৫ সালের ৮ই মার্চ পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি সহ কলকাতার ১৩টি সংস্থাকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর দ্বারা পার্টির কাজ খুব বেশী খর্ব করা সম্ভব হয় নি। বম্বে থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস কানপুরে স্থানান্তরিত হয়, এবং নতুন সম্পাদক যোশী, অজয় ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রণ্টের কার্যক্রম বিপুল উদ্যমে চালিয়ে যান। বৈপ্লবিক গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য গণসংগঠনের মধ্যে ঢুকে পড়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার ফলে ব্রিটিশ সরকার খুব বেশী সুবিধা করতে পারে নি। কমিউনিস্টদের কাজ অব্যাহতই ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামও তখন দুর্বার গতি লাভ করেছে আর পাশাপাশি এগুারসনী কালাকানুন ও দমননীতিও চণ্ডরূপ ধারণ করেছে। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে বন্দীদের উপর গুলি চালনা এবং মনুমেণ্ট ময়দানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-ভাষণ, আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট ও তিনজন বন্দীর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা জনমানসে বিক্ষোভের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। ১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলনের মাধ্যমে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি' গঠিত হয়। বিনা বিচারে আটক আইনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে ভাষা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ চিন্তাবিদের স্বাক্ষরে যে আবেদন পত্র প্রচারিত হয় তাতে তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়: "বিনা বিচারে বন্দী করা, বিচারে মুক্তি লাভের পর পুনরায় গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করা, সভা সমিতি ও বক্তৃতা করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র আইন দ্বারা আষ্ঠে পৃষ্ঠে আবদ্ধ করা এবং আরও বহু প্রকারে সাধারণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করাই হইতেছে আজিকার বাংলার নৈমিত্তিক ব্যাপার।"

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা আরও তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রোঁমা রোঁল্যার আহ্বানে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয় তাতে বলা হল: পৃথিবীর সম্মুখে আজ আতঙ্কের মতো আর এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সমুপস্থিত। ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্র মাখনের বদলে কামান তৈরীতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে বিকশিত করছে সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক স্বরূপকে। ইতালী যেভাবে আবিসিনিয়াকে পদানত করল, তা সভ্যতা ও মানবতার উপাসক সকল মানুষকেই স্তম্ভিত করেছে।" স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে মনীষী রোঁম্যা রোঁল্যা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করেন তার প্রতি সাড়া দিয়ে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয় 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম এণ্ড ওয়ার' এর সারাভারত কমিটি। রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করে ভারতবাসীর পক্ষে বিশ্ববোধ জাগ্রত করার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এইভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার এক ভাবসম্মিলন গড়ে উঠল।

১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে ভারতের

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এগারটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্ব প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু এই চারটি প্রদেশ ছাড়া বাকী সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে আসামেও কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা এবং সিন্ধুতে সমর্থিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শাসন ক্ষমতার আস্বাদ পাওয়ার ফলে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠল খুব অল্প দিনের মধ্যেই। গান্ধীজীর একটি বক্তব্যে তাঁর স্বীকৃতি রয়েছে : "কংগ্রেসের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে কংগ্রেসীরা তার যোগ্য নয়। সকলেই গদীর অংশ চায়। আর সেজন্য কমিটিগুলি দখল করবার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলছে। এটা স্বরাজ অর্জনের পথ নয়।"

(গান্ধী রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড)।

প্রাদেশিক মন্ত্রীত্ব গঠনের অব্যবহিত পরেই সারা দেশব্যাপী বন্দীমুক্তি আন্দোলন পুনরায় শুরু হয় এবং বিশেষ জোরদার রূপ পরিগ্রহ করে বাংলাদেশে। বাংলা দেশের হক্ মন্ত্রীসভা এই আন্দোলনের প্রতি অনুকূল মনোভাব গ্রহণ করেনি। ২৮শে জুন ১৯৩৭ বরিশালের এক জনসভায় ফজলুল হক রাজবন্দী মুক্তির বিরোধীতা করে বলেন, "সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলে জনশান্তি বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হবে।" এই মন্তব্যের প্রতিবাদে চতুর্দিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, ২৮শে জুলাই 'নিখিল বঙ্গ রাজবন্দী দিবস' পালিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি বন্দীদের মুক্তি দিতে থাকলে বাংলা দেশের আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে আন্দামান বন্দীদের অনশনকে কেন্দ্র করে। ১৯৩৭ সালের ২রা আগস্ট সন্ধ্যায় টাউন হলের সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ ভাষণে বলেন :

"শুধু বাংলা দেশেই শত শত যুবক এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে, বাংলা দেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোনই তোয়াক্কা রাখেন না ; বাংলায় ব্যক্তি স্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।

"আমরা জানি, ইতিপূর্বে আর একবার আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনজন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছিল। অনশনকারী বন্দীদিগকে বলপূর্বক খাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর নীতি তাহাই ঐ তিন জনের মৃত্যুর মধ্যে দুই জনের মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা আবার উহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকে ঐরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে দিব কি? বাংলা গবর্ণমেণ্ট দিবেন কি?"

১৪ই আগস্ট শান্তিনিকেতনের অপর একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ আবার বন্দীমুক্তি সম্পর্কে ভাষণে বলেন :

"পূর্বেই বলেছি, দণ্ড প্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনো প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করিনে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধিপদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন, আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদ করব।" (রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪ খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে থাকলেন না। তিনি এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চুপ গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহেরুকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানালেন। এরপর কংগ্রেস সংগঠন কেন্দ্রীয়ভাবে খানিকটা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই সময় বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে বামপন্থী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা ন্যাশনাল ফ্রন্টের তত্ত্বানুযায়ী কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করতে থাকেন। শ্রমিক কৃষক সংগঠন ছাড়াও ছাত্র সংগঠন বেশ জোরদার হতে থাকে। হরিপুরা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধীতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সামগ্রিকভাবে গান্ধী বিরোধী বাংলার মানসিকতা এ ঘটনায় যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং বামপন্থী আন্দোলনেও বেগের সঞ্চার হয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী বহু গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেন। এই সম্মেলন বুদ্ধিজীবীদের মতাদর্শ-গত আন্দোলনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। এই সম্মেলনে প্রদত্ত বুদ্ধদেব বসুর ভাষণটিকে কেন্দ্র করে 'অগ্রণী' পত্রিকায় বাদ প্রতিবাদের ঝড়ও ওঠে।

এই সময় বাংলার হক্-মন্ত্রীসভার পতন আসন্ন হওয়ায় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। কংগ্রেস ত্যাগ করে হক্ মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার জন্য যে নলিনীরঞ্জন সরকার দল থেকে বিশ বৎসরের জন্য বহিস্কৃত হয়েছিলেন তিনিই জি, ডি বিড়লার সহযোগিতায় কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য গান্ধীজী, সর্দার প্যাটেল প্রমুখের জন্য কলকাতা-ওয়ার্ধা-বোম্বাইতে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। যতদূর জানা যায় এ ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য ঘটেছিল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতিপদে নির্বাচন নিয়ে বেশ জটিলতা দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও দেশের প্রগতিশীল ও বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন চাইছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্রের পরিবর্তে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা অন্য কাউকে এ পদে নির্বাচিত করাব প্রচেষ্টায় লেগে পড়লেন। এই জটিল অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়করূপে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে কার্যতঃ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দেশবাসীব সমর্থন প্রকাশ করেন। মৌলানা আজাদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার পব গান্ধীজীব মনোনীত হিসেবে পট্টভী সীতারামাইয়াব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হল এবং ১৯৩৯ সালেব ২৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হলেন। এই বিজয় দক্ষিণপন্থাব বিরুদ্ধে বামপন্থীদেব বিজয়রূপে সাবাদেশে বিশেষ করে বাংলা দেশে বিপুল সাড়া জাগাল।

সুভাষচন্দ্রেব নির্বাচন কংগ্রেস সংগঠনে যে প্রবল অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি কবল ত ১৯৩৯ সালেব ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসে এক ঐতিহাসিক পবিণতি লাভ করল যাব প্রভাব ভাবতেব ইতিহাসে সুদূবপ্রসাবী হয়ে দেখা দিল। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীব নেতৃত্বেব প্রতি আনুগত্য ও আস্থাজ্ঞাপক যে প্রস্তাব পেশ কবেন তাব উদ্দেশ্য ছিল সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রেব ভুমিকাকে খর্ব কবা। সংখ্যাধিক্যে পন্থেব এই প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ হয়ে যাবাব পর সংকট আবও ঘনীভূত হল। এদিকে বামপন্থী গোষ্ঠীব মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্টবা জওহবলালেব অনুসবণে নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ভোটদানে বিবত থাকেন। পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যাওযাব পব ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ কবার সুযোগ প্রায় থাকে না। সুভাষচন্দ্র এ ব্যাপারে গান্ধীজীকে হস্তক্ষেপ কবে একটি যৌথ মোর্চা গঠনের আবেদন জানান। গান্ধীজী স্পষ্ট জানিয়ে দেন ঐক্যবদ্ধ কাজের কোন সুযোগ নেই সুতবাং সুভাষচন্দ্র পৃথক কমিটি গঠন কবে এগিযে যেতে পাবেন। অবশেষে তাঁব পীড়াপীড়িতে গান্ধীজী এ, আই, সি, সিব কলকাতা অধিবেশনে মধ্যস্থতার আশ্বাস দিলেও কার্যতঃ দেখা গেল দক্ষিণ-পন্থীরা সংগঠনের সমস্ত ব্যাপারেই সভাপতি সুভাষচন্দ্রেব মত বা প্রস্তাবকে বাতিল করে দিলেন। ফলে বাধ্য হয়েই সুভাষচন্দ্র ২৯শে এপ্রিল ওযেলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এ, আই, সি, সিব অধিবেশনে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু সুকৌশলে অতিক্রত পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করেই রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি রূপে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। ৩রা মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্র 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দল গঠনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। অনতিকাল পরেই ফরওয়ার্ড ব্লক,

কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি, রয় পন্থী প্রভৃতি দল উপদল নিয়ে 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। বলাবাহুল্য কংগ্রেসে এই ভাঙন নেতৃপদের দ্বন্দ্ব জনিত নয়, স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার প্রশ্নেই দেখা দেয়। কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের পরে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে মন্ত্রীত্ব চালানই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে অনুসরণ করেন। আর কংগ্রেস সংগঠন এখন সম্পূর্ণতই দক্ষিণপন্থীদের দখলে চলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে এম, এন, রয় বামপন্থীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জওহরলালের সঙ্গে হাত মেলালেন।

দক্ষিণপন্থীদের সংগ্রাম বিমুখতার বিরুদ্ধে ১২ই আগস্ট থেকে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালনের আহ্বান জানান হয় বামপন্থী সমন্বয় কমিটির পক্ষে। ৫ই আগস্ট বঙ্কিম মুখার্জী, মুজফ্ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে সংগ্রামের আদর্শ উচ্চে তুলে ধরে এই কর্মসূচী সফল করার আবেদন জানান। এরপর সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকেও অপসারিত করা হয় এবং তিন বছরের জন্য সমস্ত কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সুতরাং ঘটনাবলী অনিবার্যভাবেই দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে যখন এত রাজনৈতিক দুর্যোগ তখন বিশ্ব পটভূমিতে আরও বড় ঝড়ের প্রস্তুতি চলছিল, যা দুর্বার গতিতে সমগ্র বিশ্বের উপর দিয়ে অচিরেই প্রবাহিত হল। তার এই ঝড় দেশীয় রাজনীতির বিন্যাসও উল্টোপাল্টা করে দিল। ফ্যাসিস্ট জার্মানী একে একে অষ্ট্রিয়া, সুদেতেন, চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে উন্মাদের মতো পোল্যাণ্ডের উপর থাবা বিস্তারে উদ্যত হয়। ১৯৩৯ সালের ২২শে আগস্ট হিটলার সেনাপতিদের এক সভায় বলেন: "জার্মানীর পক্ষে বর্তমান সময় খুব অনুকূল। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে কোন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী লোক নেই। কোন জবরদস্ত, কোন কাজের লোক নেই। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সঙ্গে নৌপাল্লা দিতে গিয়ে এই দুই দেশেরই অবস্থাই কাহিল হয়েছে। অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধায়োজন এদের মোটেই উপযুক্ত নয়, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ফ্রান্সের চিরাচরিত মৈত্রীর বন্ধন ভেঙ্গে গেছে, ফ্রান্সের জন্মের হার অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাচ্যখণ্ড নিয়ে ব্রিটিশ নাজেহাল হচ্ছে। এমন অনুকূল সময় দু-তিন বৎসরের বেশী নাও থাকতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ বাধাবার এই তো সুযোগ।...চেম্বারলেন ও

দালাদিয়েরের মত অতি তুচ্ছ কৃমিকীট এত ভীতু যে, তারা আক্রমণের সাহস পাবে না। আমার কেবল একটা মাত্র ভয় আছে—চেম্বারলেন কিংবা তার মত আর কোন নোংরা শুয়োরের বাচ্চা কোন প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে বা মত বদলাতে পারে। কিন্তু দরকার হলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি পর্যন্ত তাকে ফটোগ্রাফারদের সামনে পেটে লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দেব।…পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কেবলমাত্র সময় নেবার জন্যে এবং রাশিয়ার সঙ্গে সদ্য সদ্য যে অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে তাও সেই উদ্দেশ্যে—ভদ্রমহোদয়গণ, পোলাণ্ডের অনুরূপ দশা তাদেরও ঘটবে। স্তালিনের মৃত্যুর পর আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকেও চূর্ণ করব।"

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার বাহিনী ভোরবেলা পোলাণ্ড আক্রমণ করল। এই আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টির জন্য হিটলার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা আর এক বীভৎস ঘটনা। নিজেদের কিছু সৈন্যের গায়ে পোলিশ সৈন্যের পোষাক পরিয়ে সীমান্তবর্তী গ্লিভিৎস রেডিও স্টেশন নিজেরাই আক্রমণ করাল এবং বন্দীশালা থেকে কয়েকজন শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে এনে গুলি করে হত্যা করে বিশ্ববাসীকে দেখান হল পোলাণ্ড আগে আক্রমণ করেছে। শুরু হল পোল-জার্মান যুদ্ধ। মাত্র আঠার দিনের যুদ্ধে পোলাণ্ড হিটলারের দখলে এল।

এরপর ১৯৪০-৪১ সালে হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণ আসলে রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব। 'অপারেশন সী-লায়ন' এর পাশাপাশি 'অপারেশন বারবারোসা'র পরিকল্পনাও চলছিল। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিটলার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে বাগাড়ম্বর করে বলেন: "একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হল বাল্টিক রাজ্যগুলি ও লেনিনগ্রাদ দখল করা।…যখন বারবারোসা শুরু হবে তখন সমস্ত বিশ্বের দম বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ কোন মন্তব্য করবে না।…রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ যা সেনাধর্ম পালনের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। এই যুদ্ধ মতাদর্শগত ও জাতিবিভেদগত এবং অভূতপূর্ব নির্দয়তা ও নিরবচ্ছিন্ন নির্মমতার পথে চালাতে হবে।…রুশ কমিশাররা ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের সরাসরি বিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহক। অতএব এই কমিশারদের ধ্বংস করতে হবে।"

(উইলিয়াম শিয়েরার—তৃতীয় রাইখের উত্থান ও পতন। পৃঃ ৯৯৩)।

সমস্ত অনাক্রমণ চুক্তি পদদলিত করে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোরবেলায়

হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। হাজার হাজার নাৎসী বিমান দেখা গেল রাশিয়ার আকাশে, পিছনে ট্যাঙ্ক বাহিত হাজার হাজার সৈন্য। সমাজতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে দেশের উন্নয়নের শান্তিপূর্ণ কাল শেষ হয়ে গেল, সমগ্র জাতিকে দ্রুত এই সর্বাত্মক আক্রমণের মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। আক্রমণ আকস্মিক হলেও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির কোন অভাব স্তালিন রাখেন নি। আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে নিয়ে সমগ্র দেশ স্তালিনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধে মরণ পণ সামিল হলেন। এই যুদ্ধের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্তালিন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন: "ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা শুধু দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সাহায্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম তার সঙ্গে এক যোগে পরিচালিত হবে। মানুষের স্বাধীনতা হরণ তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারের ফ্যাসিবাহিনীর এই অভিযানের যারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যারা সমর্থক তাঁরা সকলেই এই দলে মিলিত হবেন। তার পর একটানা চার বৎসর চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে মদমত্ত হিটলার বাহিনী ১৯৪৫ সালের ৮ই মে বার্লিনে শর্তহীন আত্মসমর্পণের কাগজে সাক্ষর করল, বার্লিনের বুকে তখন লাল ফৌজের বিজয় পতাকা। এই যুদ্ধে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা পেল না, ফ্যাসিস্ট জার্মানীর যুদ্ধোন্মাদনা চিরতরে স্তব্ধ হল এবং বেশ কয়েকটি দেশে মুক্ত বলে ঘোষিত হল। এর পর মিত্রশক্তিদের পক্ষ থেকে স্তালিনের কাছে আহ্বান এল, সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া যোগ দিল। স্তালিন ভেবে দেখলেন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব যতদিন আছে শান্তির আশু সংকট ততদিন নিরসন হচ্ছে না। অতএব ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট রুশ বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করায় বেপরোয়া ব্যর্থ প্রতিরোধ প্রয়াসের পর ২রা সেপ্টেম্বর জাপানী বাহিনী নতজানু হয়ে হার স্বীকার করে নিল এবং এর ফলে মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন, উত্তর কোরিয়া ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সমূহ মুক্ত হল। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে স্তালিন

সগৌরবে ঘোষণা করেন "অতঃপর পশ্চিমে জার্মানী ও পূর্বে জাপানী আক্রমণের বিপদ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। বিশ্ববাসীর জন্য দীর্ঘকাল আকাঙ্খিত শান্তি আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

পূর্বেই বলেছি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ংকরতা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সমগ্র বিশ্বের বয়স যেন কয়েক যুগ বাড়িয়ে দিল। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সামনে শত্রু ও মিত্র যাচাই করা সহজ হয়ে গেল। ফ্যাসিবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির মধ্যকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চরিত্রও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। এ শিক্ষা থেকে ভারতবর্ষও দূরে নয়। যদিও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আঁচ ভারতবর্ষের মাটিতে সামান্যই পৌঁছেছিল কিন্তু যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপকভাবেই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্ব ও ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের নীতি না অনুধাবন করলে কবি সুকান্তর জীবন ও সৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তৎকালের সর্বাপেক্ষা যুগ সচেতন কবি, যাঁর সৃষ্টিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী দলিলের মতো মূর্ত হয়ে আছে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা রোঁলা, বারবুস, গোর্কীর শিষ্য, শহীদ কডওয়েল, র‍্যালফফক্স, ফেলিসিয়া ব্রাউন প্রমুখের উত্তরাধিকারী। তিনি ভারতবর্ষের বামপন্থী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারার একজন সৈনিক।

সোভিয়েতে হিটলারের আক্রমণের ছ' মাসের মধ্যেই জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা ও অপ্রতিহত গতিতে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত আগমন ভারতের রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি টলিয়ে দেয় এবং এক জটিলতা সৃষ্টি করে। কেননা কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলই ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হননি বলা চলে। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের জার্মানীতে গমন এবং জার্মানী ও জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, অন্যদিকে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন এক পরস্পরবিরোধী জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে বামপন্থী জোট ক্রিয়াশীল ছিল তাও ভেঙ্গে যায়। ফলশ্রুতিতে ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সংঘ প্রভৃতি

সংগঠনের মধ্যেও সাময়িক বিভ্রান্তি ও মতান্তর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বেআইনী। আর সরকার এবং জাতীয়তাবাদী সমস্ত গোষ্ঠীর রোষটা কেন্দ্রীভূত হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেই। কারণ কমিউনিস্টরা দেশের মানুষকে আশু বিপদ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য জনযুদ্ধের আহ্বান দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট বিদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এবং ফ্যাসিপন্থীরাও কমিউনিস্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে **Friends of the Soviet Union** গঠিত হয় এবং এর বাংলাদেশ কমিটির নাম দেওয়া হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ।' এই 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' ও ছাত্র ফেডারেশনের মাধ্যমেই প্রধানত ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধের তাৎপর্যটি জনগণের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা চলে।

সিঙ্গাপুর পতনের পর 'আজাদ হিন্দ রেডিও' থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর বেতার ভাষণে ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন: **"The fall of Singapore means the collapse of the British Empire, the end of the iniquitious regime which it has symbolised and the dawn of a new era in Indian History……And the enemies of British Imperialism are natural allies of India just as the allies of British Imperialism are today our natural enemies. (The Indian Struggle** পৃ: ৪৪১-৪২)। ব্রিটিশের উদ্বেগজনক অবস্থায় কংগ্রেস নেতারাও স্বাধীনতার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলে ক্রিপস মিশনের আগমন, কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠক এবং বৈঠকের ব্যর্থতার ফলে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আহ্বান ইত্যাদি ঘটনা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ সরকার ইতিমধ্যে ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স জারি করে, সভা সমিতি নিষিদ্ধ করে ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনগণের উপর নিপীড়ন নামিয়ে আনে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও যুদ্ধ বিরোধী সংগ্রাম ক্রমশই বিস্তার লাভ করতে থাকে। কানপুর, বোম্বে, আসাম, ধানবাদ ও বাংলাদেশে শ্রমিকরা একের পর এক ধর্মঘট আন্দোলন সংগঠিত করে। সব মিলিয়ে ১৯৪১ সালের মে মাসের মধ্যেই সারা ভারতে কুড়ি হাজারের উপর বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারী আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিপথ চালিত উগ্রজাতীয়তাবাদীদের হামলা। মূল শত্রুকে চিহ্নিত না করতে পেরে বিভ্রান্ত ও ফ্যাসিবাদের পরিপোষক কিছু কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবিরোধী জিগির তুলে মারদাঙ্গা শুরু করে দিল। রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পূর্বে ৮ই মার্চ ১৯৪২ 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের' উদ্যোগে ঢাকা শহরে যে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনে একটি মিছিল পরিচালনা করে আনার সময় ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা তৎকালের কমিউনিষ্ট কর্মী ও তরুণ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যার ফলে বাংলা সাহিত্য জগতে এক মহীরুহের সম্ভাবনা বিনষ্ট হল। এই হত্যাকাণ্ড যেমন একদিকে চরম সর্বনাশ সাধন করল তেমনি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে গভীর সচেতনতা এনে দিল। ২৮শে মার্চ ১৯৪২ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা থেকেই 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়। এই সংঘের মুখপত্র রূপেই ১লা এপ্রিল শ্রদ্ধেয় জননেতা বঙ্কিম মুখার্জীর সম্পাদনায় 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস বাদে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ থেকে 'জনযুদ্ধ' সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। স্মরণ রাখা দরকার ইতিমধ্যে ২২শে জুলাই, ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আবার আ নী বলে ঘোষিত হয়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্র জটিলতার মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। উগ্রজাতীয়তাবাদের মারমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে জাগ্রত করার প্রয়াসে এই সংঘের ভূমিকা অতুলনীয় এবং ঐতিহাসিক। সংঘের ঘোষণাপত্রে বলা হয়ঃ

"ভারতবর্ষ আজ অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন। আমাদের গৃহ, পরিজন, জীবিকা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্যন্ত জাপানের আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছে। আমরা এতদিন যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছি যে মুক্তির জন্য অপরিমেয় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই মুক্তি যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ঠিক সেই সময় ফ্যাসিস্টরা কঠিনতর শৃঙ্খলে আমাদের বাঁধিবার জন্য উদ্যত, জাপানী আক্রমণকে যদি আমরা প্রতিরোধ করিতে না পারি তবে এদেশে নূতন করিয়া এমন এক বিদেশী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা আমাদের এতদিনকার সংগ্রামার্জিত কোন অধিকারই লেশমাত্র টিকিয়া থাকিতে দিবে না—আমাদের কংগ্রেস, আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য বিবিধ অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

"এই চরম সংকটকালে সাহিত্যিকসমাজ দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও বৃত্তিজীবীগণ অপেক্ষা সমাজে সাহিত্যিকদের মর্যাদা ও প্রভাব অনেক বেশী। এই মর্যাদা ও প্রভাবের উপযুক্ত মূল্য দিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ বিপন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার দৃঢ় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করিবার, বিভ্রান্ত জনসাধারণের চিন্তাকে আত্মসমর্পণ ও আত্মঘাতেব পথ হইতে ফিরাইয়া পরিত্রাণের পথে চালিত করিবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের।

"শুধু স্বজাতি ও স্বদেশ নয়, শিল্প ও সংস্কৃতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবাব দাযিত্ব আজ সাহিত্যিকদের পক্ষে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টিব ভার আমার, বক্ষাব ভার অপরের এই মনোভাব আজ সাহিত্যিককে বর্জন করিতে হইবে। নিজেব সৃষ্টি রক্ষায় তাহার নিজেকেই অগ্রণী হইতে হইবে। ফ্যাসিস্টবা জানে, যে দেশেব স্বাধীন চিন্তানায়ক ও মনীষীবা তাহাদেব স্বার্থসিদ্ধিব বড বিঘ্ন তাই আজ রোঁম্যা রোঁল্যা বন্দী টলস্টয়েব স্মৃতি অপমানিত; প্রবাসে নির্বাসনে বৃদ্ধ ফ্রয়েডেব জীবনাবসান, আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখ মহামানবগণ স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত। ফ্যাসিস্ট জার্মানীব মন্ত্রশিষ্য জাপানে এবং জাপান-অধিকৃত দেশে অসংখ্য লেখক ও শিল্পী নিহত ও নির্যাতিত। জার্মানীতে ইউবোপেব অমর সাহিত্য সৃষ্টিব বহ্ন্যুৎসব এবং চীনের বিশ্ব বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী বোমার অগ্নিকাণ্ড—সংস্কৃতি ধ্বংসের একই অভিযান। এই ধ্বংস বন্যাব গতিরোধ কবিবাব জন্য সাহিত্যিককে আজ তাহার সাহিত্য ও সর্বস্ব পণ করিতে হইবে এবং এই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিযা নূতন জগতেব নূতন সাহিত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।"

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তখনকাব বহু নামী ও মেধাসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছিলেন জটিল বহুমুখী রাজনৈতিক পবিস্থিতিব মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধে মানুষকে জাগ্রত ও সংগঠিত করার কাজে। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে গণনাট্য সংঘ যে মঞ্চে সমবেত হয়েছেন পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়ীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক সৃষ্টির উৎসব যার মধ্যে যুক্ত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল জানা, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক,

মনোরঞ্জন বড়াল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শওকত ওসমান প্রমুখ।

এমন একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে কবি সুকান্তর আবির্ভাব। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক নেপাল মজুমদার বলেছেন: "সুকান্তর কবি প্রতিভার স্ফুরণ যত অল্প বয়সেই হোক না কেন, ৪২ সালের এই প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত ও ঝড়ের অভিঘাতেই তাঁর কবি মানস ও প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ এবং বিকাশ ঘটল। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি যেন এই মহাসংগ্রামে তাঁর জন্য ইতিহাসে নির্দেশিত স্থান এবং তার গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করে নিজ স্কন্ধে তা তুলে নিলেন। বুঝতে পারলেন, কবি হিসেবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ, কবিতার মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনচিত্তকে এই মহাসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা—অগ্রগামী চারণ কবির মত পৃথিবীর দেশে দেশে তার সাফল্য ও জয়বার্তাগুলি তাঁর নিজ দেশবাসীর কাছে পৌছে দেওয়া, কবিতায় আর গানে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মাত্র একুশটা বছর

"বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। শুধু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে। আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়।"

বন্ধু অরুণাচল বসুকে লিখিত এক পত্রে সুকান্ত মাত্র পনের বছর বয়সে কথাগুলি বলেছিলেন। এই মৃত্যু ভাবনার পশ্চাৎপটে ছিল জাপানী বোমার আক্রমণ আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত কলকাতা। কিন্তু কে ভেবেছিল সেদিন বন্ধুকে লেখা চিঠির শঙ্কা ও কৌতুকে ভরা কথাগুলি আর মাত্র পাঁচটি বছর পেরিয়ে একুশ বছরের সীমানায় এসে এমন নির্মম সত্য হয়ে উঠবে। যদিও সুকান্তর সেই ভালবাসার পৃথিবীতে বসন্ত এখনও আসে নি কিন্তু তাঁর পরিচয় লেখা হয়ে আছে উত্তরকালের পাতায় পাতায়, মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে, জীবন সংগ্রামের স্তর পরম্পরায়।

"চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।"

সুকান্তর সংক্ষিপ্ত জীবন এই অঙ্গীকার রক্ষারই ইতিহাস। কৈশোর থেকেই প্রজ্বলিত আদর্শের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণের পথে জীবনটি উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দিষ্ট ছিল সমাজটাকে বদলে জঞ্জাল মুক্ত করে সুস্থ সুন্দর করে যাবেন জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে। কবি সুকান্ত ও কর্মী সুকান্ত অভিন্ন। এত অল্প বয়সে বঞ্চিত নিপীড়িত, অসহায় মানুষের এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে ওঠা বিরল-দৃষ্ট ঘটনা। তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁরই কবিতায়:

আমি এক ক্ষুধিত মজুর

আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু : এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।

লক্ষ্য নির্ধারণে, শত্রু নির্বাচনে সার্থক এই জীবনটি ছোট্ট হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আর এই তাৎপর্যের মধ্যেই মিলেমিশে রয়েছে তাঁর সৃষ্টির অসীম সাফল্যের রহস্য। গণজীবন, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সৃষ্টিধারা—এই সব কিছু একাকার হয়ে সুকান্তর মধ্যে এক কবি-ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল ; যে ব্যক্তিত্ব সমকালে স্পষ্ট, উত্তরকালে স্পষ্টতর। শুধু সৃষ্টি-মূল্যেই নয়, যে জীবন কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছিল জনগণের, সেই জীবনটিও প্রণিধানযোগ্য ও অনুকরণীয়।

'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন'—বাংলা কাব্যে এমন একটি নিটোল বৈপ্লবিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর আচার আচরণে, চেহারায় কিন্তু দামাল ছেলের কোন পরিচয় ছিল না। ধুতি-শার্ট পরণে, মাথা ভর্তি একরাশ চুল, সামনে ঈষৎ ঝুঁকে চলা শ্যামবর্ণ রোহারা চেহারার ছেলেটি আর পাঁচটা সমবয়সী ছেলের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। খেলার মাঠে ছুটোপুটি, অকারণ গল্পগুজব করা বালক বয়সের এই স্বভাবধর্ম সুকান্তের মধ্যে ছিল না বললেই চলে, ঐ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন বয়স্কদের দলে। যেন রাজ্যের চিন্তা ও সমস্যা ভিড় করে থাকতো তাঁর ঐ ছোট্ট মাথাটিতে। ধীর অথচ ঋজু ছিল বাক্‌ভঙ্গি, কোথাও ছিল না এতটুকু বাহুল্য। শান্ত গভীর দুটি চোখ তুলে লজ্জানম্র প্রকৃতির ছেলে সুকান্ত যখন কথা বলতেন তখন সহজেই অপরের হৃদয় স্পর্শ করতেন। স্নেহ-মমতা লাভের জন্মগত অধিকার নিয়ে যেন তিনি এসেছিলেন যদিও অতি শৈশবেই হারিয়েছিলেন পরম স্নেহের আধার মাতৃক্রোড়। যার নিজের ঘরের কোণে বঞ্চনা তার জন্য বোধ করি অপেক্ষা করে থাকে বিশ্বনিখিল স্নেহাঞ্চল বিছিয়ে। কথাটা আপাতভাবে ভাবালু মনে হলেও সুকান্তর ক্ষেত্রে সত্য।

১৩৩৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ কালিঘাটের ৫২ নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ীতে সুকান্তর জন্ম। বাড়ীটি মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের।

সুকান্তদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববাংলার ফরিদপুরে। পিতামহের অকাল-মৃত্যুতে তাঁর অসহায় জেঠামশাই ও পিতাকে অতি অল্প বয়সেই ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা শহরে এসে উঠতে হয়। সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাগ্মী হিসেবে তাঁর জেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সেকালে খুব নাম ডাক ছিল। তাঁর পিতা

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্কুল কলেজের শিক্ষা বেশীদূর গ্রহণ করতে না পারলেও স্বীয় চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। সুপণ্ডিত সুসংস্কৃত জেঠামশাই ও পিতার শিক্ষার পরিবেশে বাড়ীতে এক শিল্পময় আবহাওয়া গড়ে ওঠে। ছোটবেলা মার মুখে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণের গল্প, পিতার কাছে সংস্কৃত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয় সুকান্তর চৈতন্যে অনুসন্ধিৎসার অঙ্কুর উন্মোচন করে এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। পিতামহী ও মা ছাড়া আর যে কিশোরী সুকান্তর শিশু মনে কাব্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটানয় সহায়িকা ছিলেন তিনি হলেন জেঠতুত দিদি রাণী। এই রাণীদিদির কাছেই সুকান্তর দীর্ঘ সময় কাটত।

প্রাচীন সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য পাঠ ও চর্চার পরিবেশও গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠীর নব্যধারার পঠন-পাঠন নিয়মিত বিষয় ছিল। সেকালের খ্যাতনামা লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর গল্প 'সুকান্ত'র নামানুসারে রাণীদিদি ছোট্ট ভাইটির নাম রেখেছিলেন। গল্পের নায়ক সুকান্তরও যৌবনের প্রারম্ভেই ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়েছিল।

সুকান্তদের সুখী স্বচ্ছল যৌথ পরিবারটি তাঁর মাত্র সাত-আট বছর বয়সের সময়ই রাণীদিদির আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণে ভেঙ্গে যায়। জেঠামশাই বেলেঘাটার বাড়ী ছেড়ে উত্তরপাড়া চলে যান আর সুকান্তর বাবা বেলেঘাটাতেই থাকেন। জেঠামশাই আবার কিছুদিন বাদে শান্তি না পেয়ে বেলেঘাটার বাড়ীতে ফিরে আসেন। কিন্তু যৌথ পরিবার আর জোড়া লাগল না।

এই পারিবারিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সুকান্ত শুধু বড় হতে থাকলেন তাই নয়, তাঁর কাব্যের স্ফুরণও ঘটতে শুরু করেছে ততদিনে। প্রায়ই ছড়া লিখে বাড়ীর সকলকে চমকিত করে দিচ্ছেন। বালকের এই বিশেষ গুণটিকে ঘিরে সকলেরই আনন্দ। যেমন:

(১) বল দেখি জমিদারের কোনটি ধাম?
জমিদারের দুই ছেলে রাম শ্যাম।
রাম বড়ো ভালো ছেলে পাঠশালা যায়
শ্যাম শুধু ঘরে বসে দুধ ভাত খায়।

(২) রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন

দুই বোন রমা রাণী
সবে করে কানাকানি
দুই জনের হবে ভালো
করিবে সে ঘর আলো সীতার মতন।

স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি, ছন্দোজ্ঞান ও উপযুক্ত শব্দ বাছাইয়ের ক্ষমতার পরিচয় এখান থেকেই পাওয়া যায়। এই সময় তাঁকে বেলেঘাটার 'কমলা বিদ্যামন্দির' এ ভর্তি করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তাঁর প্রতিভার দ্রুত উন্মেষ ঘটতে থাকে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের দৃষ্টি তিনি সহজেই আকর্ষণ করেন। তাঁর তৎকালের সহপাঠী শৈলেন সরকার স্মৃতি কথায় লিখেছেন :

"বয়সের তুলনায় সুকান্ত যে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে সেটা আমরা সে সময়েই বুঝতে পারতাম। স্কুলের ভালো ছেলেদের সে ছিলো একজন। কিন্তু অন্য সকলের তুলনায় তার পড়াশুনা ছিলো অনেক বেশী, যা সে-বয়সে আমরা ভাবতেও পারতাম না। ক্লাশে ভাল রচনা লিখতে পারার প্রশংসা সুকান্ত একাই কুড়াতো। এজন্য মাস্টারমশাইরা ওকে বিশেষ স্নেহ করতেন। · একদিন এসে বললো, আমরা সবাই মিলে একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করবো। শোনা মাত্রই আমরা সবাই রাজী। উৎসাহের সঙ্গে সুকান্তর পরিকল্পনা মতো সবাই কাজে লেগে গেলাম। লাইনটানা ভালো কাগজ ও চাইনিজ-ইংক কিনে আনা হলো। যথাসময়ে আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা বার হলো। সুকান্ত এই পত্রিকার নাম দিয়েছিল 'সঞ্চয়'। 'সঞ্চয়' এর প্রথম রচনাটি ছিলো সুকান্তর লেখা একটি সুন্দর হাসির গল্প। ··কতরকমের বই যে সুকান্ত পড়তো এবং মাঝে মাঝে আমাদের পড়তে দিতো, তা ভেবে পাই না। ছোটোদের কি বড়দের, গল্প কি কবিতা, ডিটেক্‌টিভ কাহিনী কি নীরস প্রবন্ধ কোনও কিছুই বাদ দিতো না সে। সুকান্তর পাঠ্য তালিকায় যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তেমনি হেমেন্দ্রকুমার ও দীনেন্দ্রকুমারের স্থানও ছিলো। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন ওর 'পথের পাঁচালী' পড়া হয়ে গেছে। এই 'পথের পাঁচালী' ওর কিশোর মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিল। বলেছিলো, 'ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সমান আদরে এই বই সকলের ঘরে রাখা উচিত।' ····· রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিলো। কলকাতার মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে সুকান্ত গিয়েছিলো শুধু রবীন্দ্রনাথকে

দেখার জন্য। পরে আমাদের বলেছিলো রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওর প্রণাম করবার ভীষণ লোভ হচ্ছিলো।" শৈলেন বাবুর স্মৃতি কথা থেকে আরও জানা যায় ছাত্রদের অভিনীত 'ধ্রুব' নাটকে সুকান্ত নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

ইতিমধ্যে সুকান্তর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন মায়ের চিকিৎসা সূত্রে তাঁরা সকলে কালিঘাটে মাতামহের বাড়ীতে এলেন। এখানে এসে সুকান্তর বিকাশ পথে যুক্ত হল সুপণ্ডিত মাতামহের সংস্কারমুক্ত মন ও মনন, মাতামহীর গভীর ভালবাসা এবং ছোট মামা বিমল ও মাসতুতো ভাই ভূপেনের সান্নিধ্য। খেলাধূলার পাশাপাশি তাঁদের চলতো সংস্কৃতি চর্চা। তাঁরা নাটক লিখতেন এবং বাড়ীতেই স্টেজ তৈরী করে অভিনয় করতেন। সুকান্তর রচনা ও পরিচালনায় একবার তাঁরা বিজয় সিংহের 'লঙ্কা বিজয়' অভিনয় করেন। কিছু দিনের মধ্যেই সুকান্তর মা মারা গেলেন নিদারুণ ক্যানসার রোগে মধুপুরে। সুকান্ত তখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জেঠাইমার কাছে ছিলেন। মার অবর্তমানে সংসারের যে কি হাল হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে কবিভ্রাতা অশোক ভট্টাচার্যের গ্রন্থে: 'মার মৃত্যুর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটে নি। কিন্তু মাকে হারিয়ে অন্য ভায়েরা কলকাতায় ফিরলে সেই ছন্নছাড়া সংসারে এসে এক শ্বাসরোধকারী শূন্যতার মধ্যে কিশোর সুকান্ত অনুভব করতে পারলেন তাঁর জীবনের এই অপূরণীয় ক্ষতিকে। অন্য কোনো নারীর অনুপস্থিতিতে কর্ত্রীহারা পরিবারটিও হয়ে দাঁড়াল মেস বাড়ির সামিল। বড়রা যে যার কাজে বেড়িয়ে গেলে সুকান্ত আর তার ছোট ভাই কটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতো সারাদিনের স্নেহ মমতাহীন রুক্ষতা।"

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের পূর্বেই পরপর দুজন ঘনিষ্টতম মানুষ রানীদিদি ও মার মৃত্যু সুকান্তর মনকে যেন হঠাৎই পরিণত করে তুললো। জীবন শুরুর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তা, পরিপার্শ্বে স্নেহ মমতাহীন রুক্ষতা, বয়সসন্ধি সুলভ বিষাদময়তা সুকান্তর চেতনায় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির মাঁজাল বিস্তার করছিল তা সৃষ্টিধারায় নানারঙের ফুল হয়ে ফুটে উঠছিল ক্রমশ। আপন ধর্মেই এই বয়সটা পারিবারিক গণ্ডী থেকে বৃহত্তর জগতে প্রবেশের পূর্বে এক তাৎক্ষণিক বিচ্ছিন্নতায় ভোগে, সবকিছুর মধ্যেই যেন এক নিসঙ্গতা পেয়ে বসে। সুকান্তর পক্ষে এই নিসঙ্গতাবোধ আরও মর্মান্তিক হয়েছিল কারণ তাঁর না ছিল স্নেহাঞ্চল বিছানা গৃহকোণ, না ছিল অজস্র

সমবয়সী বন্ধুবান্ধব ঘেরা খেলার জগৎ। তাঁর এই পর্বের মানসিকতা সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়েছে একটি আশ্চর্য সার্থক কবিতায় :

"হে পৃথিবী আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়, …
বিস্মৃত শৈশবে
যে আঁধার ছিল চাবিভিতে
তারে কি নিভৃতে
আবার আপন করে পাব
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যান,
স্মৃতির মর্মরে ?
প্রভাত পাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান
তার আজ তিক্ত অবসান।"

'রাখাল ছেলে' রূপক গীতি কাব্যও এই একই মানসিকতার ফসল। এই সময়কার অর্থাৎ প্রায় ন'বছরের সৃষ্টি সম্ভার বিধৃত ছিল একটি বাঁধান খাতায়—হয়তো সেই খাতাটি যেটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন শ্রমিক নেতা কে, জি, বসু। সেও এক মজার ঘটনা। শ্রী বসুর ভাষায় :

"এক দিনের ঘটনা বলছি। বাড়িতে আমার ঘরটি চুনকাম করিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছি আমি। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি কলি দেওয়া সাদা দেওয়ালে কাঠকয়লার কালো আঁচড়ে কে কি লিখে রেখে গেছে। আমি তো অবাক! মাকে ডেকে বললাম, মা, দেওয়ালে এসব লিখলো কে ?

মা বললেন, তা তো জানি না, সুকান্ত সারাদিন বসেছিলো, বোধ হয় সেই লিখেছে।

সুকান্তদের আর আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিলো। সেই বেড়ার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম সুকান্তকে। সুকান্ত বাড়িতেই ছিলো, নেমে এলো।

ওকে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বকুনি দিলাম খুব। দেয়ালের দিকে দেখিয়ে বললাম, এসব কে লিখেছে—তুমি ?
সুকান্ত ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো, তার পর মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমি একটা খাতা সুকান্তর হাতে দিয়ে বললাম, কক্ষনো আর দেয়ালে

লিখো না। এবার থেকে যখন ইচ্ছা হবে এই খাতায় লিখবে। সুকান্ত ঘাড় নাড়লো। তার পর নম্র কণ্ঠে বললো, দেয়ালটা আমি মুছে দেবো কি?

বললাম, না, মুছলে আরো কালো দাগ হয়ে যাবে, ওর যা করার আমিই করবো, তোমায় ভাবতে হবে না।

সুকান্ত আর কোন কথা না বলে খাতা হাতে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন আমার ঘরের দেয়ালে সুকান্ত এই কবিতাটিই লিখেছিলো :

"যেখানে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা,
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।"

এই পর্যায়ে সুকান্তর আর দুটি গীতি কাব্য মধুমালতী ও সূর্য প্রণাম। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধার্ঘ 'সূর্য প্রণাম'। ছাত্রবৃত্তির পর উচ্চ বিদ্যালয়ের দুয়েকধাপ এগিয়েই কবির মানস পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা, বিষণ্ণতা ক্রমশ বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে ক্ষয়ে ক্ষয়ে কবির চিন্তা চেতনায় এক প্রত্যয়সিদ্ধ রূপ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা ধ্বনি তখন সারা পৃথিবীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, মানব সভ্যতা এক সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন। কবির হৃদয়ে পৌঁছে গেছে সেই বিশ্বময় যন্ত্রনার বাণী, পরিত্রাণের অভীপ্সা। কবির কণ্ঠেও তাই অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইশারা :

"পৃথিবী বিকৃত-রাত্রে অভিশপ্ত প্রসব ব্যথায়
রুদ্ধশ্বাসে পানীয় মেদসিক্ত সুরা।
আবার নতুন সৃষ্টি জন্ম নেবে সভ্যতার
অন্তিম ঔরসে—
নিত্য স্রোতে তাই শুধু কৃষ্ণ পক্ষে
পাণ্ডুর পাণ্ডুর,
রক্তস্রাবে আরক্তিম অস্তগামী দিন।"

সুকান্তর সেই বিখ্যাত খাতাটির এটিই শেষ কবিতা, বয়স তখন প্রায় চোদ্দ। পাঠক লক্ষ্য করবেন কবিতাটি সুকান্ত-মানসে পালাবদলের শুভারম্ভের পরিচায়ক।

বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনি কবি অরুণাচল বসুর সান্নিধ্যে আসেন—একই শ্রেণীর ছাত্র উভয়ে। এই দুজনের বন্ধুত্ব শুধু যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে উত্তরোত্তর তাই নয় পরস্পরের উৎসাহে উভয়েরই সৃষ্টিশীলতা গতিবেগ লাভ করে। এই সময় সাহিত্যে আগ্রহী ও পরিশীলিত মনের অধিকারী শিক্ষক নবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথের অবদানও সুকান্তর জীবনে কম নয়। তিনি তাঁকে পুত্রাধিক ভালবাসতেন। ইতিমধ্যে দাদার বন্ধুর পত্রিকা 'শিখা'য় তাঁর একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে সুকান্ত হাতে লেখা সাহিত্য পত্রিকা 'সপ্তমিকা' বের করলেন। সম্পাদক তিনি আর পরিচালক শিক্ষক মশাই নবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথ।

অরুণাচলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমে তার পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। তাঁর মা সরলাদেবী ছিলেন শিক্ষিকা এবং সুলেখিকা। এই মহিলার স্নেহে সুকান্তর জীবনে মায়ের অভাব খানিকটা দূর হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক সাহিত্যিক পরিবেশও তিনি লাভ করেছিলেন এই পরিবারের বেলেঘাটার বাড়ীতে। মা ও দুই ছেলের মধ্যে চলতো লেখার খেলা। সরলা দেবী হয়তো কোন একটি গল্প শুরু করে শেষ করার ভার দিতেন সুকান্তর উপর। আবার সুকান্ত ও অরুণাচলের মধ্যে যৌথ ভাবে কবিতা লেখার খেলা চলতো। নীরস স্নেহ মমতা বর্জিত আপন গৃহ পরিবেশের বঞ্চনা যে কতখানি পূরণ হয়ে ছিল অরুণাচলের বাড়ীকে ঘিরে তার সাক্ষ্য রয়েছে সুকান্তর একটি চিঠিতে। অরুণাচল তখন যশোহরে, তাঁর বাবা বেলেঘাটার সেই বাড়ীটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। এই বাড়ীটি যে সুকান্তর কত আবেগের বিষয় হয়েছিল তা তাঁর ভাষাতেই প্রকাশিত :

"তুই বোধহয় এই খবর এখনও পাস নি যে, তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত তৃণ-শ্যামল সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা, কত নিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালী হাওয়ায় হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি। তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি, ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনীয়তায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা। তাঁর ঠিক আপন জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন।" চিঠির মধ্যে যদিও সুকান্ত নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর নিজস্ব বেদনাই প্রকট হয়ে উঠেছে, একমাত্র স্নেহাশ্রয় তাও দূরে সরে গেল।

নবাঙ্কুর শিল্পীমন স্বভাবতই খুঁজে বেড়াবে উপযুক্ত পরিশীলিত পরিবেশ, যে কোন কিছুকে আশ্রয় করে সে তো বাঁচতে পারে না। এমন একটি পরিবেশ তিনি অচিরেই লাভ করলেন বৈমাত্রেয় বড় ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। দাদার বাড়ীটি ছিল সুসজ্জিত এবং রুচিসম্মত। তিনি ছিলেন শিল্পরস পিপাসু। সুকা-র সেখানে বড় আকর্ষণ ছিল গ্রামোফোন ও রেডিয়োর গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি ছিলেন ভীষণ ভক্ত। তাছাড়া বৌদির সঙ্গেও বেশ ভাব জমে যায়। এই বৌদিই তাঁকে উপনয়ণ উপলক্ষে একটা টাকা মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন। সেই টাকায় আসন্নকেশ বিরহে কাতর কবি ছবি তুলে স্মৃতি রক্ষা করেন। গালে হাত দেওয়া আজকের সুপরিচিত সেই ছবিটি এই উপলক্ষেই আমরা পেয়েছি। এই সময় দাদার সহযোগিতায় রেডিওর 'গল্পদাদুর আসরে' তিনি প্রায়ই কর্মসূচী পেতেন। রবীন্দ্র কবিতা পাঠ ছাড়াও রবীন্দ্রপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে নিজের একটি কবিতাও তিনি পাঠ করে-ছিলেন। প্রখ্যাত গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিক তাঁর একটি গানে সুর দিয়ে গল্পদাদুর আসরে পরিবেশন করেন। খেলাধূলোর মধ্যে ব্যাডমিণ্টন ও দাবা তাঁর প্রিয় ছিল। ব্যাডমিণ্টনে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে রূপোর মেডেল পেয়েছিলেন। কিছুদিন সমাজসেবামূলক কাজেও তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বিনা বেতনে কোচিং ক্লাশ, লাইব্রেরী করা ইত্যাদি ব্যাপারে কয়েকমাস কাটল বটে কিন্তু মন তখন টেনেছে বহির্জগতে, অচেনালোকের উদ্দেশে।

একদিন এক বন্ধুকে নিয়ে বাড়ীতে কিছু না বলেই সুকান্ত বেরিয়ে পড়লেন অচেনার আনন্দে ট্রেনপথে। দুচোখ ভরে প্রাকৃতিক শোভা দর্শন ও অপরিচিত মানুষের সারিসারি মুখ এক অনির্বচনীয় সুখ তাঁকে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পকেটে পয়সা বড় কম ছিল। স্বভাবতই তিন দিন পরই বাড়ী ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু বাড়ী ঢুকবেন কি করে। "অগত্যা গেলেন অরুণাচলের বাড়ীতে, কিন্তু সেখানে সুকান্তর দেখা হল না বন্ধুর সঙ্গে। তখন একটা খবর রেখে চললেন বেলেঘাটার বিখ্যাত গলায়দড়ির মাঠে, যে মাঠ জুড়ে এখন তৈরী হয়েছে নতুন লেক সুভাষ সরোবর। অরুণাচল খবর শুনেই ছুটলেন সেই কুখ্যাত মাঠের দিকে। কিন্তু সেখানে দেখতে পেলেন না সুকান্তকে। হতাশ হয়ে ফিরে আসবেন এমন সময় নজর পড়লো গাছের একটা ডালে। না, গলায় দড়ি দেননি সুকান্ত, তিনি তখন সেই গাছের ডালে বসে গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। যাই হোক, বাড়ীর

অভিভাবকদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে খুব অসুবিধা হয় নি অরুণাচলের, কারণ সুকান্ত গিয়েছিলেন নাকি শান্তিনিকেতন। সুতরাং কবি যদি যায় কবিগুরুর সদনে তাতে আর অপরাধ কি ” (কবি সুকান্ত—অশোক ভট্টাচার্য)

একজন যৌবনোন্মুখ শুদ্ধিযুক্ত পুরুষের জীবনে ব্যক্তিপ্রেমে বিজড়িত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়—আর লেখক শিল্পীদের ক্ষেত্রে বসন্ত যেন হেমন্তেই এসে যায়। অনুভূতি ও আবেগের প্রাবল্য যখন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ সব কিছুকেই আত্মস্থ করতে ধাবিত তখন নারীর ভালবাসা সেখানে অন্যতম অবলম্বন না হয়ে পারে না। অধিকাংশ লেখক শিল্পীর ব্যক্তি জীবনই এই সাক্ষ্য দেবে। অন্য মানুষের জীবনেও হয়তো আসে কিন্তু তা অগোচরে থেকে যায়, কেননা অন্য মানুষের তাতে আকর্ষণ থাকে না। প্রকাশপ্রবণ লেখক শিল্পীরা তাঁর পরিচয় রেখে যান কোন না কোন ভাবে। সুকান্তর জীবনেও প্রেম এসেছিল সচেতনভাবে মাত্র পনের বছর বয়সে, যদিও অনুভূতির ভাবে সুর লেগেছিল আরও কম বয়সে। অবশ্যই সে প্রেম অভিজ্ঞ সাংসারিক দৃষ্টিতে বিচার করলে নিতান্তই ছেলেমানুষি বলে মনে হবে কিন্তু কিশোর মনের ভাব-রাজ্যে তখন তা নিয়ে প্রচণ্ড তোলপাড়। অরুণাচলকে একটি চিঠিতে লিখছেন : “সারাদিন ও রইল কিন্তু কোনো কথা বললাম না ওর সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যার পর এমন এক সময় এল যখন আমরা দুজনেই একটি ঘরে একা পড়ে গেলাম। দুজনেই শুনছিলাম রেডিও। রেডিওতে গান হচ্ছিল, ‘প্রিয় আজো নয়, আজো নয়।’ কিন্তু গানটাকে আমি লক্ষ্য করিনি এবং লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কারণ কাছে অতি কাছে ও বসেছিল, বোধ হয় অন্য দিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে গানই শুনছিল, আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওকে, অত্যন্ত সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাল লাগল। ভেবে দেখলাম এক ঘরে থেকেও দুজনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ ধরে মনে বল সঞ্চয় করে ডাকলুম ‘…’। কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না। এবার বেশ জোর দিয়েই ডাকলুম, ও তা শুনতে পেল। চমকে উঠে আমার দিকে চাইল। এবং আমিও এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাটা কোন রকমে বলে ফেললাম, ‘ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।”·· সেদিন আমার জীবনের শুভদিন ছিল, প্রাণ ভরে সেদিন ওর কথা পান করেছিলাম।”

(সুকান্ত সমগ্র পৃঃ ৩০১-২)

অধিকাংশ কিশোর-প্রেমের যা পরিণতি সুকান্তর এই প্রেমেরও সেই

পরিণতিই ঘটলো। সমাজ ও জীবনের জটিল বাস্তবতা ভাবরাজ্যে নিদারুণভাবে ছেদ টেনে দেয়। আর এ ব্যাপারে মেয়েদের কেন্দ্রাভিগ মন প্রায়শই পারিপার্শ্বিকের টানে পিছিয়ে যায়। সুকান্তর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর চিঠিতেই রয়েছে এই স্বীকৃতি :

"বললাম, কিছুদিন আগে আমার একখানা চিঠি পেয়েছিলে? ভ্রূকুটি হেনে ও বললে : কলকাতায়? আমি বললুম : না, বেনারসে। ও মাথা নেড়ে প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করল। আবার একটু দম নিয়ে বললাম : অত্যন্ত অসতর্ক অবস্থায়, আবেগের মাথায় পাগলামি করে ফেলেছিলাম। সেজন্যে আমি এখন অনুতপ্ত এবং এই জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। ও তখন অত্যন্ত ধীরভাবে বিজ্ঞের মতো বললে—না না, এজন্যে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, ঐ রকম মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলার পর জিজ্ঞাসা করলুম : আমার চিঠিখানার জবাব দেওয়া কি খুব অসম্ভব ছিল? ও অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললে : উত্তর তো আমি দিয়েছিলাম। আমি তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললাম, চিঠিখানা তাহলে আমার বৌদির হস্তগত হয়েছে। ও বিষণ্ন হেসে বললে : তাহলে তো বেশ মজাই হয়েছে। কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটল। তারপর ও হঠাৎ বললে : আচ্ছা এরকম দুর্বলতা আসে কেন? অত্যন্ত বিরক্তিকর প্রশ্ন। বললাম : ওটা কাব্যরোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন কোনো একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম। ধর, তোমার চিঠিতে যদি সন্তোষজনক কিছু থাকতো, তাহলে হয়তো আমার কাব্যের ধারা তোমাকে আশ্রয় করত। ও তাড়াতাড়ি শুধরে দিল, চিঠিটা কিন্তু সন্তোষজনক ছিল না। আমি বললুম : আমার কাব্যের ধারাও সঠিক পথে চলছে।" (সুকান্ত সমগ্র পৃঃ ৩১২)

ইতিমধ্যে ব্যক্তি প্রেম, দেশ প্রেম ও মানব প্রেমে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। যুদ্ধের ঘনীভূত আবহাওয়া কিশোর কবির হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, কবির আশঙ্কা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানব সভ্যতার করুণ পরিণতি ঘটবে। তাই কবির মনে প্রশ্ন :

হে নাবিক, আজ কোন্ সমুদ্রে
এল মহাঝড়,
তারি অদৃশ্য আঘাতে অবশ

মরু প্রান্তর।
এই ভুবনের পথে চলবার
শেষ সম্বল
ফুরিয়েছে, তাই আজ নিরুক্ত
প্রাণ চঞ্চল।
আজ জীবনেতে নেই অবসাদ।
কেবল ধ্বংস, কেবল বিষাদ—
এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ!
পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ। (তরঙ্গ ভঙ্গ। পূর্বাভাষ)

অথবা,

কেঁদেছিল পৃথিবীর বুক :
গোপনে নির্জনে
ধাবমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের কাছে
পেয়েছিল অতীত বারতা ?
মেরুদণ্ড জীর্ণ তবু বিকৃত ব্যথায়
আহত বিক্ষত দেহ মুমূর্ষু চঞ্চল,
তবুও বিরাম কোথা ব্যগ্র আঘাতের। (পরাভব)

কবির চোদ্দ পনের বছর বয়সের লেখা 'পূর্বাভাষ'-এর এই সব কবিতার মধ্যে কোন কোন সুকান্ত-জীবনীকার আপাত নৈরাশ্য খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের মনে হয় নৈরাশ্য নয়, কিশোর বয়সের বিহ্বলতা বা জনজীবনে ছড়িয়ে পড়া তৎকালের আতংকই কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল—যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। গোটা কলকাতার মানুষ যখন ভয়ের শিথানে মাথা দিয়ে সময় গুনছে তখন একজন কিশোরকে অতিমানব বলে কল্পনা করা অবিচারের সমতুল্য। লক্ষ্য করার বিষয় কবি সমকালের ভয়ার্ত চিত্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হন নি। তিনি সন্ধান করছিলেন আস্থা ও বিশ্বাসের স্থিত ভূমির।

এই সময় সবচেয়ে বড় আশ্রয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে আসছিলেন সুকান্ত। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী বক্তব্যগুলি তাঁকে অনেকখানি আশ্বস্ত করেছিল। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বানও পেয়েছেন। জনশক্তির উপর আস্থা স্থাপনের শিক্ষা পেয়েছেন, মানুষকে জাগাবার মন্ত্র তখন কবির কণ্ঠে :

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে,
... ...
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে; আজ আর নেই জেনো নিস্তার;
মৃত্যুর কথা আজ ভাবতেও পাও বুঝি কষ্ট,
আজকের এই কথা জানি লাগবেই অস্পষ্ট,
তবুও তোমার চাই চেতনা,
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রয় পেত না,
আজকে রঙিন খেলা নিষ্ঠুর হাতে কর মর্দন,
আজকে যে প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেম অর্জন,
তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি
কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের 'মরণ-যজ্ঞ' চলে নিত্য;
পণ কর, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে,
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির। (জাগবার দিন আজ)

কিন্তু ভীতি বিহ্বল কলকাতার বিবর্ণ চেহারা কবির মন মেদুর করেই রেখেছে। তিনি ভাবতেই পারছেন না তাঁর ভালবাসার জন্মভূমি কলকাতার আসন্ন মূর্চ্ছিত রূপ। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে অরুণাচলকে লেখা একটি চিঠিতে বর্ণনা:

"ম্লানয়মান কলকাতার ক্রমস্তব্ধমান স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছবে কি না; জানি না ডাক বিভাগ ততদিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে বিপুল সম্ভাবনার

দিকে। এক একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসর ঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমাব জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?"

এই ভয়ংকর আতংকের মধ্যেও কবি কিন্তু শুধু প্রাণ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবেন নি। ব্যক্তিগতভাবে জীবন রক্ষা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, তখন তিনি সামাজিক মানুষ। কয়েকদিন পরে লেখা আরেকটি চিঠিতে সে কথাই লিখেছেন: "আজ আমাব ভায়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ—আমারও যাবাব কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলুম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি সংকুল বোমাঞ্চকর পবম মুহূর্তের সন্ধানে।" ভাবতে বিস্ময় লাগে একটি কিশোর ছেলের পক্ষে মরণভয় জয় করে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ভূমির উপর দাঁড়িয়ে কলকাতার ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে দেওয়া কি করে সম্ভব হলো। ক্ষণজন্মা পুরুষদের চারিত্র্যধর্ম বোধ করি অতি ছোট বয়সেই এমন করে উন্মোচিত হয়।

নতুন পথের সন্ধান যে চায় সে পায়ও, পরিপার্শ্ব থেকেই মিলে যায়। সুকান্তও পেয়ে গেলেন সেই ধ্রুবপথ আমৃত্যু যা ছিল তাঁর আবাধ্য। সুকান্ত জীবনীকারের ভাষায়: "জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণেই মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন সুকান্ত। অগ্রজের ছিল ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ। সেই সূত্রে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরা নিয়মিত আসতেন বাড়িতে। এঁদেরই একজনের কাছ থেকে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সুকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ তাণ্ডবের মূল কারণ ও প্রকৃতিকে। কয়েকজনের লাভালাভের স্বার্থে যে মারণ-যজ্ঞ তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল সুগভীর। তারপর এই যুদ্ধে পৃথিবীর একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত আক্রান্ত হলে নিজের সঠিক ভূমিকাকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।" ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম রূপ ধারণ করেছে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ১৯৪২ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান রাখা হয়। লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের মঞ্চ সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ থেকেও অনুরূপ আহ্বান জানান হয়। সুকান্ত তখন এই প্রতিরোধ সংগ্রামের একজন কর্মীতে রূপান্তরিত। তাই আজ আর যুদ্ধ তাঁর কাছে ভয়াবহ আতংকের

বিষয় নয়, প্রতিরোধের সংগ্রাম। এই মানস পরিবর্তন একটি চিঠিতে বিধৃত রয়েছে: "গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল।...এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনায় বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন ত বর্ধমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভবসারই কথা।"

এক বছরের মধ্যে সুকান্তর জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনি তখন রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন এবং তার স্বীকৃতি উপরোক্ত চিঠিতেই রয়েছে। শুধু রাজনৈতিক কাজকর্ম নয়, সাহিত্যের জগতেও তখন তাঁর স্থান হয়ে গেছে। অগ্রজ কবিদের যথেষ্ট সমাদরও তিনি পেতে শুরু করেছেন। জেঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেছে। সেই পরিচয় পরবর্তী দুই বছরে বেশ ঘনিষ্ঠও হয়েছে। "তোর শেষ চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলি, কিন্তু তার আগেই বোধ হয় একদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে P. C Joshi-র এক বক্তৃতা সভায় সুভাষ নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আমার 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তার পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ তা ছাপা হত। তারপর অনেক দিন পরে সুভাষের কথা মতো একটা সংকলন গ্রন্থের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন প্রায় দুঘণ্টা সেখানে থেকে সুভাষের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, স্বর্ণকমলের (ভট্টাচার্য) সঙ্গেও বেশ গল্প জুড়ে ছিলাম। সেদিন সুভাষ আমার এত প্রশংসা করে ছিল যা সহসা চাটুকারিতা বলে ভ্রম হতে পারত, সুভাষও আমাকে বই ছাপাতে বললে। ...সংকলন গ্রন্থটি 'এক সূত্রে' নাম নিয়ে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য, অন্নদাশংকর, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ বাংলার ৫৬ জন কবির কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমার একটি কবিতাও সসংকোচে স্থান পেয়েছে।" (অরুণাচলকে লেখা চিঠি, ২৮শে ডিসেম্বর' ৪২)

'৪০ থেকে'৪২ এই দুবছরে সুকান্ত বিস্ময়কর গতিতে বিকশিত হয়েছেন। পার্টি ও সঙ্গী সাথীদের সাহচর্যে কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার এক অভূতপূর্ব

সাড়া পেলেন এবং সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়ে কর্মোদ্যমে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানালেন ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে :

ভীরু অন্যায় প্রাণ বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য,
বিপন্ন দেশে তাই নিঃশেষে ঢালো প্রাণ দুর্ভেদ্য।
সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব-দরজায়,
ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত॥ (উদ্যোগ)

দেখা যাচ্ছে বিয়াল্লিশের শুরুর সময় থেকেই সুকান্ত রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। যেমন কবি হিসেবে তেমনি রাজনৈতিক কর্মী রূপেও তাঁর অগ্রগতি দুরন্ত গতিতে। একই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ও পার্টির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ছাত্র আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে দেশবন্ধু হাই স্কুলের কর্মকর্তারা রুষ্ট হলেন, অপরদিকে পড়াশুনা অবহেলা করে রাতদিন পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করায় তাঁর বাবা ও অন্যান্য গুরুজনেরাও হলেন রাগান্বিত। বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের অনিয়ম হল সবচেয়ে বেশী, সেটাও বড়দের উদ্বেগের কারণ হল। তাই অনেক সময় তিনি বড়দের চোখ এড়িয়ে কাজ করার পথ গ্রহণ করলেন। পার্টির কাজ সেরে, পোস্টার লাগিয়ে অন্যদের অসুবিধা এড়িয়ে ঘরে ঢুকতেন জানালার এক আল্লা গরাদ সরিয়ে। একদিন এক নবাগত আত্মীয় সেই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন, তিনি চোর মনে করে সুকান্তকে জড়িয়ে ধরে চোর চোর বলে চীৎকার করে ওঠেন। কাজে এই নিষ্ঠার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। একটি বৈজ্ঞানিক দর্শনকে আশ্রয় করে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপ তাঁর সৃষ্টি সত্তায়ও প্রচণ্ড আবেগের সঞ্চার করে।

তৎকালীন ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য সুকান্তর অসাধারণতার পরিচয় জ্ঞাপন করে লিখেছেন : "আর পাঁচজনের মত স্কুলের পড়ায় ওর তেমন মন ছিল না। স্বভাবতই অভিভাবকরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। ফলে মাঝে মাঝেই দেখা দিত পারিবারিক অশান্তি। প্রায়ই সে সব কথা এসে বলত ও হতাশ হয়ে পড়ত। আমরা কিন্তু বুঝেছিলাম পাঠ্যপুস্তকের চার দেয়ালে আটকে পড়ার ছেলে ও নয়। তাই, যদিও তখন আমাদের নীতি ছিল ভালো ছাত্রকর্মী হতে হলে—স্কুল কলেজের লেখা পড়াতেও ভাল ছেলে

হতে হবে—সুকান্তর বেলায় তার ঘটল ব্যতিক্রম। কারণ আগেই বলেছি ও ছিল অসাধারণ। সৃষ্টির বেদনায় অস্থিরতার লক্ষণ ও প্রকাশ তখন সুকান্ততে সুস্পষ্ট। তাছাড়া তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্কসবাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেণ্ট ও অপরদিকে গান, নাটক ও কবিতা পাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র ফেডারেশন গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনেরও পূর্বসূরী।......এই পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতি মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নতুন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।"

সুকান্তর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রধানত ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে লেখা। আন্দোলন, সংগ্রাম ও নাটকীয় ঘটনাবলীতে ঠাসা কলকাতার এই কবছরের জীবন যাত্রা সুকান্তর কবিতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তাই সুকান্তর কবিতা রাজনৈতিক দলিলের মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৪১ সাল থেকে জাপানী বোমাবর্ষণের ভয়ে জনকোলাহল শূন্য কলকাতা, নিষ্প্রদীপ রাতে শুধুই মিলিটারী গাড়ীর শব্দ। বহু রাতে সুকান্ত একা বা কোন বন্ধুর সাথে এই প্রেতপুরী কলকাতার রূপ দেখতে বের হতেন। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং ব্রিটিশের নির্বাচিত নিপীড়ন কবির হৃদয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। জন্ম হয় একের পর এক কবিতার। সুকান্তর লেখা তখন 'অরণি', 'পরিচয়', জনযুদ্ধ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'মণিপুর' কবিতায় ফ্যাসিস্ট জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে লিখলেন :

"দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে?
আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।

তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু? তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ কর।"

এই সময় সুকান্তর ব্যক্তিজীবনে নানা ঝড়ঝাপটা আসে। হয়তো আর পাঁচটা ছেলের মতো গৃহগত থেকে সুবোধ বালকের মতো পড়াশুনা করাই আত্মীয় স্বজনরা চাইছিলেন এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার ধর্মসংস্কার মুক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর যোগদানও অপছন্দ করছিলেন। তাই হয়তো দ্বন্দ্বটা পরিবারের মধ্যে বেশ বড় আকারই ধারণ করেছিল, যার ফলে সুকান্তর মন বেশ ভেঙ্গে পড়ে। অরুণাচলকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন:

"চিঠিটার উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হয়, বোধ হয় কুড়ি বাইশ দিন, কিন্তু সেজন্যে আমি এতটুকু দুঃখিত নই—যেহেতু আর্থিক প্রতিকূলতা (শুধু অর্থনৈতিক অরাজকতার জন্যে নয়, পারিবারিক আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ) ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে আমাকে, এমন কি আমার ভবিষ্যৎকে পর্যন্ত। অবশ্য আর কিছু পরিবর্তন পরিবারের আর কোথাও হয় নি, কেবল আমার পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে বিপর্যয়।···একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে ········আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এতবড় আঘাত আর আসে নি, তাই বোধ হয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতাকে, তাই সমস্ত শিরা—শিরার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ।" (২৭শে চৈত্র ১৩৪৯)

যাহোক এই বিপর্যয় কাটিয়ে পার্টি ও জনগণের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন সুকান্ত। তাঁর জীবনে যুদ্ধের চেয়েও বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। কমিউনিষ্ট কর্মী হিসেবে সুকান্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে সেবার কাজে যোগ দিয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন সুকান্ত সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। অথচ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাপ্য চালের কুপন তিনি কখনও সঙ্গে করে আনেন নি, যদিও এই চাল সংগ্রহের জন্য তাঁর ভাইদের ব্যতিব্যস্ত হতে হত। বাংলাদেশের মানুষদের নিদারুণ কষ্ট ও অনাহারে মৃত্যু কর্মী হিসেবে সুকান্তকে যতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল, কবি রূপেও তেমনি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। 'বিবৃতি' কবিতাটি সেই সাক্ষ্য বহন করছে:

"আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে,

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল
... ...
পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।"

বাংলার মন্বন্তর প্রায় সমস্ত সমাজ-ভাবিত শিল্পী সাহিত্যিককেই দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করেছিল। 'নবান্ন' নাটক তো এক ইতিহাসই রচনা করেছে। তাছাড়া গান, নৃত্যনাট্য ইত্যাদির মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মন্বন্তরক্লিষ্ট মানুষের সপক্ষে প্রচার অভিযান তখন বাংলার প্রতিটি প্রত্যন্তকে জাগ্রত করে তুলেছিল। কবিরা 'আকাল' নামে একটি কবিতার সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। কনিষ্ঠতম কবি সুকান্তর উপর পড়েছিল সম্পাদনার ভার। যোগ্য পাত্রেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় কিশোর বয়সেই তিনি কতখানি সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'আকাল' সংকলনের ভূমিকায় সুকান্ত দৃপ্ত-ভাবে প্রশ্ন রেখেছিলেন সমকালের নবীন ও প্রবীন কবিদের উদ্দেশে : "বাংলাদেশের কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহার, পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র? তাঁদের অমুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্বিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি?" অমোঘ প্রশ্ন, কনিষ্ঠতম কবির বিস্ময়কর শাণিত জিজ্ঞাসা—'তাঁরা কি জনমনের কবি!' এ প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব সুকান্ত নিজেই দিয়েছেন তাঁর 'বিবৃতি', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'বোধন', 'ফসলের ডাক', 'এই নবান্ন' প্রভৃতি কবিতায়। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত 'বোধন' সুকান্তর সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কবিতা। এই কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন : "৯৫ পঙক্তিতে রচিত এই কবিতাটিকে আমি এযুগের মহাকাব্য বলতে চাই।" 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কয়েকটি জেলায় ভ্রমণ করেন এবং সংবাদ পাঠান। বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে পাঠান দুর্ভিক্ষ, মহামারী সংক্রান্ত প্রাণবন্ত রিপোর্ট-গুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৪৪ সালের জুনমাসে সুকান্তর অগ্রজ সুশীল ভট্টাচার্যের বিবাহকে কেন্দ্র করে তাঁদের পরিবার ক্ষণিকের জন্য আবার আনন্দময় হয়ে ওঠে। নতুন বৌদির উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন—

"এ শহর নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রদীপ আমাদের ঘর,
জমেছে উদাস ধূলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া
তাইতো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।"

তাই তিনি শেষ পঙক্তিতে বৌদির কাছে আবেদন রেখেছিলেন এই দুঃসহ পরিবেশে আলো জ্বালবার—'একটি প্রদীপ এনো, এখানে কখনো যদি আসো।' যদিও স্বভাব লাজুক দেবরটি বৌদির হাতে কবিতাটি তুলে দিতে পারেন নি।

কিন্তু সুকান্তকে আর গৃহাভিমুখী করা যায় নি। তিনি তখন বিশ্বপথিক—অনেক পরিণত, অনেক দায়িত্বভার তাঁর কাঁধে। অঙ্কে কাঁচা থাকার দরুণ প্রবেশিকা পাশ করা তাঁর আর হয়নি। পরীক্ষা পাশের নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে অনেক বড় তখন তাঁর চিন্তা চেতনা। ইতিমধ্যে কয়েকবার তিনি কলকাতা থেকে দূরে রাঁচি ও কাশীতে ঘুরে এসেছেন। বারবার ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডে ভুগে শরীরটাও কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কাজের বিরাম নেই, বিশ্রামও নেই। "নানা কাজে সারাটা দিন শহরময় ঘুরে বেড়াতেন সুকান্ত। তাঁর ত্রিভুজ আকৃতির পরিক্রমণ পথে ছিল তিনটি মূল লক্ষ্য বিন্দু: একটি নারকেলডাঙ্গায় তাঁর নিজের বাড়ী, দ্বিতীয় কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ভবানী দত্ত লেনে 'কিশোর বাহিনী'র কেন্দ্রীয় অফিস, এবং তৃতীয় হলো শ্যামবাজারে জেঠাইমাদের বাড়ী বা বাগবাজারে বড় মাসি, অর্থাৎ ভূপেনদের বাড়ী। দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থলটি আরও দূরে সরে গিয়েছিল এক বছর পরে, যখন এসপ্লানেড অঞ্চলের ডেকার্স লেনে চালু হয়েছিল 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অফিস। গাড়িভাড়া বাবদ সংগঠনের কাছ থেকে কিছু নিতেন না তিনি, আর এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাসের জন্য বাবার কাছেও হাত পাততে চাইতেন না সহজে, ফলে বহু দিনই তাঁকে এই দীর্ঘ পথ পার হতে হয়েছে পদাতিক যাত্রায়।...নাওয়া-খাওয়ার অনিয়মের সঙ্গে হেঁটে চলার এই পরিশ্রমই ক্রমে কাহিল করে ফেলেছিল সুকান্তকে।" (কবি সুকান্ত—পৃঃ ৬৯)

১৯৪৫ ও ৪৬ সালে আন্দোলনে সংগ্রামে উত্তাল কলকাতায় সুকান্ত দর্শকমাত্র নয়, সংগ্রামের শরিক। '৪৫ এর ২১শে নভেম্বরে আজাদহিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির দাবীতে ধর্মতলার ছাত্র মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন তিনি। ৪৬' এর

ভিয়েৎনাম মুক্তি দিবসের ছাত্রাভিযান, রসিদ আলি দিবসের পথযুদ্ধ এ সমস্ততেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্য ছাত্র নেতার সঙ্গে, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঙ্গী ছিলেন। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরের পথে জাহাজে তিনি লিখেছিলেন 'ঠিকানা' কবিতাটি। এই কবিতা দিয়েই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। রসিদ আলি দিবসের পরদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে সুকান্তের কবিতা :

"মুখে মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাইনা। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা
শোনো হুংকার কোটি অবরুদ্ধের।"

তারপর এল বন্দীমুক্তি আন্দোলন ১৯৪৬ এর জুলাই। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ছাত্রদের বিক্ষোভ সমাবেশ। কোন বক্তার বক্তৃতাই যেন সভায় প্রাণ সঞ্চার করতে পারছে না। সুকান্ত ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে পাঠ করার জন্য দিলেন 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতাটি। বন্দীদের মুক্ত করে আনার শপথ গ্রহণ করে কবিতার শেষে কবির ঘোষণা :

"মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি ;
ওরা আমাদের রক্ত দিয়েছে,
বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে
গোপনে করেছে ঋণী।
মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি!
হে ঘাতক নির্বোধ,
রক্ত দিয়েই সব ঋণ করো শোধ!
শোনো পৃথিবীর মানুষেরা শোনো,
শোনো, স্বদেশের ভাই,
রক্তের বিনিময় হোক
আমরা ওদের চাই॥"

কবিতা পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাগৃহ বজ্রধ্বনিতে ফেটে পড়ল— আমরা ওদের চাই।

১৯৪৬ সালে নির্বাচনের আগে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা শুরু হয়ে গেল—বলা হতে লাগল কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী। স্থানে স্থানে তাদের উপর হামলাও ঘটতে থাকল। অথচ মন্বন্তরের সময়, যুদ্ধ শেষের দিনগুলিতে, সাম্রাজ্য বাদ বিরোধী সংগ্রামগুলিতে কমিউনিস্টরাই ছিল প্রথম সারিতে। এই অপবাদ উপেক্ষা করেই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ঘোষিত নীতি ও আদর্শ প্রচার করে চলেছিল। এই রাজনৈতিক কুৎসার বিরুদ্ধে সুকান্ত লিখেছিলেন তাঁর 'বিক্ষোভ' কবিতা :

যারা আজ এতো মিথ্যার দায়ভাগী
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি,
কুয়াশা কাটছে কাটবে আজ, কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততো দিন প্রাণ দেবো শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ॥

মাঝে মধ্যে অসুস্থতা, পরীক্ষা প্রস্তুতির পরিশ্রম, আর্থিক অনটন, অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া সুকান্তর শরীরের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। সে সব উপেক্ষা করে কবি সুকান্ত দক্ষ সংগঠকের পরিচয় দেন 'কিশোর বাহিনী'র পরিচালন ভার গ্রহণ করে। 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা-স্বাধীনতা'র আদর্শে গড়ে ওঠা এই সংগঠন সুকান্তর নেতৃত্বে নবপ্রাণ লাভ করে। শুধু কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নয় জেলায় জেলায়ও এই সংগঠনের শাখা প্রশাখা গঠিত হয়। কলেজ স্ট্রীট ও বৌবাজারের মোড়ে তিন তলায় ছাত্র ফেডারেশনের অফিসের এক কোণে সুকান্ত কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর সাজিয়ে বসেছিলেন। তার আগে অফিস ছিল ভবানী দত্ত লেনে। কর্মসচিব হিসেবে তিনি কিশোরদের শরীর ও মন গঠনের জন্য কী ধরনের নির্দেশ দিতেন তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে :

প্রিয় বন্ধু, তোমরা কী ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ তাই জানাচ্ছি, তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার ব্যবহার চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে।

তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজের পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে। ......"

কিশোর অভিনন্দন নিও।

কর্মসচিব।

১৯৪৬ এর মাঝামাঝি সময় সুকান্ত আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নারকেলডাঙ্গার বাড়ী থেকে পার্কসার্কাস অঞ্চলের ১০ নং বাউডন স্ট্রীটে পার্টির চিকিৎসা কেন্দ্র রেড এড কিওর হোমে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসায় অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মানসিক শান্তি ছিল না—ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলকাতা মুমূর্ষু। শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' নামে কবিতায় দাঙ্গা জনিত বেদনা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। বন্ধু ভূপেনকে লেখা কবিতা চিঠিতে সেই বেদনা আরও গভীরতর রূপ পেয়েছে, সর্বোপরি অসামান্য কবিতা হয়ে উঠেছে।

"তোর সেই ইংরেজিতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেই কো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী।
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা,
তবু তোর রংচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
... ...
...এদুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষন থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে ;
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রং, নেই রোশনাই
শুধুমাত্র ছন্দ আছে তাই দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই ॥"

যে বন্দীদের মুক্তির জন্যে সুকান্ত লড়াই করেছিলেন কবিতায় আগুন ছড়িয়েছিলেন সেই বন্দীরা যখন মুক্ত হয়ে এলেন তখন তিনি পার্টির হাসপাতালে।

মুক্ত বিপ্লবীরা ছুটলেন সুকান্তর সঙ্গে আলাপ করতে। সেদিনটি কবির জীবনে স্মরণীয় দিন। ভূপেনকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "তবে কাল আমার জীবনে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন।
অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন—'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।' অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোন দিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল।"

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার চেয়ে বিপ্লবীসত্তা যে তাঁর কাছে কত বড় ছিল শেষের কয়েকটি লাইন থেকে সুস্পষ্ট। বীর বিপ্লবীদের স্বীকৃতি, অভিনন্দন তাঁর কাছে জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ।

কিছু দিন ভাল থাকার পর পার্টির হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে আসেন। বাড়ীতে বসেই চলতে থাকে কাব্য সাধনা। বহির্বিশ্ব থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কবির মন আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে রচনাশৈলীতে ও গভীরতায় কবিতাগুলির হৃদয় গ্রাহ্যতা বৃদ্ধি পায়। সিঁড়ি, চারাগাছ, একটি মোরগের কাহিনী প্রভৃতি কবিতার প্রতীক-ধর্মিতা যেমন উচ্চাঙ্গের তেমনি বৈপ্লবিকতাও সুগভীর। বাইরে, তখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প প্রধূমিত। কার্ফুর জন্যে ডাক্তারের যাতায়াতও বিঘ্নিত হতে থাকল। এমতাবস্থায় বাবা তাঁকে বায়ু পরিবর্তনে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সুচিকিৎসার জন্যে জেঠতুতো ভাই মনোজ ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে এলেন শ্যামবাজারের বাড়ীতে। এখানেই ধরা পড়ল ইন্‌টেষ্টিনাল টি, বি,। ডাক্তার রাম অধিকারী ও ডাক্তার তাপস বোস তাঁকে চিকিৎসা করছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ চেষ্টা করছিলেন যাতে তাঁকে আজমীড়ের একটি স্যানাটোরিয়ামে রেখে চিকিৎসা করান যায়।

কিন্তু সম্ভব হল না, রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকল। অবশেষে যাদবপুর

টি, বি হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। এখানকার অব্যবস্থায় রোগ প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধিই পেল। টি; বি রোগের চিকিৎসা এখনকার মত তখন সহজ ছিল না। এখনকার মত ওষুধও বের হয় নি। আশ্চর্য এই কিশোর—যাকে ইতিপূর্বে কোন কোন সময় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হতে দেখা গেছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি কিন্তু অসম্ভব আশাবাদী। অভূতপূর্ব তাঁর মনোবল। অর্থ, স্নেহ, মমতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালের অনেক শিল্পী সাহিত্যিক এবং বন্ধু-বান্ধব অগ্রজরা। অগ্রজ কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এক মমতাময় কবিতা লিখে কবিকে সুস্থ করে তোলার অঙ্গীকার প্রকাশ করলেন :

"আমরা চাঁদা তুলে মারবো সব কীট ,
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয়গান ?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুললে
সে কিসের বসন্ত।"

শ্যামবাজারের পারিবারিক পরিবেশ থেকে যাদবপুর হাসপাতালে এসে বড় একা হয়ে গেলেন সুকান্ত। বন্ধু অরুণাচলকে চিঠিতে লিখছেন :

"সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা একা ঠেকেছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি মাসিমাকে নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর বড় মন খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি।

"তুই কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস ? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস ? যাইহোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময়—বিকেল চারটে থেকে ছটা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিম্বা ৮এ বাসে। এখানে 'লেডী মেরী হার্বার্ট ব্লক' এক নম্বর বেডে আছি। আশা করি আমার চিঠি পাবি। দেখা করতে দেরী হলে চিঠি দিস।

—সুকান্ত ৮।৪।১৯৪৭।

রোগজীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও তাঁর মন পড়ে আছে দাঙ্গা লাঞ্ছিত কলকাতার পথেঘাটে—কেননা এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মেহনতী

মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করছে, বিপ্লবের অগ্রগতি ব্যাহত করছে। অধ্যাপক শান্তিময় রায় লিখেছেন : "৪৫-৪৬ সালের সব কটি বড় গণ-আন্দোলনে সুকান্তকে সামিল হতে দেখেছি। যেখানে বিপ্লব সেখানেই সুকান্ত, যেখানে আন্দোলন সুকান্ত সেখানেই। অস্থির হয়ে অনবরত চরকির মতো ঘুরতো সুকান্ত। কিছুদিন পরে কলকাতার বুকের ওপর নেমে এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হানা-হানি। কমিউনিস্ট পার্টি আর 'স্বাধীনতা'র অফিস আট নম্বর ডেকার্স লেনেই ছিলো। তখন একমাত্র জায়গা, হিন্দু-মুসলমান নির্ভয়ে যেখানে মিলিত হতে পারতো। আমরা ওই বাড়িটিকে বলতাম 'শান্তির দ্বীপ'—'আয়ল্যাণ্ড অব পিস' ওখান থেকে 'স্বাধীনতা'য় 'কিশোর সভা'র কাজের ফাঁকে কতোদিন আমাদের সঙ্গে রিলিফ এ্যাণ্ড রেস্কিউ-এর কাজে যোগ দিয়েছিল সুকান্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিদিনের পাশবিকতার যন্ত্রণা কাঁটার মতো বিঁধেছিল তার মর্মে মর্মে।

"সুকান্ত যেন হঠাৎ বিমর্ষ বেদনার্ত হয়ে উঠলো।

তার কিছুদিন পরেই সুকান্তকে দেখতে যেতে হলো যাদবপুর টি, বি হাসপাতালে।

: কি হবে শান্তিদা, দাঙ্গা থামবে ? আবার আমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে পারবো ? এই ছিলো সেদিন সুকান্তর একমাত্র প্রশ্ন। তার সারা মন-প্রাণ জুড়ে এই একটি ভাবনাই তোলপাড় করেছিলো সেদিন। দিন যতো এগিয়ে আসছিল, সুকান্তর চোখে-মুখে ফুটে উঠছিল এক বিপ্লবী দীপ্তি। মানুষের প্রতি ছিল তার গভীর মমতা, আর ছিল মহান প্রত্যাশা।"

সুকান্তর চিকিৎসার জন্য এ সময় দলমত নির্বিশেষে বহু খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে সহযোগিতা করেছিলেন। 'চিকিৎসা ফাণ্ড'ও তোলা হয়েছিল। সুকান্তর আপন ভায়েরা কতটুকু কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন শেষের দিনগুলির ঘটনাবলী থেকে বা বিভিন্ন স্মৃতি চিত্রণ থেকে জানা যায় না, তবে জেঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এই মা মরা ভাইটিকে বাঁচাবার। সুকান্ত অবশ্য তাঁর পরিবারকে অনেক বড় সম্পদ দিয়ে গেছেন। পারিবারিক বাঁধা নিয়মে সুবোধ বালকের মতো না চলে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত ব্যথিত অবহেলিত সাধারণ মানুষের জীবনের শরিকত্ব অর্জন করতে গিয়ে, মেহনতী মানুষের পার্টির কাজ কর্মে বিজড়িত হওয়ার ফলে অনেক পারিবারিক শাসনের সম্মুখীন সুকান্তকে হতে হয়েছিল বলে শোনা যায়। হয়তো এই পারিবারিক গোঁড়ামি,

পশ্চাদপদতা ও সহানুভূতির অপ্রতুলতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতো, আরও বহির্মুখে ঠেলে দিত। তাই একটু ভালবাসা, একটু যত্ন পাবার জন্যে শ্যামবাজারে জেঠাইমার কাছে বা অরুণাচলের মা সরলা বসুর কাছে ছুটে যেতেন। সরলা বসুর ভাষায়—"সাড়ে তিন বছর ধরে সুকান্ত নানা রোগে ভুগছিল। একটু যত্ন করবারও কেউ ছিল না। ভাইগুলোকে উপদেশ দিতাম ওর খাবারটার পরে নজর করবে।"

অথচ সুকান্ত যে কত বড় সম্পদ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তাঁর দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের লেখা থেকে স্মরণ করা যেতে পারে:

"সুকান্তর মৃত্যুর ক'দিন পরেই 'ছাড়পত্র' ছেপে বেরুলো একটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে। ওই প্রতিষ্ঠানের সৌম-সুন্দর এক চশমা পরা ভদ্রলোক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ আমার কাছে আসতেন আমার দোকানের বইয়ের অর্ডার নিতে। আমার দোকান থেকে 'ছাড়পত্র' খুব বিক্রি হতো। ওঁর কাছেই একদিন শুনলাম 'ছাড় পত্র' ফুরিয়ে গেছে, আবার ছাপা হচ্ছে।

সেদিন আমি ওঁকে পরিচয় দিয়ে বললাম, অনিলবাবু, আমার বাবা, মানে ছাড়পত্রের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাবা এখনও বেঁচে আছেন, ছাড়পত্র আপনারা ছাপছেন ছাপুন, কিন্তু সেই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যদি এর জন্য কিছু টাকা দেন, তাহলে বাবার কিছু উপকার হয়।

অনিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, সুকান্ত আপনার ভাই, আপনাদের বাব এখনও আছেন? কোথায় তিনি?

বললাম, শ্রীমানী বাজারের নীচে 'সারস্বত লাইব্রেরী' আমার বাবার দোকান, ওখানে গেলেই তাঁর দেখা পাবেন।

উনি ভালো করে জেনে নিয়ে চলে গেলেন।

এর ক'দিন পরেই অনিলবাবু ছাড়পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা ফর্মাগুলি নিয়ে আমার বাবার দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আপনাদের যখন বইয়ের দোকান রয়েছে সুকান্তের 'ছাড়পত্র' এবার থেকে আপনারাই ছাপুন!

বিদায় নেওয়ার সময় আমার বৃদ্ধ বাবার হাতে দুশোটা টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছিলেন অনিলবাবু।

মৃত পুত্রের শোক সেদিন আমার বাবা নতুন করে অনুভব করেছিলেন। সেই থেকে ছাড়পত্র ওই সারস্বত লাইব্রেরীই ছাপে। শুধু ছাড়পত্র কেন? সুকান্তর সমস্ত বই-ই ওরা ছেপে বিক্রি করছে এখন।" (সুকান্ত বিচিত্রা পৃঃ ১৫৫-৫৬)।

যে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবারের সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না সেই ছেলেই পরিবারের জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ রচনা করে দিয়ে গেছেন।

শেষ কয়েকটা দিন মৃত্যুপথযাত্রী সুকান্ত এক গভীর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। বন্ধু অরুণাচলও সে কথা বলেছেন তাঁর স্মৃতি কথায়: "পরিহাস-প্রিয়তা সুকান্তর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক, সকলেই জানেন। কিন্তু শ্যামবাজারের ঐ রোগশয্যা থেকেই তার শেষ রসিকতাটি বড় নিদারুণ। আমি আমার অভ্যাস মতো ওর কাছ ঘেঁসে বসেছি। বলছি ভাববার কিছু নেই। তুই শীগ্‌গিরই সেবে উঠবি। তাড়াতাড়ি উঠে চলে আয়, অনেক কাজ বাকি আছে। ও একটু হেসে বললো, 'হ্যা. একদম সেরে উঠবো একেবারে স্বয়ং সত্যেন দত্তের মতো?' এবং ওর কাছ থেকে প্রায় জোর করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিলো। সকলেই জানেন, কবি সত্যেন দত্ত মারা গিয়েছিলেন টি বি রোগে।

কিন্তু মুখে যাই বলুক, ওর ভাবভঙ্গিতে সেই আসন্ন মৃত্যুব কোনো উৎকণ্ঠা, ভয় বা নৈরাশ্যের লেশমাত্র নেই। অত্যন্ত উচ্ছল হাসিখুসিতে ও সেদিনটি কাটিয়ে দিল।

এরপর ওর মৃত্যুব চারদিন আগে আমি যাদবপুর টি বি হাসপাতালে ওকে দেখতে গেলাম। ওকে প্রথম দেখেই আমার বুকটা ছ্যাং করে উঠলো। আর আশা নেই। হাত-পায়ের গিঁটগুলো মোটা, রক্তলেশশূন্য সাদা পাকাটির মতো চেহারা। চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গেছে।

ও জিজ্ঞাসা করলো, কেমন দেখছিস? মুখে তবু বললায়, না, এই তো তোকে বেশ চকচকে দেখাচ্ছে। তারপর ও বালিশের তলা থেকে ওর ছাপানো বইয়ের ফর্মাগুলি দেখালো। যা পরে 'ছাড়পত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহ নিয়েই বললো, আমার অনেক নতুন জিনিস লেখার ভাব মাথায় এসেছে। এখান থেকে গিয়েই সেগুলো লিখবো।

শক্তির তীব্রতা সত্ত্বেও এক একদিন নৈরাশ্য, বেদনা আর মৃত্যুচিন্তায় ভরে থাকতো ওর মন আর কবিতা। আর আজ মৃত্যুর শিয়রে শুয়েও সে মৃত্যুভয় শূন্য। বিশ্বাস আর আশায় প্রায় অন্ধ। ওর ওই অসমর্থ নিরুপায় শায়িত মুখের হাসিটি কী দুঃসহ।" (আজ আছি নক্ষত্রের দলে)

মৃত্যুর তিন দিন আগেও কবি জগন্নাথ চক্রবর্তীকে সুকান্ত বলেছিলেন,

"জগন্নাথ দা, কিছু ভাববেন না, এই তো সেরে উঠছি, আবার নারকেলডাঙ্গায় আড্ডা জমাবো, আপনাকেও আসতে হবে। অরুণাচলকে আমার সমস্ত প্ল্যান বুঝিয়ে দেবো।" জীবনের কোন পরিকল্পনাই যে কাউকে আর বুঝিয়ে দিতে পারবেন না সেটা কি ভেবেছিলেন তখন? ভাবেন নি। পরদিন নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যান। এদেশের হাসপাতালে হৃদয়হীন ব্যবহার সুবিদিত। কেউ আশে পাশে ছিল না যে এগিয়ে এসে বিছানায় তুলে দেবে—নিজেরও উত্থান ক্ষমতা ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঐ ভাবে পড়ে থাকার পর অন্য রোগীরা দেখতে পেয়ে বিছানায় তুলে দেন এবং জমাদার ডেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন।

১৩ই মে ১৯৪৭ (২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয় হাসপাতালের বিছানায়। আগের দিন রাত থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে গিয়েছিল কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেউই জানতে পাবেন নি। পরদিন সকালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গিয়ে অন্তিম অবস্থা লক্ষ্য করেন। তারই ঘণ্টা খানেক পরে সুকান্তর জীবনাবসান ঘটে। পরদিন ১৪ই মে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বড় ছবি সহ বেরুল সেই মর্মান্তিক সংবাদ:

"গতকাল বাংলার কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যাদবপুর হাসপাতালে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন। সুকান্ত প্রায় একমাসকাল যাদবপুর হাসপাতালে ছিলেন। সোমবার শেষ রাত্রি হইতে তাহার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। মঙ্গলবার ভোরে 'স্বাধীনতা'র পক্ষ হইতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাসপাতালে যাইয়া দেখেন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেলা ১০টার সময় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহু ছাত্র, কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং বহু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন যাদবপুরে যান। সেখান হইতে তাঁহার মৃতদেহ কাশী মিত্রের ঘাটে আনা হয়।

সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যছিলেন, ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মী ছিলেন এবং বাংলার কিশোর আন্দোলনের প্রাণ শক্তি ছিলেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'কিশোর সভা' বাহির করা হয় তাঁহারই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায়। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা লাল পতাকা অবনমিত করিতেছি।"

এ এক অসাধারণ মৃত্যু। জীবন মরণের সীমানা পারায়ে মৃত্যু এখানে

পরাজিত। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই অপরাজেয় স্রষ্টার চিরঞ্জীবীতার তাৎপর্যটি বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন :

"অসুখে পড়বার অল্প কিছুদিন আগে একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক মিটিংএ যাবার পথে আমার এক সংশয়ের জবাবে সুকান্ত বলেছিল : আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি-কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এদেশের অধিকাংশ হবে। সেদিনই তর্কে আমি তাকে হারাতে চেষ্টা করেছিলাম। আজ আমাকে মানতেই হবে, একদিক থেকে তার কথাটা মিথ্যে নয়। গত কুড়ি বছর ধরে সুকান্তর বই বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্থানে (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) তার একটা ছাপা বই থেকে শয়ে শয়ে হাতে লিখে নকল করে লোকে সযত্নে ঘরে রেখেছে। তার পাঠককুল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখে নি। যে নতুন শক্তি সমাজে সে দিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল।" (সুকান্ত সমগ্র)

সুকান্ত নেই এটা যেন কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না। সুকান্তর চলে যাওযাটা সকলের বিবেক ও চৈতন্যকে ঘা দিযে জাগিযে দিয়েছিল,। শোক বিহ্বল সংগ্রামের সাথীদের পক্ষে এই বিয়োগব্যথা দুবিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের শোক জ্ঞাপন 'নিজেকে ক্ষমা করিনি' সর্বাপেক্ষা সৎ ও আন্তরিক। সুকান্তর মৃত্যুর পর তাঁর জনপ্রিয়তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য স্মৃতিকথা লেখকের ভীড় জমেছে। যাঁরা নিজে লিখতে পারেন নি তাঁরা লিখিয়েও নিয়েছেন অপরকে দিয়ে। অর্থাৎ এটা পরিস্কার যে সুকান্তর স্মৃতি কথা লিখতে পারাটা সকলের পক্ষেই বেশ গৌরব জনক হয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই সযত্নে গোপন করে গেছেন সুকান্ত বেঁচে থাকতে কী দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছিলেন। এদিক দিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'নিজেকে ক্ষমা করিনি' এক মহৎ দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষনীয়। শ্রী আহ্‌মদ বলেছেন :

"মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে—কোথায় গেলেন সুকান্ত? কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই। এভাবে ক'মাস যে কেটে গিয়েছিল তা এখন আমার মনে নেই। একদিন ঢাকার শামসুদ্দীন আহমদ আমার বাসায় এলেন। বললেন, 'আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। দেখলাম সে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়েছে। আমার পকেটে পাঁচটি টাকা ছিল। তাই আমি তাঁকে দিয়ে এসেছি।'

"আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একি অঘটন ঘটে গেল। আমি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। কমিউনিস্ট পার্টির বৃদ্ধ লোক আমি। আমার বয়স তখন ৫৭ বছর। ঢাকা হতে শামসুদ্দীন আহমদ এসে কিনা আমাকে সুকান্তের অসুখের খবর দিলেন। ভাবলাম আমার এই যে বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে আমি নিজেকে কি ক্ষমা করতে পারব কোনদিন? আমি কেন সুকান্তের খোঁজ নিলাম না। ত্রুটি আমার যাই হোক না কেন, এখন চিকিৎসা করানোই হচ্ছে আসল কথা। আমি কমরেড সুনীলকুমার বসুকে অনুরোধ জানালাম যে, এ ব্যবস্থাটি তাঁকেই করতে হবে। …হসপিটালে যাওয়ার পরে অসুখটা ভালোর দিকে না গিয়ে বাড়াবাড়ি রূপ নিল। রোগ বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। আজকার মতো ঔষধও আবিষ্কার হয়নি তখনকার দিনে।

"বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে আমরা একদিন সকাল বেলাতেই হস্‌পিটালে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য। তিনি খুব দ্রুত হেটে গিয়ে আমাদের আগেই সুকান্তের কেবিনে ঢুকলেন। আমরা কেবিনে প্রবেশ করে দেখলাম কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আর নেই। তাঁকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর গাড়ী ডেকার্স লেনের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল। আমরা গেটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সুকান্ত অনেকক্ষণ আমার হাত চেপে ধরে থাকলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন আর যদি দেখা না হয়। আমার অনুশোচনার আর শেষ নেই। কেন আমি আগে খবর পেলাম না? কেন ঢাকা হতে এসে শামসুদ্দীন আহ্‌মদকে আমায় সুকান্তের অসুখের খবর দিতে হলো! এই জন্যে আমি কখনও নিজেকে ক্ষমা করিনি।"

সুকান্তর মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে একজন চারণ কবিকে, কমিউনিস্ট পার্টি হারিয়েছে একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে আর নিপীড়িত জনগণ হারিয়েছে তাদের ব্যথা ও সংগ্রামের অগ্রচারী রূপকারকে। শোক জ্ঞাপন করে কবি অরুণ মিত্র যথার্থই বলেছেন:

"মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত? যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি, তা একদিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ী পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের সংগ্রামের সেই তীব্র হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী

সার্থক হয়েছে। আজ বাংলার ঘরে ঘরে সুকান্তের ভাষা তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

সুকান্তর অসুস্থতা ও মৃত্যু তৎকালের অন্যতম অগ্রজ সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গভীরভাবে শোকাভিভূত করেছিল। সুকান্ত-সৃষ্টির যুগজয়ীতা সম্পর্কে তাঁর মতো নিঃসন্দেহ আর কেউ ছিলেন না। সুকান্তর মৃত্যুর পর 'স্বাধীনতা'র বিশেষ সংখ্যায় তাঁর 'কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ' রচনায় সেই অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে। আরেকটি কবিতায় তিনি বলেছেন তাঁর শৈশবের কবিতা লেখার ইচ্ছার অপূর্ণতা তিনি সন্ধান করে ফিরছিলেন অপর কোন কবির মধ্যে। আর সেই ইচ্ছার পূর্ণতার সন্ধান তিনি পেলেন কবি সুকান্তর মধ্যে—তবে বেশী দিন তাঁর সঙ্গ তিনি পান নি, কারণ মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—

"ছন্দে সাজিয়ে সৃষ্টি করে বোবা প্রাণের ভাষা,
রূপ দেয় অবাধ্য অনায়ত্ত ঝড়কে, আবর্তকে।
আমার বিদ্রোহের চারাগুলি সবুজ ওর মনে,
আমার সাধ হয়েছে ওর সার্থকতা।
বড় রোগা ছিল আমার কবি,
তার ভাত ছিল কম, ক্ষয় অনেক,
জাত লড়ায়ে সৈনিক তো।
একদিন চিরতরে থেমে গেল তার চলা,
অসাড় হয়ে গেল বাড়ানো হাতখানি,
যুগের বসন্ত এলে সে গাইত জয়গান
তাকে জমিয়ে দিল ভাতের মালিকের ছড়িয়ে রাখা
উপোসী শীতের ফাঁদ,
ক্ষইয়ে দিল জিইয়ে রাখা রক্তপায়ী কীট।"

"মাটির কাছে কিশোর কবি" নামে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, আর এই উপন্যাস যে কবি সুকান্তর জীবন দ্বারা প্রভাবিত তা তিনি এই উপন্যাসের ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন:

"গোড়ায় তোমাদের বলে রাখাই ভাল যে এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তার জীবন কাহিনী ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ্ উপন্যাস—চরিত্রই বলো আর কাহিনীই বলো সব আমার মগজের

কারখানায় তৈরী। সুকান্ত অবশ্য এদেশে পুষে রাখা যক্ষার অভিশাপে অল্প বয়সে প্রাণ দিয়েও কবি হিসাবে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমার উপন্যাসের কবিকে কাহিনীর শেষে কবি আর রক্ত মাংসের মানুষ দু'রকম হিসাবেই জীবন্ত দেখতে পাবে।

কিন্তু ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুকান্ত সম্ভব না হলে মাটির কাছে আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হলে, তোমাদের জন্যে আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হত না। যতই রং চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই, মাটির মানুষকে অন্ততঃ ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না, লিখব কি !"

অন্যত্র এক সাহিত্য আলোচনায় এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

"পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিলেন বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা এত ভালবাসে এত সম্মান করে ? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।"

এই মন্তব্যকে স্নেহের প্রাবল্য জনিত অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে কিন্তু সুকান্তর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তার মূল এই বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। স্রষ্টা হিসেবে সুকান্তর সার্থকতা এখানে যা মাণিকের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উন্মেষ পর্বের সৃষ্টি

"সুকান্তর যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়।...কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর করে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। পড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন, আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা পড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।

আমার সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যেই বোধ হয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারব না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কী এমন ছিল যে, পড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না কারণ' বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি বয়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত।" সুকান্ত সমগ্র'-ভূমিকা -সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালাবার পূর্বে সকালবেলা চলে সল্‌তে পাকাবার পর্ব। এই সল্‌তে পাকাবার পর্বের খোঁজ বড় একটা কেউ করে না। আর প্রদীপের আলো পাওয়ার প্রসঙ্গে সল্‌তে পাকাবার পর্ব স্মরণ করাও অনেকের অপছন্দ। অথচ এই অতিবাস্তব প্রসঙ্গ একজন কবির জীবনে উপেক্ষনীয় বিষয় নয়। পিছনের এই দিনগুলো উত্তর কালের কাছে মহা-মূল্যবান। উন্মেষ পর্বের লেখা নিশ্চয়ই উত্তর পর্বের বিচারে দুর্বলই হবে, সকলেরই তাই হয়। "সুকান্ত সমগ্র-তে এমন অনেক লেখা আছে, যে লেখা হয়ত সুকান্তের সাজে না। সুকান্ত দীর্ঘজীবী হলে ছেলে বয়সের সে সব লেখা হযতো তার বইতে স্থানও পেত না-আমার মতামত চাইলে আমিও ছাপাবার বিরুদ্ধে রায় দিতাম। কিন্তু সুকান্তর অকালমৃত্যু আমাদেরও হাত বেঁধে দিয়েছে। সুকান্ত বেঁচে থাকলে যে জোর খাটানো যেত, এখন আর সে জোর খাটানো চলে না।"—ভূমিকা লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অনৈতিহাসিক।

আর জোর খাটাবেনই বা কেন? একজন লেখকের বিকাশের গতিপথ বিশ্লেষণে উন্মেষপর্বের লেখাগুলি আবশ্যিক উপাদান। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের রচনাবলী কি বাতিল হয়ে গেছে? বিপুল সাগরের জলরাশি থেকে এক আঁজলাও যদি ফেলা না যায় তাহলে মাত্র কয়েকটা বছরের ফসল থেকে বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে কেন! এই ধরণের অশ্রদ্ধেয় প্রসঙ্গ অসমীচিন এবং অবান্তর। বিশেষ করে যে বয়সের রচনা পড়ে সুভাষবাবু স্বয়ং এবং বুদ্ধদেব বসু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাসই করতে পারেন নি চোদ্দবছর বয়সের রচনা বলে!

মাত্র ন-দশ বছর বয়স থেকেই সুকান্তর লেখা শুরু হয় ছড়ার আঙ্গিকে নিতান্তই পারিবারিক পরিবেশে। অন্ত্যমিলে কথা সাজানোর খেলা—যা পরিবারের মানুষদের আনন্দ দিত। তখনও স্কুলে ভর্তি হন নি। লিখে চলেছেন একের পর এক ছড়া কখনও দুই বোন রমা ও রানীকে নিয়ে, কখনও জমিদারের দুই ছেলেকে নিয়ে কখনও বা মুদি দোকানের কর্মচারী কালিরতনকে নিয়ে। কখনও কবিতা রূপ পেয়েছে কথামালার গল্প 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', আবার চুপি চুপি সবার অজ্ঞাতসারে কে জি বসুর বাড়ীর নতুন রঙ করা দেওয়ালে কালির হরফে লেখা হয়ে গেছে কবিতা। কিন্তু সুকান্তর তো দেবেন ঠাকুরের মতো বাবা কিংবা দ্বিজেন ঠাকুর, জ্যোতি ঠাকুরের মতো দাদারা ছিলেন না যে শৈশব থেকেই সৃষ্টির রঙ তুলি হাতে তুলে দেবেন, উৎসাহিত করবেন, তারিফ করবেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। ছিল না জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর মতো পরিবেশ যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতির অনুশীলন হতো, যে স্থান নবজাগরণের কর্মধারায় নিত্যস্নাত ছিল। বরং সুকান্তর পরিবেশে ছিল সর্বদিক দিয়ে নিদারুণ মধ্যবিত্ততা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, স্নেহহীনতা।

বেলেঘাটার প্রাথমিক বিদ্যালয় কমলা বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হওয়ার পরে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে মিশে সুকান্তর স্রষ্টা মানস খানিকটা যেন স্ফূর্তি পেল। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সুকান্ত বের করলেন 'সঞ্চয়' নাম দিয়ে হাতে লেখা পত্রিকা, নিজে লিখলেন একটি হাসির গল্প। এই সময় গদ্য লেখায়ও তাঁর উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগপুরুষদের জীবনী, ছোট ছোট কবিতা ছড়া এবং গল্প লিখে হাত পাকাচ্ছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত শিশু-পত্রিকা 'শিখা'য়। এই পত্রিকায় বালক সুকান্তর কিছু প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়। সাথীদের নিয়ে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে দুয়েকটি নাটিকাও তিনি রচনা করেন। বলা বাহুল্য

এই সব রচনার বিষয়ের মধ্যে পরবর্তীকালের সুকান্তকে খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। বালক সুকান্তর দৃষ্টির সামনে সমগ্র পৃথিবী তখন সমস্ত বিস্ময় নিয়ে উপস্থিত। হৃদয় তখন নির্মল, দৃষ্টি রঙিন, বিকাশমান চেতনায় উদার মানবিকতা এবং সঙ্গে হতশ্রী পারিবারিক পরিবেশের বিষণ্ণতা।

মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধিকে কেন্দ্র করে পরিবারে যে বিষণ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল মায়েব মৃত্যুতে। ইতিপূর্বে স্নেহের আশ্রয় রানীদিদিকে হারিয়েছেন, এবার হারালেন শেষ অবলম্বন মাকে। গোটা পৃথিবী যেন অন্ধকাব হয়ে গেল বালক সুকান্তর সামনে। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণ কালের স্বভাবসুলভ বিষণ্ণতার সঙ্গে একের পর এক নিকটতম প্রিয়জনেব মৃত্যু যুক্ত হয়ে সাময়িকভাবে কবি হৃদয়ে বিষাদময়তা বিস্তার লাভ করে। মৃত্যুজনিত বিয়োগ ব্যথা অকবি হৃদয়ে হাহাকার আনে, কিন্তু কবি হৃদয়ে আবেকটু বেশী কিছু সৃষ্টি করে। কেননা কবি হৃদয় অধিক সংবেদন-শীল। সাধারণ হৃদয়ে যা ব্যক্তিগত বেদনা, কবি হৃদয়ে তাই সার্বজনীন হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমে সেই বেদনা সাধারণীকৃত হয়ে সৃষ্টিমুখে উৎসারিত হয। আর কবি যদি ব্যক্তি সর্বস্বই থেকে যান, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমীকৃত না হন তাহলে বিষণ্ণহৃদয় কবিতে পরিণত হন। আর যদি সমাজ, দেশ, যুগ ও কালের সঙ্গে দায়িত্ববোধে বিজড়িত হযে যান তাহলে কিশোর বয়সেও বিপ্লবের অগ্রচারী কবি সুকান্ততে রূপান্তরিত হন। যে সব সমালোচক বা জীবনীকাব এই উপাদানগুলিকে বুঝতে পারেন না তাঁবা সুকান্তর বালক বয়সের তাৎক্ষণিক বেদনাবিধুরভাব অবমূল্যায়ন করে সুকান্তর মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি কথা বলে থাকেন। নিজেদেব পাণ্ডিত্যাভিমানেব পরিমাপে দার্শনিকতার আরোপ করতে গিয়ে সুকান্তর প্রতি অবিচার করে বসেন। কেউ কেউ আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাঁর সৃষ্টির বৈপ্লবিক ভূমিকার পিছনে একটা কিন্তু জুড়ে দেবার মতলব নিয়ে এই ধরনেব আলোচনার আসর বসিয়েছেন। সুকান্তর জীবনের একের পর এক মৃত্যুজনিত আঘাতগুলির নিদারুণ বাস্তবতা এঁরা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করতে চান।

মধুপুরে সুকান্তর মা যখন মারা যান তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা উপলক্ষে তাঁর জেঠাইমার কাছে। তাই শেষের কটা দিন মায়ের কাছে না থাকতে পারার বেদনা বালক মনে এক অন্তর্মুখীনতার জন্ম দেয়। বিশেষ করে যখন তাঁরা আবার বেলেঘাটার বাড়ীতে ফিরে আসেন তখন চতুর্দিকে মায়ের স্মৃতি ঘেরা এক স্নেহবঞ্চনাময় পরিবেশ তাঁদের বেদনা আরও বাড়িয়ে তোলে। বড়রা

যে যার কাজে বেরিয়ে গেলে ছোট ভাইগুলোকে সামলানোর দায় তাঁর উপরেই বর্তাতো। বাড়ীতে আর কোন মহিলাও ছিলেন না। এই স্নেহ মমতাহীন রুক্ষতা কবির introvert মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই যতক্ষণ না বৃহত্তর সমাজবোধে ব্যক্তিগত শোক দুঃখ বেদনা অতিক্রান্ত না হয় ততক্ষণ ব্যক্তিশোক আত্মকথনে ব্যক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল করে
মনে রাখো মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার।
... ...
প্রভাতপাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান। (হে পৃথিবী)

শৈশবে প্রভাত পাখির কলস্বরে যে জীবনের আনন্দময় সূচনা হয়েছিল কবির কৈশোরে আজ তার তিক্ত অবসান হয়েছে, সেখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, শুধু আছে নিঃসীম অন্ধকার আর শূন্যতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব শেষ হয়ে যায় না, বহির্জগতে আছে প্রাণের স্পন্দন, জীবনের ছন্দ তাই কবির আশ্রয়—

তবু তো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময়!
সেই মোর জয়॥ (ঐ)

প্রিয়জনের মৃত্যু শোকাহত মনে শুধু অমঙ্গল আশঙ্কাই বারবার নিয়ে আসে, জীবনটা মৃত্যু দিয়ে ঘেরা বলে বিশ্বাস জন্মে।

নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকাল শকুনি।
গোধূলি আকাশ বলে দিল
তোমার মরণ অতি কাছে,

কিংবা,— আমার দিনান্ত নামে ধীরে
আমি তো সুদূর পরাহত,
অশত্থশাখায় কালো পাখি
দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত।
সন্ধ্যাবেলা, আজ সন্ধ্যাবেলা
নিষ্ঠুর তমিস্রা ঘনাল কী !
মরণ পশ্চাতে বুঝি ছিল
সহসা উদার চোখাচোখি॥ (সহসা/পূর্বাভাস)

মৃত্যু ভয় কবির অনেকখানি কেটে গেছে, সহনীয় হয়ে এসেছে। মৃত্যুর সঙ্গে কবির এখন 'উদার চোখাচোখি'—লুকোচুরি খেলা নয় তবু যেন এক কৌতুককর খেলার অনুভূতি। সেখানে আলো-আঁধারের নিত্য যাওয়া আসা। আকাশে ঘনায়মান মেঘের কোলে আলোর রূপোলি রেখা—আশা নিরাশায় ঘেরা জীবনের কঠোর বাস্তবতা।

দৃষ্টিহীন সন্ধ্যাবেলা শীতল কোমল অন্ধকার
স্পর্শ করে গেল মোরে। স্বপনের গভীর চুম্বন,
ছন্দ-ভাঙা স্তব্ধতায় ভ্রান্তি এনে দিল চিরন্তন,
অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে, প্রতিবার
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর বিস্তার। (আলো-অন্ধকার)

কিন্তু এটাই একমাত্র বাস্তবতা নয় পৃথিবীর, তাই কবির মনে হয়—"তবু যেন আলো আর অন্ধকার মোর চারিভিতে।" জীবন ও মৃত্যুর সুকঠিন বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়॥

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ॥" (মৃত্যু, নৈবেদ্য)

পরিণত বয়সে বিপুল অভিজ্ঞতার দরজায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক সমাধান দিলেন তা কিশোর সুকান্তর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে সেই ইঙ্গিত :

তবু তো প্রাণের মর্মে প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা
অজস্র ফুলের বাজ্যে বাঁধে লঘু বাসা ;
রাত্রির বিবর্ণ স্মৃতি প্রভাতের বুকে
ছড়ায় মলিন হাসি নিবর্থ-কৌতুকে ॥"

জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসতে গিয়েই কবি আশাহত, চতুর্দিকে শ্রীহীনতা, হানাহানি বিচ্ছিন্ন হৃদয় কবিকে উদ্বেল করে তুলেছে। সহ্য করতে পারছেন না পারিপার্শ্বিককে, আবার পথও খুঁজে পাচ্ছেন না প্রতিকারের। তাই হতাশা—

ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
এখানে ওখানে, পথ চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত ॥

প্রতিকার প্রচেষ্টাহীন একদল মানুষকেই তিনি আশে পাশে দেখছেন—যারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, শূন্যপ্রাণে শুধু বয়ে চলা প্রাণ ধারণের গ্লানি। কবির তাই তীব্র ব্যঙ্গ—

চুপ করে বসে থাকো অন্ধকার ঘরে এক কোণে :
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণ কশা ॥ (পরিবেশন)

এই কবিতাটি থেকে মনে হয় কিশোর কবির দৃষ্টিতে সমাজ তার রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে ধরা দিতে শুরু করেছে এবং রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণ কশা বলতে হয়তো কবি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তৎকালীন হক মন্ত্রীসভা উভয়ের প্রতিই অনাস্থা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সমাজভাবনার পাশাপাশি আবার ব্যক্তিগত অভিমানও ব্যক্ত হয়েছে 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতায়।

পরিচয় ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,

বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের,
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ।
আমার মৃত্যুর পর, জীবনের মত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর॥ (আমার মৃত্যুর পর)

এ মৃত্যুচেতনার কাব্য নয়। স্নেহবঞ্চিত, অবহেলিত কিশোর প্রাণের মৃত্যু নিয়ে খেলা, বেঁচে থাকতে যাদের সহানুভূতি পান নি মৃত্যুর পর তাদের বিলাপের ছদ্মবেশ, দংশিত বিবেক কল্পনা করে কবি যেন কৌতুক অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'র মতো সিরিয়াসনেসও এ কবিতায় নেই। আবার জীবনানন্দের মতো সচেতনভাবে জীবন থেকে সরে মৃত্যুর অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকাও নয়—

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি। (অন্ধকার / বনলতা সেন)।

বা— মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,-প্রিয়ার মতন!
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ, (জীবন)

কিংবা— জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ। (জীবন)

জীবনানন্দের এই মৃত্যুপ্রেম বা মৃত্যুচেতনার মধ্যে যে Morbidity-র বিলাস রয়েছে সুকান্তে তার অস্তিত্ব নেই। সুকান্তর কাছে মৃত্যু ঘুম সমান নয়, ভয়ংকর যন্ত্রণার পরিণতি। তাঁর কাছে জীবন ও মৃত্যু একই প্রবাহের দুটি তীর আর এই দুই তীরের হাতছানিতে কবি চিত্ত দোলাচল। এক অগ্নিময় জ্বালা কবির অন্তরে, কখনও সে শান্ত হতে চায়, কখনও ফেটে পড়তে চায় আগ্নেয়লাভাস্রোতের মত!

অগ্নিময়

দিনরাত্রি মোর; আমি যে প্রভাত সূর্য
স্পর্শহীন অন্ধকারে চৈতন্যের তীরে
উন্মাদ, সন্ধান করি বিশ্বের বন্যায়
সৃষ্টির প্রথম সুর। বজ্রের ঝংকারে
প্রচণ্ড ধ্বংসের বার্তা আমি যেন পাই
মুক্তির পুলক লুব্ধ বেগে একী মোর

প্রথম স্পন্দন। আমার বক্ষের মাঝে
প্রভাতের অস্ফুট কাকলি, হে তারুণ্য,
রক্তে মোর আজিকার বিদ্যুৎ বিদায়
আমার প্রাণের কণ্ঠে দিয়ে গেল গান;
বক্ষে মোর পৃথিবীর সুর। উচ্ছ্বসিত
প্রাণে মোর রোমাঞ্চিত আদিম উল্লাস।
আমি যেন মৃত্যুর প্রতীক। তাণ্ডবের
সুর যেন নৃত্যময় প্রতি অঙ্গে মোর,
সম্মুখীন সৃষ্টির আশ্বাসে! (তারুণ্য / পূর্বাভাস)

সমকালের ধ্বংসের বার্তা যেমন কবির হৃদয়কে অস্থির করে তুলেছে তেমন সামনে সৃষ্টির আশ্বাসও পেয়েছেন কবি। পারিপার্শ্বিকের বাইরে যাঁদের দৃষ্টি যায় না, যাঁরা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বিলাপ করতে ভালবাসেন তাঁদের চেতনায় জীবনের স্মৃতি ধরা পড়ে না, মৃত্যুর মধ্যে আত্মাহুতিই তাঁদের সামনে একমাত্র মুক্তির পথ। তাঁরা অনুভব করতে ব্যর্থ হন যে জীবনটা অতীত ও বর্তমানের যোগফল। জীবন রঙ্গমঞ্চে মানুষ অতীতের উইংস থেকে প্রবেশ করে বর্তমানের পাদপ্রদীপে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করে ভবিষ্যতের উইংস দিয়ে প্রস্থান করে। এই ঐতিহাসিক চেতনা যাঁর নেই তিনি শুধু তাৎক্ষণিক বর্তমানের মধ্যেই হাবুডুবু খান দূর অতীত বা অদূর ভবিষ্যত কোনটাই উপলব্ধি করতে পারেন না। জীবন ধারায় যুগ ও কাল পরম্পরায় যদি নিজের অবস্থান নির্ণয় না করা যায় তাহলে নিজেকে এ পৃথিবীতে অপরিচিত ও আগন্তুক মনে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের যান্ত্রিক আচারীতায় মগ্নচৈতন্য সেই মানুষ অন্ধদৃষ্টি। স্টীফেন স্পেন্ডারের ভাষায় সেই ঐতিহ্যধারা ও ইতিহাস চেতনার স্বীকৃতি:

"Man is forced on to another level of truth outside society, outside contemporary history, where he rejects the idea that he is a ghost and reasserts the dream that the world is various and beautiful and new, and that it should haev certitude and peace and help for pain. For this is the dream of his flesh as well as his spirit, and it finds confirmation in geography as well as history. It is the dream which affirms life, and without such an affirmation life contradicts itself, denying its

own existence, and men turn in on themselves, becoming mechanic ghosts moving in a machine-made society."

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ উন্মেষ পর্বে সুকান্ত বেশ কয়েকটি গীতি কবিতা রচনা করেন। যে কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচায়ক। বাংলা সাহিত্যে বোধ করি এমন কোন কবি নেই যিনি কিছু না কিছু গীতি কবিতা রচনা করেন নি। গীতি কবিতা কবির রোমান্টিক বেদনা বিধুর মনের স্বভাবজ উৎসারণ। ভাবের আবেগ ও ভাষার লাবণ্যের সঙ্গে এই Romantic melancholy মিলে মিশে গীতি কবিতা emotions re-c llected in tranquilityতে পরিণত হয়। আর এই ভাবাবেগকে প্রকাশ করতে আধুনিক গীতিকবিরা কল্পনালোককে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাস্তব জগতের বহিরাঙ্গনে। তাই বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত কবির মানসলোকে উর্দ্ধায়িত হয়ে গীতিময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর অন্তর্লোকে এক অতীন্দ্রিয় রহস্যঘেরা ভিন্নতর পৃথিবীর অস্তিত্ব যেন আবিষ্কার করেন রোমান্টিক গীতি কবিরা। বাংলা ভাষায় আধুনিক গীতিকবিতা সর্বাপেক্ষা সার্থক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে। শেলি ও কীটসের পেগান আবেগ, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের পরিবর্তন বিমুখতা, কোলরিজের অতিপ্রাকৃতে আশ্রয়গ্রহণ রবীন্দ্রনাথে দূরলক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত কিছুকে আত্মস্থ করে ভাবাবেগের সংহতরূপে গীতিকবিতা রচনায় অনেক বেশী সম্পূর্ণতা দানে সমর্থ হয়েছিলেন। সুমিতিবোধ রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশেষিক লক্ষণ—তিনি কাব্য ও গীতিধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। বিদেশী কবিদের মতো তিনি বলেন নি: **"We are the music makers, we are the dreamers of dreams."**

বাংলা গীতিকবিতা এই রবীন্দ্র ঐতিহ্যানুসারী। রবীন্দ্র সমকালেই কবি নজরুল ইসলামে রোমান্টিকতার সঙ্গে এক এনার্কিক স্বভাব ধর্ম মিশে গিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে গীতি কবিতার জগতে বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-নজরুলের পথ ধরে গীতি কবিতা শুধু আর আত্মগত ভাববাহিকা নয় সেখানে বিষয় ও তত্ত্বের অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথাপি গীতিকবিতার অন্যতম প্রাণধর্ম গীতিময়তার প্রাধান্য বজায়ই থেকেছে, না হলে গীতিকবিতা তার সাধারণ চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। এজরা পাউণ্ডের ভাষায়:

কথাগুলি সর্বৈব সত্য বিশেষ করে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে। যদি কবির

গীতানুভূতি না থাকে তাহলে তিনি উপযুক্ত ছন্দ ও ভাষা ব্যবহারে গীতিকবিতায় যথার্থ ভাবের সংযোজন করতে পারবেন না।

সুকান্তর গীতিকবিতাগুলির মধ্যে এই বৈশেষিক লক্ষণগুলি সবিশেষ বর্তমান। ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখ বেদনার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান অন্ধকার সাময়িকভাবে কবিকে প্রভাবিত করে। তাই বিষাদময়তাব প্রধান অবলম্বন গীতিকবিতা সুকান্তর কিশোর কলমে ধরা দিল। বলা বাহুল্য ভাব, ভাষা, সজ্জায় রবীন্দ্রপ্রভাবই এখানে সর্বগ্রাসী। তবুও বিস্ময় লাগে চোদ্দ পনের বছরের ছেলে কেমন করে এমন অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করলেন। গীতি কবি হিসেবে তাঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'স্মারক' কবিতায়।

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে,
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে,
তবুও পড়িবে মনে।
বলাকার পাখা আজও যদি উড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে,
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে মেলে
মুক্তির ঢেউ লেগে,
বন্যার মহাবেগে।

.. .. ..

নির্জন পথে হঠাৎ হাওয়ার আসক্তিহীন মায়া
ধূলিরে উড়ায় দূরে,
আমার বিবাগী মনের কোণেতে কিসের গোপন ছায়া
নিঃশ্বাস ফেলে সুরে ;
ধূলিরে উড়ায় দূরে।
কাহার চকিত-চাহনি-অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।

বিরহিণী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখেনিকো কোনো ক্ষণে।
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়তো পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে॥

বয়সের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়, নিসর্গের পটভূমিতে এমন আত্মগত ভাবের পরিবেশন কত অসামান্য। ভাবের গভীরতা প্রকাশে 'আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে' ইত্যাদি চিত্রকল্পের ব্যবহার অসাধারণ। আলেয়ার বুকে বাঞ্ছিত জ্যোৎস্নার ছবি এক ঝলকের জন্য দেখে মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিজের ঘরের বাতি জ্বালে নি। কিন্তু ক্ষণিকের বিশ্বাস যখন ভেঙে চুরে গেল তখন বিষণ্ন রাত কেঁদে কেঁদে কাটান ছাড়া উপায় কী? তবুও আশা, শ্রাবণের মেঘের উত্তরযাত্রা হয়তো কবির কথা সকলকে মনে পড়িয়ে দেবে বিশেষ করে কবির সাজানো বাগান রজনীগন্ধা বনে। কিশোর কবির আকাঙ্খা আছে, আকুতি আছে কিন্তু দাবী নেই, হয় তো ভেবেছেন কতটুকুই বা দিতে পেরেছেন পৃথিবীকে। রবীন্দ্রনাথে এই আকুতি অনেকখানি দাবীতে পরিণত হয়েছে:

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেম জালে॥
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে—
তবু মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে
তবু মনে রেখো॥

গীতি কবিতা কবির সৃষ্টি ক্ষমতার পরাকাষ্ঠাস্থল। প্রেম, প্রীতি, ভালাবাসা, নিসর্গচেতনার মিশ্রনে গীতি কবিতা এক সূক্ষ্মতর অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ।

এই অনুভূতি অনিবার্য ভাবে অকথিত ব্যথা ও বিরহের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায়। বড় স্রষ্টার হাতে আবার ব্যক্তিগত ব্যথা ও বেদনা সাধারণীকৃত হয়ে ওঠে। কবি নিঃসঙ্গ কিন্তু জনারণ্যে নিত্য পথিক। আর এই নিঃসঙ্গতার দৃষ্টিতে শুধু নৈরাশ্যের দৃশ্যই ধরা পড়ে। আশা-নিরাশা, real unreal-এর দ্বন্দ্ব কবিকে অস্থির করে তোলে, স্বপ্নভঙ্গ জনিত বেদনার সুর প্রধান হয়ে ওঠে। গীতি কবিতার এই সাধারণ ধর্ম সুকান্ত কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়।

আজ রাত্রে ভেঙে গেল ঘুম,
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম,
তন্দ্রাঘোরে দেখিলাম চেয়ে
অবিরাম স্বপ্নপথ বেয়ে
চলিয়াছে দুরাশার স্রোত,
বুকে তার বহু ভগ্নপোত।
বিফল জীবন যাহাদের,
তারাই টানিছে তার জের ,
অবিশ্রান্ত পৃথিবীর পথে,
জলে স্থলে আকাশে পর্বতে
একদিন পথে যেতে যেতে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে॥ (স্বপ্নপথ)

কবির বিষণ্ণতা এখানে ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। পথ চলতে উষ্ণ বক্ষে অর্থাৎ গভীর আবেগ নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই আজ মৃত্যুমুখী। তাঁদের আত্মদানের মধ্যে কবি ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছেন যা কবিকে ব্যথিত করেছে। কবির তাই বিশ্বাস সমগ্র মানবধারায় মানুষ পরাভূত একটি বুদ্বুদ মাত্র—

জন্মের প্রথম কাল হতে,
আমরা বুদ্বুদ মাত্র জীবনের স্রোতে।
এ পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী,
যেখানে কীর্তির নামাবলী,
আমাদের স্থান নেই সেথা—
আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা॥

সার্থক গীতি কবিতার মধ্যে সঙ্গীত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। স্বরারোপ হলে সহজেই তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে। তাই গীতি কবিতা গীতিগুচ্ছ, গীতি মাল্য, গীত বিতান ইত্যাদি সংকলনের মধ্যে সুরের ধারায় স্থান করে নেয়। গীতি কবিতার এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে ইংরেজ কবি টি এস এলিয়ট বলেছেন :

"A musical poem is a poem which has a musical pattern of the secondary meanings of the words which compose it, and that these two patterns are indisoluble and one. And if you object that it is only the pure sound, apart from the sense, to which the adjective musical can be rightly applied, I can only reaffirm my previous assertion that the sound of a poem is as much an abstraction from the poem is the sense." (The music of Poetry).

তাৎক্ষণিকতা গীতি কবিতার অন্যতম লক্ষণ। মেজাজের বিভিন্ন মুহূর্তকে কবি উপেক্ষা করেন না, ক্ষণিকানুভূতিকে প্রতিফলিত করেন ভাবের দর্পণে। গীতি কবিতার লক্ষ্য হল 'to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake '' (W. pater) বলাবাহুল্য এই মুহূর্ত চেতনা নিশ্চয়ই উদ্ভটত্ব প্রশ্রয় দেবে না, যদি দেয় তাহলে তা অপরের হৃদয়কে নাড়া দেবে না। মুহূর্ত চেতনাকে নিশ্চিত ভাবেই কোন না কোন স্থায়ী ভাবের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হতে হবে এবং জীবনের নিত্যভাব অনুসারী হয়ে উঠতে হবে। A. C Bradleyর ভাষায় "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all প্যাটার ও ব্রাডলের এই বক্তব্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সুকান্তর প্রথম পর্বের একই নামের দুটি অসামান্য কবিতায়। মুহূর্তের ভাব ও চৈতন্য যে কবিকে কতখানি বিচলিত করে তুলতে পারে এই কবিতা দুটিতে তারই প্রকাশ। যদিও এই মুহূর্ত ভাবনা কবির সমকালীন ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন উন্মার্গগামীতা নয়, জীবনের কেন্দ্রে বিধৃত আশা নিরাশার উন্মোচন। এই কবিতায় সুকান্ত মুহূর্তকে কালের কপোলতলে উপস্থাপিত করে এক দার্শনিক ভাবনায় উত্তরিত করেছেন।

যে সব মুহূর্তগুলো আজো
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়

ফোটায় সবুজফুল,
উড়ে আসে কাব্যের মৌমাছি।
অসংখ্য মুহূর্তে গড়ে তোলা
স্বপ্ন-দুর্গ মুহূর্তে চুরমার।
আজ কক্ষচ্যুত ভাবি আমি
মুহূর্তকে ভুলে থাকা বৃথা ;—
যে মুহূর্ত অদৃশ্য প্লাবনে
টেনে নিয়ে যায় কক্ষান্তরে।
আজ আছি নক্ষত্রের দলে,
কাল জানি মুহূর্তের টানে
ভেসে যাব সূর্যের সভায়,
ক্ষুব্ধ কালো ঝড়ের জাহাজে॥ [মুহূর্ত (ক)]

অসংখ্য মুহূর্তের সামগ্রিকতা হলো জীবন। হাসি কান্নায় দোলদোলানো। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান কেননা কোনটি আনন্দের সঙ্গে আবার অপরটি বিষাদের সঙ্গে বিজড়িত। কবির ভাষায় —

এমন মুহূর্ত এল আমার জীবনে.
যে মুহূর্ত চিরদিন মনে রাখা যায়--
অথচ আশ্চর্য কথা,
নতুন মুহূর্ত আর এক
সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ। [মুহূর্ত (খ)]

কিন্তু সামগ্রিকতা থেকে একটি মুহূর্তের moodকে বিচ্ছিন্ন করে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে ভ্রান্তি ঘটে, অস্তিত্ববাদের চেতনার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক গীতি কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রায়শই লক্ষিত হয়। ফলে সৃষ্টি তাৎক্ষণিক বিষাদময়তায় নিমজ্জিত হয়ে অনেক সময় ভোগবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

ব্যর্থ হয়েছে দিন,
রাত্রি আমার বৃথা ;
আসো নাই তুমি আসো নাই।
স্বপ্নেই হলো লীন
স্বপ্নের পরিচিতা ,

বাসা নাই তার বাসা নাই।
বিরতিবিহীন কাল
চল্লিশে দিলো তাল—
আশা নাই আর আশা নাই।

(পথের শপথ ॥ বুদ্ধদেব বসু)

সুকান্ত কিন্তু তাৎক্ষণিক বিষাদময়তার ঊর্ধ্বে অনাগত কালের তরীতে তার মুহূর্তগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

নিঃসঙ্গ স্বপ্নের আসা-যাওয়া
ধূলিসাৎ—তাই আজ দেখি,
প্রত্যেক মুহূর্ত— অনাগত
মুহূর্তের রক্তিম কপোলে
তুলে ধরে সলজ্জ প্রার্থনা ॥ [মুহূর্ত (খ)]

গীতিগুচ্ছ শিরোনামে সুকান্তর কিছু কবিতা 'সুকান্ত সমগ্র'তে স্থান পেয়েছে। এগুলিকে সুকান্তর উন্মেষপর্বের রচনা বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বলা হয়ে থাকে, আর সেটাই সম্ভব। কিন্তু এগুলি সঙ্গীত হিসেবেই সুকান্ত রচনা করেছিলেন কিনা স্পষ্ট নয়। তবে এই গীতিকবিতাগুলো সহজেই সুরারোপিত হয়ে গীত হতে পারে। সঙ্গীত ধর্মীতা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি এলিয়ট বলেছেন, "Some poetry is meant to be sung ..." অধ্যাপক বেল্টনের ভাষায়," A lyric is, however, to be thought of as being fairly simple and musical in diction." ভাষা, সুর ও ভাববৈচিত্র্যের দিক থেকে উপরোক্ত বক্তব্যগুলি সুকান্তর গীতি কবিতা বিশেষ করে গীতিগুচ্ছের মধ্যে অতি প্রত্যক্ষ। গীতি কবিতাগুলি বিচার করলে কিশোর সুকান্তর উপর কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু সুকান্ত অক্ষম অনুকারী ছিলেন না, আত্মীকরণের মাধ্যমে স্বীয় বৈশিষ্ট্য রচনা করতে, নতুনতর সুর লাগাতেও সমর্থ হয়েছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি ও আত্মনিবেদনের সুরই এখানে পক্ষ বিস্তার করেছে। কাব্যিক শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কবির রোমান্টিক ভাবের সার্থক প্রক্ষেপণ ঘটেছে এই সব কাব্যে। সাংগীতিক সারল্য এর প্রাণধর্ম। গীতিকবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যেও এক সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে যা উপাদানের তারতম্যে, বক্তুলির মোটাসরু টানে উদ্ভাসিত। "অবশ্য গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই

যে. গানে কবি তাঁহার ভাবকে যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনা প্রযোগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায কল্পনাব ঐশ্বর্য, বহুচারিতা অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপলাভ করে। দেশপ্রেমের কবিতা সংকলনে সর্বত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় নাই। বহু দেশপ্রেমের গান উৎকৃষ্ট গীতি কবিতারূপে পাঠকমনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।" (ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন-এর ভূমিকা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। সুকান্তর গীতিগুচ্ছে এই সীমারেখাটি রক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রগাঢ় ভাব আছে কিন্তু গীতি কবিতার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য কম। তাঁর গীতিগুচ্ছের বিষয় প্রধানতঃ দ্বিমুখী—প্রেম ও বিষাদময়তা। কোথাও কোথাও **resignation**-এর সুরও আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মতো তাঁর প্রেম অশরীরিরূপ নিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনে পরিণত হয় নি। আবার দয়িতার রূপ বর্ণনা বা দেহাশ্রয়ীতার লেশমাত্রও তাতে নেই। ব্যক্তিগত বিষাদময়তা দার্শনিক পরিমণ্ডলও সৃষ্টি করে নি। তবে গীতিগুচ্ছের কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রভাবনায় বারবার চিহ্নিত তা সহজেই পরি-লক্ষিত হয় যদিও মিস্টিকতার প্রয়াস নেই।

তাই গীতিগুচ্ছের প্রথম কবিতাই সেই কবির উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি সুকান্তর নিথর জীবন-দীঘিতে দোলা দিয়েছিলেন, যাঁর জন্য তাঁর দুয়ার সর্বসময়ের জন্য খোলা।

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা,
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা।
... ...
তোমার বাণীতে আমার মনের
এ ব্যাকুলতা—
পেয়েছ কী তুমি সাঁঝের বেলাতে,
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কী তুমি এসেছিলে—
ছিল দুয়ার খোলা॥

সুকান্তর প্রথম দিকের কবিতার মতো গীতিগুচ্ছেও কিছু গীতি আছে যেখানে মৃত্যুভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে। পারিবারিক পরিবেশে এর কারণ ইতিপূর্বেই

আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি না করে তাঁর একটি গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে যেখানে কবি মৃত্যুকে বরণ করেছেন।

হে মোর মরণ, হে মোর মরণ!
বিদায় বেলা আজ একেলা
দাও গো শরণ।
তুমি আমার বেদনাতে
দাও আলো আজ এই ছায়াতে
ফোটার গন্ধে অলস ছন্দে
ফেলিও চরণ॥
. . . . . .
তোমার পায়ে কী আছে যে,
জীবনবীণা উঠেছে বেজে,
আমায় তুমি নীরব চুমি
করিও হরণ॥

প্রসঙ্গত পাঠকের স্মরণে আসবে রবীন্দ্রনাথের 'মরণ মিলন' কবিতাটি। রবীন্দ্রভাবনাময় কিশোর কবির বিষণ্ণ হৃদয়ে নিশ্চয়ই এই কবিতার প্রভাব পড়েছিল।

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।
... .
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো-জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥ (মরণ মিলন)

গীতিগুচ্ছের অধিকাংশ গীতিই প্রেম ও বিরহ বিষয়ক। পূর্বরাগের পরিচ্ছন্ন চিত্ররূপ যেমন রয়েছে, রয়েছে প্রেমের জন্য আকূতি, তেমনি রয়েছে বিরহ

বেদনা। কৈশোরেই সুকান্তর জীবনে প্রেম এসেছিল কুণ্ঠিত চরণে। প্রথম প্রেমের আবির্ভাবে শিহরণ আছে, আছে বেদনা ও বিরহ। কৈশোর প্রেম কদাচিৎ বাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে। সে হৃদয়ে ঢেউ তুলে যায, মনে নানারঙের ছবি এঁকে যায, তারপর মিলিয়ে যায উত্তর জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তবতার রাজপথে। কবির জীবনে এই অপরিণত প্রেম এমন এক গভীরতায় পৌঁছে দেয যা সৃষ্টির সংবেদনশীলতায পর্যবসিত হয়, জীবনের ছন্দে রূপান্তরিত হয়। এ প্রেম বুদ্ধদেব বসুর দেহাশ্রয়ী কামনা লোলুপতা নয আবার জীবনানন্দের নিরবয়ব প্রেমও নয। সুকান্তর প্রেম বিষযক কবিতায় অবযবতা (concreteness) আছে. তা সে পূর্বরাগে বা বিরহেই হোক।

পূর্বরাগের কবিতা :

শয়ন শিযরে ভোরের পাখির রবে
তন্দ্রা টুটিল যবে।
দেখিলাম আমি খোলা বাতাযনে
তুমি আনমনা কুসুম চয়নে
অন্তর মোর ভরে গেল সৌরভে।
সন্ধ্যায় যবে ক্লান্ত পাখিরা ধীরে,
ফিরিছে আপন নীড়ে,
দেখিলাম তুমি এলে নদীকূলে
চাহিলে আমায ভীরু আঁখি তুলে
হৃদয তখনি উড়িল অজানা নভে॥

একটু প্রেম, একটু ভালবাসা, একটু হৃদয ভরণের আকুতি :

কিছু দিয়ে যাও এই ধূলিমাখা পান্থশালায,
কিছু মধু দাও আমার বুকের ফুলের মালায়।
কত জন গেল এ পথ দিযে
আমার বুকের সুবাস নিযে
কিছু ধন তারা দিয়ে গেল মোর সোনার থালায।
পথে চেয়ে আমি বসে আছি হেথা তোমার আশে।
তুমি এলে যদি কাছে বসো প্রিয় আমার পাশে।
কিছু কথা বল আমার সনে,

ঢেউ তুলে যাও নীরব মনে,
এইটুকু শুধু দাও তুমি ওগো আমার ডালায় ॥

আবার ব্যর্থতার জ্বালা, বিরহের বেদনা :

ফুল ঝরে আর যৌবন চলে যায়,
বার বার তারা 'ভালবাসো' বলে যায়।
তার পরে কাটে বিরহে,
শূন্য শাখায় কী রহে
সে কথা শুধায় কোন মন ?
'তুমি বৃথা' যায় কহে ॥

প্রেম জীবনেরই স্বাভাবিক ধর্ম, নিছক সাংসারিকের কাছে তার যে মূল্য স্রষ্টার সৃষ্টিশালায় তাঁর মূল্য আরও গভীর। স্রষ্টার ব্যক্তিত্বে সে সংযোজন করে মাধুর্য সুরের তরঙ্গ, রসের স্রোত বুঝিবা এক ধবনের প্রত্যয়। স্রষ্টা সুকান্ত তাই গানের পথের পথিক, সৃষ্টির ঝর্ণা ধারা। কিশোর বয়সে এ এক অভূতপূর্ব পরিণত উপলব্ধি। তাঁর নিজের কবিতায়—

গানের সাগর পাড়ি দিলাম
সুরের তরঙ্গে,
প্রাণ ছুটেছে নিরুদ্দেশে
তালের ভ্রুভঙ্গে।
আমার আকাশ মীড়ের মূর্ছনাতে
উধাও দিনে রাতে,
তান তুলেছে অন্তবিহীন
রসের মৃদঙ্গে।
আমি কবি সপ্ত সুরের ভারে,
মগ্ন হলাম অতল গম-খাদে,
জয় করেছি জীবনে শঙ্কারে,
মোর বীণা ঝংকারে,
গানের পথের পথিক আমি
সুরেরই সঙ্গে ॥

দশ এগার বছর বয়সে সুকান্তর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি রূপক কাহিনী-

কাব্য 'রাখাল ছেলে'। এক রাখাল ছেলে ও বনহরিণীর ভালবাসার সহজ সরল ট্রাজেডি। হরিণীরা মানুষকে বিশ্বাস করে না বরং শত্রুই মনে করে, কারণ মানুষ তাদের হত্যা করে। কিন্তু বিপরীত শ্রেণীর এই দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মালো বাঁশির সুরের মূর্ছনায়। প্রতিদিন ভোরবেলায় রাখাল ছেলে নদীর ধারে মাঠে গরু চরাতে যায় আর সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে। গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখাল ছেলে গাছের ছায়ায় বসে আপন মনে বাঁশি বাজায়। সেই বাঁশির সুরে প্রকৃতির রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। একদিন দোয়েল পাখি ডেকে বলে—

ও ভাই, রাখাল ছেলে,
এমন সুরের সোনা বলো কোথায় পেলে ?
আমি যে রোজ সাঁঝ-সকালে,
বসে থাকি গাছের ডালে,
তোমার বাঁশির সুরেতে প্রাণ দিই ঢেলে ॥

তোমার বাঁশির সুর যেন গো নির্ঝরিণী
তাই শোনে রোজ পিছন হতে বনহরিণী।
চুপি চুপি আড়াল থেকে
সে যায় গো তোমায় দেখে
অবাক হয়ে দেখে তোমায় নয়ন মেলে ॥

গানের সুরে দোয়েল পাখীর এই কথা শুনে পিছন ফিরে দেখে সত্যিই এক বনহরিণী মুগ্ধ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে গান শুনছে। রাখাল ছেলে তখন তাকে কাছে ডেকে বসাল। বনের পশুর ভয় ভেঙে গেল, জাতিশত্রু মানুষের মধ্যে এমন একজন শিল্পীকে দেখে সে বিশ্বাসে ভর করে রোজ কাছে বসে গান শোনে। হরিণীর অভিজ্ঞ মা কিন্তু মেয়ের এই ভাবান্তর সম্পর্কে সতর্ক করে দিল :

ও আমার দুষ্টু মেয়ে,
রোজ সকালে নদীর ধারে যাস কেন ধেয়ে।
ভুল করে আর যাস্‌নেরে তুই শুনতে বাঁশি
ওরা সব দুষ্টু মানুষ মন ভুলাবে মিষ্টি হাসি
বুঝি বা ফাঁদ পেতেছে ওরা তোকে একলা পেয়ে ॥

কিন্তু মায়ের কথা শোনার অবসর তখন আর নেই হরিণীর। গানের সুরের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে মন রাখাল ছেলের সঙ্গে। তার পরাণ কুল মানে না, বাধা মানে না, সুরের তরী বেয়ে তখন সে বনের সাগরের যাত্রী। নবপ্রেম রসে তার এ এক নবজন্ম। রাখাল ছেলে হরিণীকে শোনায় বাঁশি, আর হরিণী রাখাল ছেলেকে শোনায় গান :

তোমার বাঁশির সুর যেন গো
নদীর জলে ঢেউয়ের ধ্বনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন জাগায়
মাতায় বনের দিনরজনী।
সকাল হলে যখন হেথায় আস
বাঁশির সুরে সুরে আমায় গভীর ভালবাস
মনের পাখায় উড়ে আমি
স্বপন পুরে যাই তখনি ॥

কিন্তু তার এই স্বপ্নলোকে একদিন নেমে এল গভীর ট্র্যাজেডি। এক শিকারী সেই বনে এসে প্রেমমুগ্ধ বনহরিণীকে দেখে হত্যা করল। মৃত্যুপথযাত্রী সরল প্রাণ হরিণী রাখাল ছেলেকে অভিযোগ জানিয়ে বললে—বাঁশিতে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি, বোধ হয় মানুষ বলেই, আমার মৃত্যুর কারণ হলে। তবু তোমায় মিনতি করছি :

বাঁশি তোমার বাজাও বন্ধু
আমার মরণ কালে,
মরণ আমার আসুক আজি
বাঁশির তালে তালে।"

. ... .

বনের হরিণ আমি যে গো
কারুর সাড়া পেলে,
নিমেষে উধাও হতাম
সকল বাধা ঠেলে।
সেই আমি বাঁশরির তানে
কিছুই শুনিনি কানে
তাইতো আমি জড়ালেম এই
কঠিন মরণ জালে ॥

হরিণীর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল রাখাল ছেলে সমস্ত বনরাজির কাছে বিদায় নিয়ে চলল। বনের পাখি, নদীর ধার সবাই তাকে মিনতি জানাল—তুমি যেও না। কিন্তু রাখাল ছেলে কিছুতেই ভুলতে পারছে না তার বাঁশির সুরেই হরিণী মোহগ্রস্ত মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলেছে, আর শত্রুকে বিশ্বাস করতে গিয়েই তার মৃত্যু। তাই দূর থেকে শুধু রাখাল ছেলে বলে গেল :

ডেকো নাগো তোমরা আমায়
চলে যাবার বেলা,
রাখাল ছেলে খেলবে না আর
মরণ—বাঁশির খেলা॥

এই বিয়োগান্তক পরিণতিতে কাহিনী শেষ। দুঃখ বেদনার প্রতি সহমর্মীতা কৈশোরের ধর্ম। জীবনের জটিলতা ও কঠোরতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ মন স্বাভাবিক ভাবেই সংবেদনশীল ও সহানুভূতি প্রবণ থাকে। কিশোর সুকান্তর জীবনে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রানীদিদি ও মায়ের মৃত্যু জনিত বেদনা, তাই ভালবাসার সরল ট্রাজেডি তাঁর হাতে সহজেই সৃষ্টি হতে পেরেছিল। কিন্তু ট্রাজেডির ফাঁকে উৎসারিত হয়েছে কিশোর স্রষ্টার এস্থেটিক মনন। ট্রাজেডির মূলে কোন বড় আকাঙ্খা বা কোন প্রতিষ্ঠাকামীতা নয় শুধু বাঁশির সুর, শিল্প প্রেম, নান্দনিক পিপাসা। কবি আশ্চর্য পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেখালেন শত্রু ঘেরা পরিবেশে শিল্প বোধ, সৌন্দর্য প্রেম, ভালবাসার সম্পর্ক স্থায়ী হতে পারে না। ট্রাজেডি সেখানে অনিবার্য। এই তাৎপর্যময় সংকেতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি লেখকের গভীর মনন ও উপলব্ধির পরিচায়ক। কাব্যময় গদ্য ও গানের ভাষায় এমন এক গীতি-কাহিনী রচনা বিশেষ কৃতিত্বের পরিমাপক।

এই পর্বে আরও দুটি গীতি-আলেখ্য 'মধুমালতী' ও 'সূর্য প্রণাম' লিখেছিলেন কবি সুকান্ত। এক কিশোর প্রেমের কাহিনী 'মধুমালতী' আজও সংগ্রহ করা যায় নি। 'সূর্যপ্রণাম' রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে রচিত কনিষ্ঠতমের গুরু প্রণাম। এই সংগীতালেখ্য থেকে লক্ষ্য করা যাবে কী দারুণ ভাবে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাত্র পনেরো বছর বয়সে লেখা 'সূর্যপ্রণাম'। উদয়াচল অস্তাচল দুটি পর্বে বিস্তৃত আলেখ্যটি রবীন্দ্রজীবনী নয়, স্বীয় উপলব্ধির আবেগে সমগ্র রবীন্দ্রসৃষ্টির তাৎপর্যকে কবি অনুসরণ করেছেন। গান, কবিতা, বর্ণনার মালা গেথে যে সৃষ্টি তিনি করেছেন তা গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো নয়। আবার রবীন্দ্র সৃষ্টির বহু তাৎপর্যপূর্ণ অংশ এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সেটাই বিস্ময়ের একজন

পনের বছরের ছেলের পক্ষে কি করে রবীন্দ্র সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করে তার পালাবদলের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হল! আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সূর্যসঙ্কাশ প্রতিভার বন্দনা বা আত্মীকরণ ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই রাজপথ এড়িয়ে এগোতে গেলে গোলক ধাঁধায় পড়া অনিবার্য। আর সেই গোলক ধাঁধায় নিপতিত হয়েছিলেন সেকালের বহু লেখক। রবীন্দ্র ঐতিহ্য অস্বীকার করতে গিয়ে বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়ে যে সৃষ্টি তারা করলেন তার অধিকাংশই এদেশের মাটিতে জীবন রস পায় নি, ফলে কাগজের ফুল হয়ে গেছে।

'অভিযান' সংকলনের ভূমিকায় 'সূর্যপ্রণাম' সম্পর্কে বলা হয়েছে—"অনুরাগী পাঠকেরা এই কাব্যগ্রন্থে সুকান্তের ক্রমপরিণতির ধারা খুঁজে পাবেন।" বিষণ্ণ হৃদয়, করুণ রসের কবি সুকান্তর সৃষ্টিধারায় পর্বান্তরের সূচনাও ঘটেছে এই গীতি-আলেখ্যের মধ্য দিয়ে। কবি যেন সঠিক নিশানা ধরে এগিয়ে চলেছেন উত্তরণের পথে। 'সূর্যপ্রণাম'-এর ভাষাভঙ্গী বিস্ময়কর ভাবে পরিণত। গীতি কবিতার কোমলতার সঙ্গে গাম্ভীর্য মিলে মিশে এক ওজ গুণ সম্পন্ন প্রকাশভঙ্গিমা আয়ত্ত করেছেন কবি। মাঝেমাঝে ভুল হয়ে যায় বুঝি বা রবীন্দ্রনাথই পড়ছি। কোথাও আড়ষ্টতা নেই বরং রবীন্দ্রভাব ও ভাষা আয়ত্ত করে স্বচ্ছন্দ ভাবেই গুরু প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।

প্রথমেই সমবেত আগমনী গানের মধ্যদিয়ে শুরু— পূব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে / তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর বেশে। সূর্যোদয়ের বন্দনায় সুকান্তর কাছে পৌছে গেছে রবীন্দ্রনাথের বলাকার সেই বাণী 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।' বাগসর এই গতিতত্ত্ব যা বলাকার পক্ষ বিধূননের মাধ্যমে জড়ত্বের অবসানে নতুন যুগের আবাহন সঙ্গীত রচনা করেছে, সুকান্তর বিষাদময় জড়তা কাটাতেও সহায়ক হয়েছে। তাই কবি দেখেছেন রবীন্দ্রসূর্য আবির্ভাবে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সমাজে সৃষ্টির সমারোহ, অজস্র সূর্যমুখীর কলহাস। রজনীগন্ধার বনে দীর্ঘশ্বাসের মতো ধ্বনিত পিলু-বারোয়াঁর সুর মিলিয়ে গেল। অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় কবি গ্রথিত করেছেন সূর্যালোকিত পৃথিবীর আনন্দ যা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যায় না।

> হঠাৎ আলোর আভাস পেয়ে কেঁপে উঠল
> ভোরবেলা, কোন্ পুলকে, কোন্ অজানা সম্ভাবনায়?
> রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে অন্ধকার।

শিউলি বকুল ঝরে পড়ে শেষ রাত্রির কান্নার মতো,
হেমন্ত ভোরের শিশিরের মতো।
অস্পষ্ট হল অন্ধকার, স্বচ্ছ, আরও স্বচ্ছ
মৃতপ্রায়ের আগ্রহের মতো পাণ্ডুর আলো এসে পড়ে
আশীর্বাদের মতো ঝরা ফুলের মরা চোখে,
শুভ্র কপোলে, ঘুমন্ত হাসির মতো তার মায়া।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এল উচ্ছ্বসিত বন্যার বেগে,
হাতে তাদের আহরণী ডালা
তারা অবাক হয়ে দেখলে
একী! নতুন ফুল ফুটেছে তাদের আঙিনায়
রবির প্রথম আলো এসে পড়েছে তার মুখে,
ওরা বললে, ও তো সূর্যমুখী।
পিলু বারোয়াঁর সুর তখনও রজনীগন্ধার বনে
দীর্ঘশ্বাসের মতো সুরভিত-মত্ততায় হা-হা করছে,
কিন্তু তাও গেল মিলিয়ে। শুধু জাগিয়ে দিয়ে
গেল হাজার সূর্যমুখীকে।
সূর্য উঠল। অচেতন জড়তার বুকে ঠিকরে
পড়তে লাগল, বন্ধ জানলায় তার কোমল
আঘাত, অজস্র দীপ্তিতে বিহ্বল।
পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা ফিরে গেল উজ্জ্বল, উচ্ছল হয়ে
বুকে তাদের সূর্যমুখীর
অদৃশ্য সুবাস।

এই হাজার সূর্যমুখীর উদ্দেশে রবীন্দ্রসূর্যের নতুনতর আহ্বান, সমুখপথে জয়যাত্রায় সামিল হতে হবে। 'ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে / বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে।' কবি সুকান্তও এখন আর আত্মগত কবি নন, বিশ্ব এখন সমস্ত অস্থিরতা নিয়ে তাঁর সামনে সমুপস্থিত।

বিশ্বের আজ শান্তিতে অনাসক্তি,
সভ্য মানুষ যোদ্ধা,
চলেছে যখন বিপুল রক্তারক্তি,
তোমারে জানাই শ্রদ্ধা।

পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কবি সুকান্তর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে রবীন্দ্র প্রতিভার এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে। চিন্তাতেও এসেছে আপাত সারল্যের অন্তরে অতলান্ত গভীরতা, বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনন। কী অসামান্য দক্ষতায় একজন কিশোর কাব্যের ভাষায় সময় ও কালের অনিবার্য বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন, যার তুলনা পাওয়া ভার।

সময়ের পশ্চাতে বাঁধা সূর্যের গতি
কী সূর্যের পিছনে বাঁধা সময়ের গতি
তা বোঝা যায় না।
দিন যায় ভাবীকালকে আহ্বান করতে।
একটা দিন আর একটা ঢেউ,
সময় আর সমুদ্র।
তবু দিন যায়
সূর্যের পিছনে, অন্ধকারে অবগাহন
করতে করতে।

উদয়ের অনিবার্যগতি অস্তাচলে-এ বিবর্তন থামিয়ে রাখার সাধ্য কারও নেই, যেতে তাকে দিতেই হবে। 'আমি কেঁদে কই যেও না কোথাও / সে যে হেসে কয় মোরে যেতে দাও'। মহৎ প্রয়াণের সার্থকতা পিছনে ফেলে যাওয়া কীর্তির মধ্যে, যা উত্তরকালের হাতে মহাসম্পদ।

তুমিও জানিতে,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান
তবু তুমি শিল্পীর তুলিকা নিয়ে করেছ অঙ্কিত
সভ্যতার প্রত্যেক সম্পদ, সুন্দরের সুন্দর অচনা।
বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিগুলি
পৃথিবীর বিরাট সম্পদ। স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি
নূতন পথের।

তাই সেই নূতন পথেই উত্তর কালের জয়যাত্রা—

কবিগুরু
আমাদের যাত্রা শুরু
কালের অরণ্য পথে পথে
পরিত্যক্ত তব রাজরথে

আজি হতে শতবর্ষ আগে
অস্ত গোধূলির সন্ধ্যারাগে
যে দিগন্ত হয়েছে রক্তিম,
সেথা আজ কারো চিত্তবীণা
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে কিনা
সে কথা শুধাও?
শুধু দিয়ে যাও
ক্ষণিকের দক্ষিণ বাতাসে তোমার সুবাস
বাণীহীন অন্তরের অন্তিম আভাস।
তাই আজ বাধা মুক্ত হিয়া
অজস্র উপেক্ষাভরে বিস্মৃতিরে পশ্চাতে ফেলিয়া
ছিন্নবাধা বলাকার মতো
মত্ত অবিরত
পশ্চাতের প্রভাতের পুষ্পকুঞ্জবনে
আজ শূন্য মনে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর চেতনার দিগন্তরেখা উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন আলোয়, সে এক নতুন দায়িত্ববোধ। অস্তাচল পরে 'আয়োজন' শিরোনামায় সুকান্ত বলেছেন

দেউলের ফাটল
দিয়ে কোন্ অনাথ-তরু চাইবে আকাশ, চাইবে তোমার
মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা, জানি না। তবু এক দিন তা
সম্ভব, তুমিও জানো।

সুকান্ত সেই উত্তরকালের অনাথ তরুর সম্ভাবনা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থা ও জরাগ্রস্ত সংকটময় প্রভাত কালে যিনি পাঞ্চজন্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সার্থকভাবে।

রবীন্দ্র-প্রয়াণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে সুকান্ত যে কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যেও বিশ্বময় ঘনায়মান সংকটের প্রতিচ্ছবি। বিশ্বকবির সার্থক উত্তরাধিকারী কবি সুকান্তও এখন বিশ্বপথিক। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে শুধু শূন্যতা বা বিলাপের সুর নয়, তাঁর জীবন শেষের যন্ত্রণাও কিশোর কবির মধ্যে সঞ্চারিত দেখা যায়।

এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায় ;
স্বার্থের প্রাচীর তলে মানুষের সমাধি রচনা
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয় ;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময় ॥

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র তখনও কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট নয় তাই পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতই তার চোখে ধরা পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু বেদনাই অনুভব করেছেন, কখনও অতীত দিনে পলায়নের কথাও ভেবেছেন :

বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণ ধারণের শক্তি,
তাই তো নিষ্ঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরাণো দিন,
আমাদের ভালো পুরাণো, চাই না বৃথা নবীন (তরঙ্গ ভঙ্গ)

কিন্তু যে কবির চেতনায় চরৈবেতির সুর লেগেছে, তার কাছে প্রকৃত চালচিত্র কতদিন আর অস্পষ্ট থাকে। কবি অচিরেই, বলা চলে ১৯৪২ সালের মধ্যেই সমাজধারার বিশ্লেষণে, উপলব্ধি করলেন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যুদ্ধ ও শোষণ অন্যায়ভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মানুষের চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। এ যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ, পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার এই অন্যায় যুদ্ধ এসেছে। সমাধান পিছনের দিকে পলায়নে নয় বর্তমানের গর্ভে নতুনের সম্ভাবনায়। কবির তাই বিশ্বাসের ভূমিও পাল্টিয়ে যায় :

পৃথিবী বিকৃত-রাত্রে অভিশপ্ত প্রসব ব্যথায়
রুদ্ধশ্বাসে পানরত মেদসিক্ত সুরা।
আবার নতুন সৃষ্টি জন্ম নেবে সভ্যতার
অন্তিম ঔরসে—
নিত্য স্রোতে তাই শুধু কৃষ্ণ পক্ষে
পাণ্ডুর পাণ্ডব ;
রক্তস্রাবে আরক্তিম অস্তগামী দিন।

এদিকে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ভারতবর্ষের আকাশ ছুঁয়েছে। সে এক নতুন উত্তেজনা, আর দূরে থাকা যায় না, বিপদকে দোর গোড়ায় বসিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই শুধু চেতনার স্তরে পালাবদল নয়, কর্মের পথেও শরিক হতে হবে। সুকান্ত যোগ দিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে, শুধু যোগ দিলেন তাই নয় প্রবল ঝড়ো সময়ের মধ্যে বিচক্ষণ নাবিকের মতো নিশানা ঠিক রেখে এগিয়ে চললেন এবং ঘোষণা করলেন 'জাগবার দিন আজ'।

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে,
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।
... ...
তাই এসো চেয়ে দেখি পৃথ্বী—
কোনখানে ভাঙে আর কোনখানে গড়ে তার ভিত্তি
কোনখানে লাঞ্ছিতমানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব,
কোনখানে দানবের 'মরণ যজ্ঞ' চলে নিত্য,
পণ কর, দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে,
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির,
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।

আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাবো দেশ যাবে না তা শত্রুর দখলে;
তাই আজ ফেলে দিয়ে তুলি আর লেখনী;
একতাবদ্ধ হও এখনি॥ (জাগবার দিন আজ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন ও সুকান্তর কবিতা

পৃথিবীর মানচিত্রে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন ইতিহাসের এক কলংকতম অধ্যায়। আজ তা দুঃস্মৃতি হয়ে আছে। আর সেই স্মৃতিভার এখনও মানুষকে মাঝে মাঝে চমকিত করে, আতঙ্কিত করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদের প্রভূত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের উদারনৈতিকতার অপস্রয়মানতা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অপহ্নব ঘটিয়ে এক দস্যু শক্তির জন্ম দিয়েছিল। এই শক্তির রক্ত লোলুপতা, শোষণ-তৃষ্ণা ও বিশ্বজয়-লিপ্সা যে বিরাট ব্যাপক ধ্বংস লীলা সংঘটিত করেছিল তিরিশ ও চল্লিশের দশকে লক্ষ লক্ষ অমূল্য প্রাণ তাতে বলি হয়েছে, বহু সবুজ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু সম্পদ তা পদদলিত হয়েছে। এই ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ফ্যাসিবাদ ও সমাজ বিপ্লব' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন: "এখন হচ্ছে পুঁজিবাদের চরম অবক্ষয় এবং শ্রেণীসংগ্রামের চরম তীব্রতার সময়। এমন কি, গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে ক্যারিকেচার পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এখনো পর্যন্ত বিপজ্জনকভাবে টিকে আছে, অধিকতর খোলাখুলি ভাবে একনায়কতান্ত্রিক এবং নিপীড়ন মূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে ক্রমাগত তারই সংযোজন ও পরিবর্তন চলেছে (যথা, প্রশাসনের হাতে ক্ষমতাবৃদ্ধি পার্লামেন্টের ক্ষমতার সংকোচন, পুলিশী দমন ও সন্ত্রাসেরপ্রসার, বাক্ স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, ধর্মঘটের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করা, গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘটকে সন্ত্রাসের পথে দমন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রোড়পতি কাগজের সামাজিক ভাবে চটকদার জনপ্রিয়তার ধোঁকাবাজি, সন্ত্রাসের পথে নির্বাচন ইত্যাদি।) সমস্ত দেশেই পুঁজিবাদের গতি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।"

মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের বিকারগ্রস্ত চেহারা ফ্যাসিজম্, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটেই লালিত পালিত হয়। ইঙ্গ-ফরাসী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদই শক্তি জুগিয়েছে ইতালীকে, জাপানকে, ইউরোপে জার্মানীকে। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল ফ্যাসিস্টরা প্রথমেই আক্রমণ করে ধ্বংস করবে দুনিয়ার পুঁজিবাদের শত্রু সোভিয়েত দেশকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এই অঙ্কের হিসেব মেলে নি—দুধকলা দিয়ে পোষা জাত সাপ তাদেরই উপর আক্রমণ হানতে শুরু করে

দিল। ফ্যাসিজমের প্রবল পরাক্রমে ফ্রান্স আনত, সমস্ত ইউরোপ নতজানু। ইঙ্গ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও প্রমাদ গুণতে থাকে। এই পরিস্থিতির এমনই পরিহাস যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়কে তাদেরই শ্রেণী শত্রু সোভিয়েত দেশের সঙ্গে মিত্রগোষ্ঠী গঠন করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হতে হয়। ইতিমধ্যে ফ্যাসিবিরোধী গণশক্তি সমগ্র দুনিয়ার প্রতন্তে দুর্বার-ভাবে মুখর হয়ে ওঠে প্রতিরোধের প্রত্যয় দীপ্ত অঙ্গীকারে। ফলে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করে নবীন দুনিয়া গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হল।

ভারতবর্ষের জনশক্তির মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠতে থাকলেও এক মিশ্র প্রতিক্রিয়াই প্রধান ছিল। জাপান যখন যুদ্ধে জার্মানের সঙ্গে অক্ষ শক্তি রচনা করে চীনা রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধকে এশিয়া ভূমির বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দিল তখন ভারতবাসীর নির্বিকার অংশের মোহভঙ্গ হয়ে গেল। সাম্যবাদী সোভিয়েত এবং জাগ্রত চীনই দেখা দিল সমস্ত দেশের জনগণের পুরোধা রূপে। জনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

দরিদ্র মানুষদের অবদমিত রাখা, শিল্প সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে রসাতলে পাঠিয়ে বিজ্ঞানকে শুধু মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে ব্যবহার করা, মানুষকে নির্বিচারে যুদ্ধের রসদে পরিণত করা এই হল ফ্যাসিস্টদের কাজ। সাম্যবাদের তারা চিরশত্রু, এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের যেখানেই তারা পোঁছেছে সেখানেই মানুষের হাতে পায়ে কঠিন শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে। হিটলার প্রায় সমগ্র ইউরোপকে পদানত করেছিল, আফ্রিকার প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ইসলামের তথাকথিত রক্ষক মুসোলিনী মুসলমান রাষ্ট্র আলবেনিয়া আক্রমণ করে; 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য'-এই জিগির তুলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লোলুপ রসনা বিস্তার করেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোরিয়া, ফর্মোজা, মাঞ্চুরিয়াতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে ভারতবর্ষের দিকে থাবা বাড়িয়েছিল। কিন্তু এই দস্যুশক্তি ভয়ানক হলেও অপ্রতিরোধ্য নয়, এর জন্য প্রয়োজন সচেতন মানসিকতা ও জনগণের অভ্যুত্থান। রজনী পাম দত্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই আহ্বানই জানালেন: "ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধ করে তাকে পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যদি কোন মোহ না থাকে এবং এ-বিষয়ে যদি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকে, তাহলেই তাকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তির মূল বর্তমান সমাজের গভীরে প্রোথিত। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদকে জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদের জন্ম। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি সৃষ্টি করা যায় এবং ফ্যাসিবাদের কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়। "(ফ্যাসিবাদ ও সমাজ বিপ্লব-ভূমিকা)

এই ঘৃণিত নৃশংস ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল। তিরিশের দশকে সেই সংগ্রাম তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করে। প্রায় সর্বস্তরের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রতিরোধের সংকল্প। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বললেন, "আমার মতে হিটলার একেবারেই অসহনীয়। নাৎসি দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভয়ঙ্কর। আমি দেখলাম, নাৎসিরা যদি পৃথিবী জয় করে বসে কারণ পারলে সেইটাই তাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে জীবন-ধারণই নারকীয় হয়ে উঠবে। আমার মনে হল, এ আমাদের বন্ধ করতেই হবে, করতেই হবে।" বিশ্বখ্যাত শিল্পী চার্লস চ্যাপলিন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবী জানিয়ে ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে এক ভাষণে বললেন: রাশিয়ার রণাঙ্গনে নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রের জীবনমরণ। মিত্রশক্তির ভাগ্য এখন কমিউনিস্টদের হাতে। রাশিয়া যদি পরাভূত হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ মহাদেশ এশিয়া চলে যাবে নাৎসিদের অধীনে। প্রায় পুরো প্রাচ্যদেশ জাপানীদের করতলগত হওয়ায় নাৎসিরা পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ রণসামগ্রী একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। এরপর হিটলারকে হারাবার আর কি সুযোগ থাকবে আমাদের? ··হিটলার অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। তার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল রাশিয়া আক্রমণ। এই গ্রীষ্মে যদি সে ককেশাসে ঢুকতে না পারে, তাহলে তার ভাগ্যে কি আছে ভগবানই জানেন। যদি তাকে আরেকটা শীত মস্কোর আশে পাশে কাটাতে হয় তাহলেও তার ভাগ্য একান্তই ভগবানের হাতে। তার ঝুঁকি অত্যন্ত বিপজ্জনক কিন্তু সে তা নিয়েছে। যদি হিটলার ঝুঁকি নিতে পারে, আমরা পারব না কেন? আমাদের দায়িত্ব দিন। বার্লিনের ওপর ফেলবার জন্য আরও বোমা দিন। আমাদের পরিবহন সমস্যাকে সাহায্য করার জন্য গ্লেন মার্টিন সামুদ্রিক বিমান দিন। সর্বোপরি আমাদের এক্ষুণি একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন দিন!

"বসন্তে জয়লাভ যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কারখানায় যাঁরা আছেন, যাঁরা সৈনিকের পোশাকে আছেন, যাঁরা বিশ্বের নাগরিক, আসুন আমরা সকলে সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজ করি ও যুদ্ধ করি। সরকারি ওয়াশিংটন এবং সরকারি লণ্ডন, আসুন এটাই আমাদের লক্ষ্য হোক—আগামী বসন্তেই জয়। যদি এই লক্ষ্যে আমরা স্থির থাকি, এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করি, এই লক্ষ্যের জন্য বাঁচি তাহলে তা এমন একটা মনোভাব গড়ে তুলবে যা আমাদের

শক্তি বাড়াবে এবং আমাদের কর্মক্ষমতা ত্বরান্বিত করবে। আসুন আমরা অসম্ভবের জন্যই চেষ্টা করি। মনে রাখবেন ইতিহাসের মহৎ কৃতিত্বগুলো সবই হল যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাকে সম্ভব করা।"

বিশ্ব মনীষীদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁর ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। বহির্জগতের লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানান এবং অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। তাই তিনি জগতবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ফ্যাসিবাদ ইউরোপের সর্বত্র ঘাঁটি তৈরী করছে কোথাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কোথাও ঘাসের মধ্যে আত্মগোপনকারী বিষাক্ত সাপের মত। মানব সভ্যতার এই চরম শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে কেননা তারাই পারবে মোকাবিলা করতে। নিজের সংকল্প স্পষ্ট ঘোষণা করে তিনি বললেন: "আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি এই হল আমার প্রসারিত হাত। যদি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া হয় তাহলে শত্রু যে শক্তিই হোক, আমি সোভিয়েতের পক্ষে। ইউরোপের উদ্দেশ্যে বলি তোমরা যদি এই দানবীয় সংঘর্ষ শুরু কর তাহলে আমি ভারত, ইন্দোচীন, চীন এবং সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত জাতির ভাইদের পক্ষ অবলম্বন করে তোমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব।"

রোঁম্যা রোঁল্যার শিক্ষা ও আহ্বান সমগ্র ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের সচকিত করেছিল, বিবেককে উদ্রিক্ত করেছিল। ফরাসী দেশ তো বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম পীঠস্থান হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন নাৎসী জার্মানী তার বুকের উপর চেপে বসে ছিল। ভিশিতে বসে আঁদ্রে জিদ, আমেরিকায় বসবাস-কারী ক্যাথলিক বুদ্ধিজীবী মারিতাঁ, এবং বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জিরোদু জার্মানীর বুকের মধ্যে বসে স্বদেশের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করেন। তাই নাৎসীরা জিরোদুকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল! শিল্পী পিকাসো সমস্ত লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে 'গ্যেরনিকা'র মত শত্রুর মর্মভেদী ছবি আঁকলেন। ধীরে ধীরে ফ্রান্সে এক সর্বদলীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম গড়ে ওঠে। সে সংগ্রাম কখনও মৌনভাবে কখনও সোচ্চারভাবে। এই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক অভিযানে ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, বিখ্যাত ডুয়ামেলের সঙ্গে মার্কসবাদী আরাগঁ, এলুয়ার, ভেরকর প্রমুখ একই মঞ্চে সামিল হন। স্যাঁ-পল রু, ম্যাক্স জ্যাকব ও দেকুরকে জার্মানীরা হত্যা করে স্বাধীন চিন্তার মতবাদ প্রচারের অপরাধে। আইনস্টাইনের পদার্থবিদ্যা, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব, সমোমনের গান নিষিদ্ধ হয়। মেরেডিথ, টমাস হার্ডি, ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড, ভার্জিনিয়া

উলফ্, হেনরি জেমস্, ফকনার সকলের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়। 'কারিয়ের দ্যু সিলাঁস' বা 'মৌনায়ন' গ্রন্থমালা নামে একটি সিরিজ প্রকাশ হতে থাকে, যেগুলি মূলত কারাগারের অন্তরালে থেকে লেখকরা লিখে গোপন পথে বাইরে প্রচার করেন। এই গ্রন্থমালার অন্যতম গল্প, ভেরকর রচিত 'সমুদ্রের মৌন' কবি বিষ্ণু দে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন বাংলা ভাষায়। এই বইয়ের মূল সংস্করণের ভূমিকায় মোরিস দ্রুওঁ লিখেছেন কি করে জেল এড়িয়ে, পুলিশের তোয়াক্কা না রেখে, সৈন্যদলের মুখে তুড়ি দিয়ে, সীমান্ত প্রহরীকে নাজেহাল করে এই সব মৌনব্রতের পুঁথি আসত। যে কাগজ যোগাত, যে ছাপত, যে লিখত—সবাই জানত মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে উঁকি দিতে পারে, তবু বইয়ের পর বই বেরিয়েছে। স্বনামে ও বেনামে বিখ্যাত ও সাহিত্য জগতে সদ্য আগত সব লেখক লিখতেন। ফরে নাম নিয়েছিলেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, দেবুব্রিদেলের নাম হয়েছিল আর্গন। আরাগঁর স্ত্রী মায়াকভস্কির আত্মীয়া এলসা ত্রিয়োলেৎ প্রতিরোধের বিষয়ে সহৃদয় এক উপন্যাস লেখেন লোরাঁ দানিয়েল নামে।

সমগ্র ফরাসীদেশেই এই আন্দোলন দুর্বারভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 'পোয়েসি-৪০' নামের সংকলনে এলুয়ার ও আরাগঁর সঙ্গে শহীদ কবি গীমক সহ অনেকের কবিতা তখন পাঠকমহলে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। গোপন সংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যান দ্যুদাক। এরপর শুরু হয়ে যায় আইন উপেক্ষা করে সাহিত্যের প্রচার। টাইপ করে করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, হাতে হাতে মানুষের কাছে পৌঁছে যায় আরাগঁ, এলুয়ার, কামু প্রমুখের লেখা। গড়ে ওঠে লেখকদের সংগঠন। এই সময়কার আরেকজন প্রথম সারির সৈনিক আঁদ্রে মালরো। তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সংকটাবস্থা শুধু প্রতিফলিত হয়েছে তাই নয়, সেই দর্পণে মানুষ ইতি কর্তব্যের সন্ধানও পেয়েছেন। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যেও নিহত হলেন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লুমানিতে'র বৈদেশিক দপ্তরের সম্পাদক ও সংসদ সদস্য গেব্রিয়েল পেরি। ১৯৪২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ভোরবেলা ফ্যাসিস্টরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যুর কয়েকমিনিট আগে লেখা একটি ছোট্ট চিঠিতে পেরি লেখেন: "আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের প্রতি আমি শেষ পর্যন্ত অনুগত থেকেছি। আমার দেশবাসীকে বোলো যে আমি প্রাণ দিচ্ছি যাতে ফ্রান্স বাঁচতে পারে। শেষবারের মতো আমি আমার বিবেককে পরীক্ষা করলাম। আমার কোন খেদ নেই। আমি সবাইকে শুধু একটিই কথা বলে যেতে চাই: যদি জীবনটা এখন আবার ফিরে

পাই তো এতদিন যে পথে চলেছি, আবার সে পথ দিয়েই চলব। আজকের এই রাতে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করছি যে আমার প্রিয় বন্ধু পল ভাইলাঁ কুতুরিয়ের ঠিকই বলতেন--কমিউনিজম হচ্ছে পৃথিবীর যৌবন এবং তা পথ তৈরী করে যায় যাতে করে আগামী দিনগুলি সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠতে পারে। মৃত্যুর মুখোমুখি আমি যে এতটা সাহস ও স্থৈর্য দেখাতে পারছি, সন্দেহ নেই তার অন্যতম কারণ আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন মার্সেল কাঁশা। বিদায়। ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক।"

শুধু গেব্রিয়েল পেরি নয় আরও অসংখ্য বরণীয় মানুষের জীবন দীপ নির্বাপিত হয় ফ্যাসিস্টদের হাতে। সেদিন বিশ্বের বিবেক যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত সেই রোঁম্যা-রোঁল্যার মৃত্যুও হয় নিপীড়নে। এরা হত্যা করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশ্চিকে। গ্রামশ্চির প্রসঙ্গে রোলাঁ লেখেন "গ্রামশ্চির কাছে দর্শন ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনিও ডুচের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। কিন্তু তিনি পতিত হইলেন যুদ্ধ করিতে করিতে। ১৯২৬ সালে নভেম্বরের প্রথম দিকে রোমে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যদিও তিনি একজন ডেপুটি ছিলেন তথাপি তাঁহাকে উস্তিকা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কয়েকমাস পরে ঐ দ্বীপেই আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যের সহিত স্পেশাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে অবৈধভাবে তাঁহার বিচার হয়।... তিনি নেতা ছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে বিশ বৎসরের কারাদণ্ড দিয়া সম্মানিত করে। যে লোক মেরুদণ্ডের যক্ষা, ফুসফুসের ক্ষত, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাঁহার পক্ষে এ দণ্ডাজ্ঞার অর্থই মৃত্যু। ...শর্তাধীনে মুক্তির প্রস্তাব তাঁহার নিকট করা হইয়াছিল। শর্ত ছিল ক্ষমা প্রার্থনা ও মতবাদ প্রত্যাহার। ইহাকে আত্মহত্যা করার সামিল বলিয়া এ শর্ত তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার জন্য তাঁহার পক্ষ লইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিব না। যিনি আজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহার তো মার্জনা চাহিবার কিছু নাই। তাই তিনি মরিতে চলিয়াছেন। মরিয়া তিনি হইবেন ইতালীয় সাম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তাঁহার ছায়ামূর্তি তাঁহার রাখিয়া যাওয়া প্রদীপ্ত দীপশিখা ইতালির কমিউনিজমকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পরিচালিত করিবে।" (শিল্পীর নবজন্ম)। নাৎসী জার্মানীর কুখ্যাত বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট হত্যা করে কবর দেওয়া হয় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষতম

নেতা আর্নেস্ট থেলম্যানকে। থেলম্যানের মুক্তির জন্ম যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হয় তার নেতা ম্যাক্সিম গোর্কী ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, "এমন সময় আসবে সমগ্র মানবাত্মার শিখা একই সঙ্গে প্রদীপ্ত হযে ফ্যাসিজমের দূষিত ক্ষতকে পুড়িয়ে দেবে। থেলম্যান ও তাঁর কমরেডরা ফ্যাসিবাদের যে কবর খুঁড়েছেন, তা থেকে তাকে উদ্ধার করার সাধ্য কারো নেই।" ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় জুলিয়াস ফুচিককে ফাঁসী দিয়ে। বন্দীশিবিরে জনৈক কারারক্ষীর সহায়তায় শেষদিনগুলির যে দিনপঞ্জী তিনি রচনা করেছিলেন তা কারাগারের বাইরে পাচার হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' নামে প্রকাশিত হয় স্ত্রী অগাস্তিনা ফুচিকের প্রচেষ্টায়। মর্মন্তুদ সে বিবরণ, কিন্তু অসীম দৃঢ় মনোবলের সাক্ষ্য বহন করে আছে সেই সব কাহিনী।

এইভাবে তিরিশ থেকে চল্লিশের দশকে বিশ্বের সর্বত্র লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদের করাল গ্রাস থেকে নিজ নিজ দেশ রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করার কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। ভারতবর্ষের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম থেকে স্বভাবতই দূরে সরে থাকেন নি। এই প্রাচ্য মহাদেশে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ নোগুচির কাছে লিখিত পত্রে চীনের পক্ষ সমর্থন করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে হুশিয়ার বাণী ঘোষণা করেছিলেন তা তৎকালে বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি উন্মোচিত করতে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিনি বুঝিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী উদ্ভূত দানবিক শক্তির প্রতিরোধ না করতে পারলে মানবতার মুক্তি নেই। ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রোমাঁ্যা রোলাঁর আহ্বানে ব্রাসেলসে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের স্বাক্ষরে একটি শান্তির সপক্ষে ইস্তাহার প্রেরিত হয়। এই ইস্তাহারে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির উপর যে সাম্রাজ্যবাদী দলন চলছিল তার বিবরণ যেমন আছে তেমনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষতা অবলম্বনের অঙ্গীকারও ঘোষিত হয়েছে। ইস্তাহারে বলা হয়েছে :

"দেশে ও বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা উহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য

কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।

"ভারতে নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপে সাঙ্ঘাতিকভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করা হইতেছে। প্রায়শই যেভাবে পুস্তকাদি, বিশেষত সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে, তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত কলঙ্ককর। নামজাদা বাণিজ্য শুল্ক আইনের (Sea Customs Act) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে সিডনী ও ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের সে খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহাদের লেখা 'সোভিয়েট কমিউনিজম' নামক পুস্তক পর্যন্ত ঐ আইনে ভারতে আমদানি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী মনোভাব ছাড়া ইহার আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি লো'র 'রাশিয়ান স্কেচ বুক' বাজেয়াপ্ত হয়, ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে সেন্সর নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বাজেয়াপ্ত বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদেশে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ করিলেই বোঝা যাইবে এদেশে সরকারী কার্যপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশের স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই।

"সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪৮ খানি সংবাদ পত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের পক্ষে উপলব্ধি কবিরার সময় আসিয়াছে।

"সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালি যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি

বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জাবৃদ্ধি, সংকটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্বস্থচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীব পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই ; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানেব আমরা ঘোর বিরোধী ; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিযনই হউক বা নাৎসী জার্মানীই হউক-যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব এবং আমাদেব মহৎ উত্তরাধিকাব রক্ষাব জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।"—১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩।

এই ইস্তাহাবে স্বাক্ষবকাবীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বায, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, মুন্সী প্রেমচাঁদ, নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহবলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। লক্ষ্য কবাব বিষয ভাবতবর্ষের এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবা তখনও যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিযেত ইউনিয়নেব দৃষ্টিভঙ্গি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু অচিরেই মার্কসবাদী, অমার্কসবাদী সমস্ত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সর্বাত্মক যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নেব উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের ভবসাস্থল এই একটি মাত্র দেশ। হিটলারেব সোভিয়েত আক্রমণের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত নিবপেক্ষতার পর্দাটি সরে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত ফ্যাসিবাদী স্বরূপটি নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ভূমি আক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক জনসভা থেকে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' গঠিত হয়। সভাপতি ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক-স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হন। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে গোপাল হালদার ও সুকুমাব মিত্রের সম্পাদনায় 'সোভিয়েট দেশ' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্ভবত: ভারতীয় ভাষায় এটাই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দিক নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত

আচার্যের সম্পাদনায় 'The Land of the Soviets নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে 'Revolution, Civil War, Intervention' শিরোনামে শ্রী জ্যোতি বসুর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

১৯৪১ সালের ২০শে জুলাই আরেকটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়:

"সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে, ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকট কালে আমরা মনে করি, নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েত শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি; কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে কুৎসিৎ উত্তরাধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল তাহা স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েতের বর্তমান কীর্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উহার উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক জগতের দুই জন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ —সিডনি ও বিটরিস ওয়েব—তাঁহাদের "সোভিয়েত কম্যুনিজম-এক নূতন সভ্যতা" নামক পুস্তক প্রকাশ করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য তথ্য সকলের গোচরে আসিয়াছে।...

"কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন; তথাপি সোভিয়েতে অন্ততঃ আমাদের শুভ কামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দিন তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতি বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বিষ্ণু দে,

নীরেন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, এস. কে. আচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মৃণালকান্তি বসু, কালিদাস নাগ, হুমায়ুন কবীর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। .

পাক্ষিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (১লা এপ্রিল ১৯৪২) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ" নামে একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধে ভারতবাসীর ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করে লেখেন :

"......জাপ-সাম্রাজ্যবাদের অতর্কিত আক্রমণ ও অগ্রগতি আজ ভারতকে যে দাসত্বের মধ্যে টানিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র পথ সোভিয়েত রাশিয়ার অবলম্বিত পথ। সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ গ্রহণ করিয়াই চীন আজও স্বাধীনতার সংগ্রাম ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া আছে। এই আদর্শের প্রভাবেই ব্রিটেনের সাম্রাজ্যনীতির ব্যবস্থার অচলায়তনে নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে।......সোভিয়েত প্রদর্শিত জনযুদ্ধের নিয়ম-প্রণালী তথ্য ও সাধনা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের গ্রহণ করিতেই হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংশয় নাই।

"অথচ অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কেবল যে আমাদের রক্ষণশীল শাসকেরা ইহা বুঝিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা নহে, সাম্যবাদের প্রতি বৃথা আক্রোশ বশত একদল লোক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সর্বদলীয় সংঘ গঠনের বিরোধীতা করিতেছেন। ইহারা একপ্রকার অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের আবরণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াই বাহবা কুড়াইতে ব্যস্ত। আজ যদি সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসী বর্বরতার অভিযানের গতিরোধ না করিত এবং পূর্ব এশিয়ার শীর্ষে সোভিয়েত চতুরঙ্গবাহিনী প্রস্তুত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে বার্লিন-টোকিওর মিলিত অভিযান তাঁহাদিগকে বাহবা কুড়াইবার অবসর দিত না। সোভিয়েত রাশিয়ার জনযুদ্ধের কৌশল আজ ভারতের স্বাধীনতাকামীদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এই কারণেই জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান গান্ধিজীর অহিংসার পাশ মুক্ত হইয়া দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন। প্রবলের আক্রমণ হইতে জাতীয় স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে যে মূল্য দিতে হয় ভারতকেও তাহাই দিতে হইবে। ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধ, এই বাস্তব সত্যের সহিত আমরা আজ মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি। ব্রিটেনও এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। এই সন্ধিক্ষণে দলাদলি ভুলিয়া প্রগতিশীল স্বাধীনতা-

কামী জাগ্রত নরনারীদের কর্তব্য ফ্যাসিস্ট বিরোধী সঙ্ঘে যোগদান করা। আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি এই ভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে বন্দীবীরেরাও স্বদেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। সোভিয়েতের রক্তপতাকা নিপীড়িত মানবের মুক্তি পতাকারূপে এখনও সগর্বে উড্ডীন থাকিয়া অবিশ্বাসী ও অন্ধ বিশ্ববাসীর সংশয় মোচন করিতেছে। ভারতের জাতীয় পতাকাও ঐ রক্ত পতাকার গৌরব মর্যাদা অর্জন করিবে, যদি আজ আমরা সম্মিলিত হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধারণ করি এবং ঘোষণা করি যে সোভিয়েত যুদ্ধ ও আমাদের সংগ্রামের মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই।"

১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' গঠিত হয়। ঐ বছরের ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই সংগঠন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৎকালে এক ব্যাপক জোয়ার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ, সাহিত্য সভা, গণসঙ্গীতের আসর প্রভৃতি কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে সংঘের কাজকর্ম দ্রুত জনমনে উৎসাহের সঞ্চার করে। গণসঙ্গীত বিশেষ করে এই সময় এক নতুন অবদান রূপে দেখা দেয়। ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের আমল থেকে প্রধানতঃ বিনয় রায়ের উদ্যোগ ও সৃষ্টিতে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এর প্রচলন হতে থাকে। কিন্তু এই সময় কিষাণ শ্রমিকের আন্দোলনের ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে এই প্রয়াস আরও জীবন্ত ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। ডোমার কিষাণ সম্মেলনে বিনয় রায়ের উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলাদের গান 'হই হই হই' বিপুল আবেদন সৃষ্টি করে। মৈমনসিং-এর হাজং সহ বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেও জন-যুদ্ধের গান ব্যাপক উদ্দীপনা গড়ে তোলে। 'জনযুদ্ধের গান' এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংকলনে তিনটি বিভাগ ছিল—বাংলা, হিন্দী ও ইন্টারন্যাশনাল বিভাগ। ১৯৪৩এ প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বিনয় রায় লেখেন :

"...বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রগতি আনবার চেষ্টা চলছিল গত এক যুগ ধরে। কিন্তু সেই আন্দোলনের সঙ্গে গণজীবনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না ; ফলে প্রচেষ্টা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। আজকের এই গানের আন্দোলন সংস্কৃতিকে সেই ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে এবং অনেকাংশে সমর্থ হয়েছে।

"মানতেই হবে, ভাষা ও সুরের ক্ষেত্রে এ গানগুলোর অধিকাংশই ওস্তাদের আসরে স্থান পাবে না ; কিন্তু সংস্কৃতিতে প্রগতি অর্থে যদি জনসাধারণের

সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি বোঝায় তবে জনযুদ্ধের গান নিঃসন্দেহে সে কাজে অনেক সাহায্য করেছে ও করছে। আজ প্রত্যেকটি দরদী সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকারের কাজ এই গানের আন্দোলনকে নতুন ভাবের গান দিয়ে সমৃদ্ধ ও মার্জিত করা।

"বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার স্বদেশী গান, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান, সন্ত্রাসবাদের খুনের গান, মুকুন্দদাসের যাত্রাগান আমাদের দেশের হাজার হাজার লোককে একদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ দেশের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে যখন ধন, মান, ইজ্জৎ, জীবন, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই আসন্ন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন জনযুদ্ধের গানকেও সেই কাজ আরও শতগুণে বাড়িয়ে দেশের প্রত্যেকটি লোককে স্বাদেশিকতা, দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

"কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' আমলের স্বাদেশিকতার পুনরুজ্জীবন নয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজমকে রুখবার দুর্জয় সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মজুর কিষাণের জীবন ও সংগ্রামের কথা। ফলে আরও সমৃদ্ধ ও সুসঙ্গত হয়ে উঠেছে সেদিনকার স্বাদেশিকতা। তাই এই গানের সহজ ও ধারালো কথার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।"

শুধু গীতি সংকলনই নয় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস-এর সম্পাদনায় 'একসূত্রে' নামে একটি ফ্যাসিবিরোধী কাব্য সংকলনও প্রকাশিত হয়। তাতে মোট পঞ্চান্ন জন নবীন ও প্রবীন কবির কবিতা স্থান পেয়েছিল। সংকলনের অন্যতম ভূমিকায় কবি গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন :

"দেশের মানস-প্রতিনিধিদের মনে বহুপূর্বেই ফ্যাসিস্তবাদের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকট হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য যুদ্ধ-অভিজ্ঞ এবং ভীত ইয়োরোপের সাহিত্যিকদের পক্ষে ফ্যাসিস্তবাদকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার, খড়্গাটা চব্বিশ ঘণ্টা তাদের মাথার উপর ঝুলছে কিনা। আমাদের টনক নড়ল জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর। পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগ আজ আন্তরিক। এর ফলে কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে।...

"বিদেশী আক্রমণ, বোমাবর্ষণ এবং ফ্যাসিস্ত শাসনের ভয় একটা জিনিস স্পষ্ট করেছে, নিষ্ক্রিয় এবং পক্ষপাত শূন্য থাকাই নিরাপদ নয়। 'আমি কোনো

রাজনীতি-সমাজনীতির ধার ধারিনে, আমি লোকটা নিরীহ গোবেচারা ভাল মানুষ' বলে ঘরে বসে থাকার নিশ্চিন্ত দিন শেষ। ভাল মানুষ বলে বোমা তো কাউকে খাতির করে না! ফলে ফ্যাসিস্ত ভীতির অনিবার্যতা কতকগুলো পাঠক এবং লেখকের মনকে অন্তত নিষ্ক্রিয়তা এবং পক্ষপাত শূন্যতা থেকে সাময়িকভাবেও মুক্তি দিয়েছে। তাঁদের মনের ভাব: জীবন যখন এতই অনিশ্চিত তখন বাঁচতে হয় তো মানুষের মত বাঁচা উচিত। মৃত্যু যদি এতই অনিবার্য তাহলে একটা আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কে জানে হয় তো সেই মৃত্যুর মধ্যেই জীবন প্রচ্ছন্ন আছে। এমনি করেই চরম বিপদের দিনে নির্জীব জাতির বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে আসে। সাম্প্রতিক কাব্যে এই সুস্থ জীবন ভঙ্গিমার লক্ষণ সুস্পষ্ট।"

সুকান্ত এই ফ্যাসিবিরোধী মুক্তি যুদ্ধের কমিউনিস্ট কবি। ইউরোপের ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীরা প্রত্যক্ষ ভাবে সৈনিকের পোষাক পরে অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এদেশের লেখক শিল্পীদের সে সুযোগ না থাকলেও তাঁরা আন্তর্জাতিকতার সূত্রে মানুষকে সজাগ করে তুলেছিলেন এবং শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথার্থ বামপন্থী প্রগতিশীল গণসাহিত্য সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত তিরিশের দশক থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, আগ্রাসন ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা যে সংগ্রামের গৌরবময় গতিধারা রচনা করেছিলেন সেই ক্ষেত্র ভূমিতেই কবি সুকান্তর শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ।

এই পট ভূমিতেই ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক অভিঘাতে ব্যক্তিগত বিষণ্ন-মনস্কতা বিলীয়মান হয়ে এক নবীন প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে কবি সুকান্তর মন ও মনন। আত্মসচেতন কবি তাঁর সেই মনের চিত্রমালা অকুণ্ঠভাবে প্রতিফলিত করেছেন '১৯৪১ সাল' কবিতায়। নিঃশব্দ দিনের ভীরু অন্তঃশীল মত্ততাময় পদক্ষেপের ম্লান আধিপত্য কবির জীবন থেকে অপতস্থ হয়ে যেতে থাকল। বিপন্ন সভ্যতার আহ্বান পৌঁছেছে কবির মনে। কবি এখন বিশ্ব-পথিক-তাঁর একক পৃথিবী জনতার জোয়ারে ভেসে গেছে।

তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে
ডাক এল—
সভ্যতার ডাক।
নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত পরোয়ানা

আমাকে চিহ্নিত করে গেল।
আমার একক পৃথিবী
ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে। (১৯৪১ সাল)

শুধু যে বিচ্ছিন্নতা বোধ দূর হয়ে জীবনেব কলহাসে প্রতিটি মুহূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে তাই নয়, এক রক্ত করবীব সন্ধান পেয়েছেন কবি, যা এতকাল তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল।

যে সব মুহূর্ত-পরমাণু
গেঁথেছিল অস্থায়ী রচনা,
সে সব মুহূর্তে আজ
প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায়
অজ্ঞাত রক্তিম ফুল ফোটে॥

'মুহূর্ত'-পবমাণু', 'প্রাণেব অস্পষ্ট প্রশাখাব' ইত্যাদি ব্যবহাব গুলি অসামান্য কাব্যিক এবং গভীব ব্যঞ্জনাময়। ইতিপূর্বে মুহূর্ত-পবমাণুগুলি তাঁর জীবনে বহু অস্থায়ী ভাব রচনা করেছিল কিন্তু আজ তা স্থাযী সঞ্চারীভাব সৃষ্টি কবতে চলেছে, যেখানে রক্তিম ফুল ফুটতে শুরু কবেছে। এই রক্তিম ফুলই কবির পরবর্তী জীবনে ধ্রুবপদ বচনা করেছে। রক্তিম ফুলটি প্রথম যে দেশে ফুটেছিল সেই সোভিয়েত ভূমি আজ আক্রান্ত ফ্যাসিবাদী দানবীয় শক্তির দ্বারা। ফ্যাসিবাদ যে শুধু রক্ত করবীর সেই উদ্যানটি বিধ্বস্ত করতে চেযেছে তাই নয় পৃথিবীর বুকে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মন থেকে সেই রক্তিম স্বপ্নকে মুছে দিতে চায়, নিঙড়ে নিতে চায় সভ্যতার প্রাণরসকে।

তাই সমকালের বহু সহযোদ্ধার মত কনিষ্ঠ কবি সুকান্তব কণ্ঠেও জনযুদ্ধের গান, জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান :

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ
জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলেছে ভারত আর বীর মহাচীন।
সাম্যবাদীরা আজ মহাক্রুদ্ধ
শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ॥

স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে জটিলতা তখন বেশ গভীর হয়েছে। ১৯৪২ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে আগত ক্রিপস মিশন ভারতবাসীকে কিছুই দিল না। কার্যত তারা কোন নতুন কথা না বলে চল্লিশ

সালের 'আগস্ট প্রস্তাবে'রই পুনরাবৃত্তি করল। যথেষ্ট ক্ষমতাসহ যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকারের দাবী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে গেল। জাতীয় সরকার গঠনে ব্রিটিশের আপত্তিতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে ক্রিপস মিশনের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে তারা ভারতীয়দের কোন সুযোগ দিতে চায় নি বরং বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর তারা প্রচার করেছে ভারতীয়েরা ঐক্যবদ্ধ নয় এবং দলাদলিতে বিভক্ত ভারতীয় নেতারা রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব গ্রহণে অনুপযুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় এসে এক জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেন. কংগ্রেস সংগঠনের কাছে। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেসে নাকচ হয়ে যায়। এই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব আবার গান্ধীজীর অধীনস্থ হয়ে। গান্ধীর সুপারিশ ক্রমে জাপানী আক্রমণের মুখোমুখি হয়েও কংগ্রেস দল নন-কোঅপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক চরম হতাশা থেকে কংগ্রেস দল এই জাতীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করল ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিত্রশক্তি ও জাতি পুঞ্জের অন্যতম প্রধান অংশীদার ব্রিটিশকে বিব্রত না করা এবং সাধ্যমত সহযোগিতা করা। কংগ্রেসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও জওহরলাল নেহেরু প্রধানত এই নীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই নতুন সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করল তেমনি দেশের অভ্যন্তরে একদল কমিউনিজম বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী মাথা তুলে দাঁড়াল। ব্রিটিশ রাজশক্তিরও সুবিধা হল কংগ্রেস দলের উপর অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনায়।

কংগ্রেসের নন-কোঅপারেশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজের দুরভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে রজনী পাম দত্ত লিখেছেন :

"The resolution provided the pretext for which imperialist reaction had been eagerly waiting in order to launch its attack. It is clear that the whole tactics of imperialist reaction during the phase following the Cripps Mission breakdown was designed to place the Congress in a dilemma and drive it to such a false step which could give the excuse for oppressive measures. So long as the Congress stood out, with its unchallengable anti-fascist record, as the decisive political force seeking to mobilise the Indian people for the common struggle of the people of the world against fascism, while imperialism, with its dubious pro-

fascist record was revealed as the main obstacle to the mobilisation, the tactical position of imperialism was at a disadvantage. The moment the resolution was passed, the opportunity was seized by imperialism to claim that it stood for the defence of India against attempts at disrupting that defence, to slander the Indian national movement as pro-fascist, pro-Japanese and as sabotaging the war effort of the people of the United Nations, and to make this the political basis for carrying out its policy of reactionary suppression against the national movement," (India To-Day P. 567-68)

এইভাবে জাতীয়তাবাদী নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দিলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা এতই অসতর্ক ছিলেন যে সম্ভাব্য আক্রমণকে তাঁরা অনুমান করতে পারেন নি। ফলে দল ও জনগণকে সজাগ করতে বা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে নির্দেশ দিতে সক্ষম হন নি। এবং নন-কোঅপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও ভাইসরয়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন;

কংগ্রেসের যে মুষ্টিমেয় অংশ নন-কোঅপারেশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু পরিণতি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছিলেন। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৪২ সালের ২৬শে জুলাই এক খোলা চিঠিতে বলেছিলেন:

What will happen if and when you start the struggle ? They will quietly put you and thousands of active Congress workers into jails and sanctimoneously declare that it is their unfortunate duty to be able to save India from the fascist invaders,"

কিন্তু কংগ্রেস দল এই সব সতর্কীকরণে কর্ণপাত করল না। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীজী, নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অসংখ্য নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারের পরই ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট গান্ধীজী ভাইসরয়কে লেখেন:

"The Government of India should have waited at least till the time that I inaugurated mass action. I have publicly stated that I fully contemplated sending you a letter before taking any concrete action."

গান্ধীজীর এই পত্র নিশ্চয়ই একালের পাঠকের কাছে কৌতুকজনক মনে হবে। সেকালেও মধ্যবিত্তদের এক বড় অংশ গান্ধীজীর আগস্ট আন্দোলনে

সামিল হলেও ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতির অনুসরণকারীরা ভারতবর্ষের জনগণের সামনে এক বিকল্প কর্মসূচী উপস্থিত করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের এক সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠনের দাবী সোচ্চার করা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজকে এই বিকল্প কর্ম-সূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আবেদনে বিশেষ সাড়া দিলেন না। বরং উগ্রজাতীয়তাবাদী একদল নেতা ও কর্মী কমিউনিস্টদের প্রতি বিষোদ্গার ও হামলা চালিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। জাপানী বোমার আক্রমণের ভয়াবহতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজনীতির এই জটিলতাকে সহজ সরলভাবে তুলে ধরেছেন কবি সুকান্ত :

সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে।
প্রথমে তাদেব অন্ধ বীব মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতিপদে,
দেখেছি সুবিধা নেই এ কাজ করায
একক চেষ্টা কেবলই ভুল ধরায়।
এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু বক্ত পান কবে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
শাণিত দ্বৈত নগ্ন অন্যায়ে,
তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে॥

এই বছরই ডিসেম্বর মাসে (১৯-২০) কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনের শেষ দিনে কলকাতার বুকে জাপান বোমাবর্ষণ করে। এর পর ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরপর পাঁচদিন খিদিরপুর, ডালহৌসী স্কোয়ার, হাতিবাগান প্রভৃতি অঞ্চলে বোমাবর্ষিত হয়। এর বিবরণ সুকান্তর কয়েকটি পত্রে বিধৃত আছে। তারপর ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আবার ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ হয়। তৎকালীন অসামরিক প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ সাইমনস-এর হিসেব অনুসারে ফেব্রুয়ারী

১৯৪৩ পর্যন্ত জাপানী আক্রমণে ৩৪৮ জন নিহত ও ৪৫৯ জন আহত হয়েছিলেন। স্বভাবতই সারাদেশব্যাপী এক গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এই জঙ্গী আক্রমণ। প্রতিরোধ সংগ্রামও তীব্রতা লাভ করে। একেবারে অরাজনৈতিক লেখক শিল্পীরাও নিশ্চিন্ত নীরবে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজিম' নামের একটি মূল্যবান প্রবন্ধে কবি বুদ্ধদেব বসু একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেদিনের সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় :

"তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ মুখোস খসে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধহত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁচেছে। আজ একথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে বসে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে মাঝে এক-আধটা কবিতা লিখতে চাই কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাসস্থান, প্রিয়জন, আমার সমস্ত আশা ভালোবাসা সুদ্ধ আমি একেবারে লোপাট হয়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার কলম, থামিয়ে দেবে সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্মপ্রকাশের আবেগে—তাহলেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে আমার ঘরে বসে আপন কাজ করবার অধিকার, যার উপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে এবং অনেকের পক্ষেই—এ উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এ-অধিকার থেকে যুগে যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে যারা তাঁত চালায় যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশী বহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন করে আসছে। আজকের দিনে এমন এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহ শাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখবন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও

সুন্দরের উপাসক। এরই নাম ফ্যাসিজিম। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজম-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেই জন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।"

শুধু রাজনীতি সচেতন মানুষ নন, সর্বস্তরের জনগণের মধ্যেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিরোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল। তাই বুদ্ধদেব বসুর মত সমাজ-নিস্পৃহ লেখকও উপলব্ধি করেছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা করতে হবে সংগঠিত ভাবে। এই উপলব্ধি সেকালে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সমস্ত লেখক-শিল্পীর মধ্যেই উপজীত হতে দেখা গিয়েছিল। তার সাক্ষর রয়েছে অজস্র গান ও কবিতায়। বয়োকনিষ্ঠ কবি সুকান্তর গান এবং কবিতায়ও রয়েছে সেই দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। যেমন—

(১) নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী:
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা॥ (বিবৃতি)

(২) শত্রুদল গোপনে আজ, হানো আঘাত
এসেছে দিন ; পতঙ্গের রক্তপাত
আনে নি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে?
উষ্ণমন শাণিত হোক সংগীনে।

ক্ষিপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক তুচ্ছ প্রাণ
কাস্তে ধরো, মুঠিতে এক গুচ্ছ ধান।
মর্ম আজ ধর্ম সাজ আচ্ছাদন
করুক: চাই এদেশে বীর উৎপাদন।

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।

তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির ॥ (জবাব)

'পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির' কবি সুকান্তর এই যে দৃঢ় আহ্বান এর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে সেকালের ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের দলিলগুলির মধ্যে। এমনই একটি দলিল প্রখ্যাত আইনজীবী স্নেহাংশু কান্ত আচার্য রচিত পুস্তিকা 'ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আজকের কর্তব্য'—প্রকাশিত হয় 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনসংঘ'-এর পক্ষে ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট থেকে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে। 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনসংঘ' সংগঠনটির নাম একালে বেশী উচ্চারিত হয় না। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘর পাশাপাশি এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে মূলত বৃহত্তর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে। 'সোভিয়েট সুহৃদ সংঘে'র প্রথম যুগ্ম সম্পাদক স্নেহাংশু বাবু এই সংগঠনটিরও অন্যতম প্রধান সংগঠক। আলোচ্য পুস্তিকার 'আমাদের আশু কর্তব্য: সক্রিয় সচেতনতা' পর্যায়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শ্রীআচার্য লিখেছেন:

"আমাদের স্বাধীনতার পথ রয়েছে জাপানকে বাধা দেওয়ার মধ্যে কিন্তু এটাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। অনেকে হয়ত চিন্তা করেন যে এই পথ নিলে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করব এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য কিছু করতে পারব না। এই রকম ভাবটা উপর থেকে দেখলে মনে আসে বটে, কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল তা বুঝতে হবে। কারণ আমরা তখনই জাপানের বিরুদ্ধে সত্যিই রুখে দাঁড়াব যখন বুঝতে পারব যে সেইটাই আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র উপায়।

আমাদের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে খুব সচেতনভাবে। আমরা যেন চোখ বুজে কেবল কামানের খোরাক না হই। কারণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এই কথা চিন্তা করে আমাদের থাকতে হবে সর্বদা সচেতন, আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত রাখতে হবে মূল লক্ষ্যের দিকে। আমরা দেখেছি কিভাবে কতগুলো দেশ চলে গেল জাপানীদের হাতে যেহেতু সেসব দেশের জনগণ রইল নিশ্চেষ্ট হয়ে এবং যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ স্থাপন করল না। অন্যদিকে আমরা দেখেছি কিভাবে মহাচীন ও সোভিয়েতের জনগণ যুদ্ধ করছে এই দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তিদের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে তারা ক্রমশ জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আরও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণের শক্তি যা এতদিন লুপ্ত ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদীদের দৃঢ়মুষ্টির ভেতর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ দুর্বল

এবং নৈতিক দিক থেকে একদম অচল। ব্রিটেনের জনগণই আজ সমরনীতির একমাত্র নিয়ন্তা—এই সময়েই তো দরকার আমাদের নিজেদের বলে বলীয়ান হওয়া। আমাদের ঘোষণা করতে হবে পৃথিবীর জনগণের কাছে আমাদের ফ্যাসিস্ট ধ্বংসের দৃঢ়সংকল্প। আজ আমরা এই সংকল্প নিয়ে যদি নামি এই মহাযুদ্ধে, তবে তার ফলাফল অতি সহজভাবেই বোঝা যাবে।"

পৃথিবীর জনগণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেই পরিখা খনন করে অস্ত্রহাতে অপেক্ষা করে আছে। বাংলাদেশে তখনও বিভ্রান্তির অভাব নেই। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক নেতাই জনযুদ্ধের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। একদল জাপানকেই পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করেছেন, আবার আরেকদল নিষ্ক্রিয়তার বন্ধ্যা কৌশল অবলম্বন করেছেন। বিজন রায় ছদ্মনামে সুশোভন সরকার 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। এই পুস্তিকায় তৎকালীন রাজনীতির দ্বিধা দুর্বলতা কাটিয়ে জনযুদ্ধের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান হয়েছিল :

"রাসবিহারী বসু প্রকাশ্যে, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত, জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা দেশভক্ত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের চোখ অতীতের দিকে। বর্তমান জগতের অবস্থা তাঁরা বুঝতে চান নি। হয়ত তাঁদের বিশ্বাস যে জাপানকে দিয়ে শুধু কার্যোদ্ধার করে নেবেন। আমরা যেন না ভুলি তার দাম দিতে হবে সাধারণ লোকেদেরই। বাঙলার মজুর, কিষাণ, ছাত্র আর সাধারণ লোকদের আসল স্বার্থ জড়ানো রয়েছে অন্যপক্ষের সঙ্গে। আজ জনযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা বাঙলা জাপানী ও জাপানের অনুচরদের সংকল্প ব্যর্থ করুক।

"কংগ্রেসী নেতারা আজ নির্জীব, নিষ্ক্রিয়। গান্ধীজির ধর্ম যে এখন অচল, গত কয়েক বছরে তা প্রমাণ হয়েছে। সে কথা স্বীকার না করে থাকলে কংগ্রেসের ক্রিপস-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার কোনও মানেই পাওয়া যায় না। তবু অভ্যাস বড় কঠিন জিনিস। তাই রাজাগোপালাচারীকে বর্জন করতে হল, আর পণ্ডিত নেহেরুকে এমন বক্তৃতা দিয়ে যেতে হচ্ছে যার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের মিল থাকে না। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবার কিংবা জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখবার দিন কি এখনও কাটবে না?

"জনসাধারণ জেগে উঠলে সূর্যের আলোর সামনে সব সংশয় আর কুয়াশা কেটে যাবে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাঙলাদেশ একাধিকবার পথ দেখিয়েছে। আজকে আবার বাঙালীরা এগিয়ে এসে দেশকে নতুন দিকে

নিয়ে যেতে পারে না কি? ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে কর্মীদের কর্তব্য কি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণকে জাগাতেই হবে।"

হতাশা বা মৃত্যুই শেষ কথা নয়। শত্রু দুর্ধর্ষ কিন্তু মানুষের প্রতিরোধও দুর্লঙ্ঘ্য। পলায়নের কোন সুযোগ নেই—সামনে পিছনে মৃত্যু-তাই মৃত্যুকে ভয় নয়, মৃত্যুর বুক চিরেই জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই কবি সুকান্ত প্রশ্ন ও পথ সন্ধান :

পালাবে বন্ধু? পিছনে তোমার ধূমন্ত ঝড়
পথ নির্জন, রাত্রি বিছানো অন্ধকারে।
চলো, আরো দূরে! ক্ষুধিত মরণ নিরন্তর,
পুরণো পৃথিবী জেগেছে আবার মৃত্যুপারে,
অহেতুক তাই হয়নি তোমার পরিখা খনন,
থেমে আসে আজ বিড়ম্বনায় শ্রান্ত চরণ।

মরণের আজ সর্পিল গতি বক্রবধির—
পিছনে ঝটিকা, সামনে মৃত্যু রক্তলোলুপ।
বারুদের ধূম কালোছায়া আনে,—তিক্ত রুধির,
পৃথিবী এখনো নির্জন নয়,—জলন্ত ধূপ
নৈঃশব্দের তীরে তীরে আজ প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে॥ (পরিখা)

সম্ভবতঃ জাপানী বোমাবর্ষণে আতঙ্কিত শহরবাসীর পলায়নপরতার দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতাটির সৃষ্টি। যখন সহস্র সহস্র মানুষ এমনকি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনরাও কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন তখন কিশোর সুকান্ত নিষ্প্রদীপ নির্জন শহরের পথে পথে হেটে চলেছেন, বাড়ী বাড়ী 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা পৌছে দিচ্ছেন। পলায়নপর মানুষের ভীতি তাঁর কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করেনি বরং বয়স্ক রাজনীতিজ্ঞের মত কবি দেখেছিলেন সারা পৃথিবী জুড়ে 'সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে অস্ত্র হাতে'। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীরা তখন ব্যাপক ভিত্তিক গণফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে ব্রতী ছিলেন। সুকান্ত খুব সহজেই এই সংগ্রামে অগ্রগণ্য সৈনিক হিসেবে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ খুব সামান্যই তাঁকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। মনে হয় ঢাকা শহরে উগ্রজাতীয়তাবাদীদের হাতে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের

হত্যার ঘটনা তাঁর মোহভঙ্গে আরও সহায়ক হয়েছিল। 'আগস্ট বিপ্লবী' ও ফ্যাসিপন্থীদের কমিউনিস্ট বিরোধী জিগির ও নৃশংস আক্রমণ সুকান্তর অস্ফুট চৈতন্যে ক্রমশঃ এনে দিয়েছিল সময়োচিত প্রজ্ঞা। সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যা উপলক্ষ্যে রচিত 'ছুরি' কবিতায় তারই স্বীকৃতি ঃ

বিগত শেষ-সংশয়; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,
শংকাকুল শিল্পী প্রাণ, শংকাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।
হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত।
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ-বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।

কিন্তু শুধু চৈতন্যের উন্মেষ নয়, কবি হৃদয়ে তীব্র ঘৃণা ও কণ্ঠে প্রতিরোধের ভাষা। বিদেশী চর মুক্ত করে দেশকে রক্ষা করার শপথ কবির কবিতায় ধ্বনিত।

শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের কবি না আজ গণ্য!
ভুলেছে যারা সভ্য-পথ, সম্মুখীন যুদ্ধ,
তাদের আজ মিলিত মুঠি করুক শ্বাসরুদ্ধ,
শহীদ খুন আগুন জ্বালে, শপথ অক্ষুণ্ণ
এদেশ অতি শীঘ্র হবে বিদেশী-চর শূন্য।
বাঁচার দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী॥ (ছুরি)

সেকালে এই কবিতা লেখা শুধু স্বচ্ছ দৃষ্টিরই পরিচায়ক নয়, যথেষ্ট সাহসেরও নিদর্শন। সতীর্থের মৃত্যুতে ইনিয়ে বিনিয়ে শোক গাঁথা রচনা নয়, এ যেন প্রতিশোধের দামামা ধ্বনিতে শত্রুর বুকে কাঁপন তোলা। ঘরের শত্রু বিভীষণদের উদ্দেশে তীব্র ঘৃণায় সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে তাঁর 'বিভীষণের প্রতি' কবিতায়। ফ্যাসিস্ট জাপানকে এদেশের মাটিতে ডেকে এনে যারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল যারা সোভিয়েত বিরোধী কুৎসায় জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছিল, আর যারা

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল তাদের সকলের বিরুদ্ধে কবির জেহাদ ঘোষিত হয়েছে এই কবিতায়, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান দিয়েছেন এক লালপথের।

আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক!
লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্তঘাতক,
হাজার জীবন বিকশিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।
অভিজ্ঞতার আগুনে শুদ্ধ অতীত পাতক,
এখানে সবাই সংঘবদ্ধ, যে নব জাতক।
... ...
মিলিত ও ক্ষত পায়ের রক্ত গড়ে লালপথ,
তাই তো লক্ষ মুঠিতে ব্যক্ত দৃঢ় অভিমত।
ক্ষুধিত প্রাণের অক্ষরে লেখা, "প্রবেশ নিষেধ,
এখানে সবাই ভুলেছে দ্বন্দ্ব, ভুলেছে বিভেদ।"
দুর্ভিক্ষ ও শত্রুর শেষ হবে যুগপৎ
শোণিত ধারায় উষ্ণ ঐক্যে ঘনায় বিপদ॥ (বিভীষণের প্রতি)

এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য তাঁর একটি ব্যঙ্গ কবিতা। কবিতাটি বক্তব্যের ঋজুতায় সুস্পষ্ট এবং লক্ষ্যভেদী। জনৈক ছদ্ম দেশপ্রেমীর বাচনিক এই কবিতায় আগস্ট আন্দোলনের প্রচ্ছায়ায় সাম্যবাদীদের প্রতি যে কুৎসা প্রচার করা হতো তারই তীব্র শ্লেষাত্মক অভিব্যক্তি ঘটেছে।

ভাল কথা, আমি প্রতিদিন
টোকিও, বার্লিন
শুনি—
আর জাপানের পদধ্বনি শুনি।...
আমাদের যখন দরকার
জাপান সরকার
ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক,
কিন্তু ক-টা অবাধ্য চৈনিক
অন্তরায়
আমাদের স্বরাজ পাওয়ায়।

আর অন্তরায় শুধু সাম্যবাদী দল
স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানির ছল।
—এই কথা রাষ্ট্র করে তারা—
ব্রিটিশের গৌরীসেনী অর্থে পুষ্ট যারা।

সুকান্তর কবি-মানস গঠনে কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের ভাবাদর্শের প্রভাব যেমন ছিল তেমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী কবিতা ও প্রবন্ধগুলির সুগভীর কার্যকরীতা। বিশ্বজুড়ে দানবীয় শক্তির দাপাদাপি ও পঞ্চাশের মন্বন্তর জনিত মর্মযন্ত্রণা তিনি নিবেদন করলেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায়—

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

বর্মা জয় করে জাপানীরা যখন মণিপুর আক্রমণ করল তখন ভারতবর্ষে সত্যিসত্যিই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক দেখা দিল। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ত্রাস ও ক্ষোভের সঞ্চার হল। কবি সুকান্তর ক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠল 'মণিপুর' নামে আশ্চর্য সুন্দর এক কবিতায়। কবির ধমনীতে অসহ্য চাঞ্চল্য, চেতনায় অগ্নিপ্রদাহ কিন্তু প্রকাশে কী সুগভীর সমাহিতি। এখন আর তিনি সতের বছরের কিশোর নন, হাজার বছরের প্রবীন যোদ্ধা, রক্তে তাঁর সুপ্রাচীন উপনিবেশ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ঐতিহ্য। তাঁর সমগ্র সত্তায় সেই ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত যে ভারতবর্ষের ধুলোয় ধুলোয় প্রতিরোধ, হাওয়ায় ঘূর্ণিত চাবুক, যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়েছে শত শত গর্বোন্নত বক্ষ। বাঙালী কবি সুকান্ত এমন এক ভারতবর্ষের ছবি এঁকেছেন যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমকালের আর কোন কবির দৃষ্টিতেই এমন করে ভারতবর্ষের মূর্তি আঁকা হয় নি। এ কবির স্বপ্ন-চোখে দেখা আহ্লাদী রূপ নয় বা বিদেশী-লাঞ্ছিতা ক্রন্দসী মাতৃমূর্তিও নয়। কোন অবয়বহীন স্বাদেশিক আবেগের ভাবপ্লাবনে এ কবিতার সৃষ্টি

হয় নি। কিংবা কয়েকজন ঐতিহাসিক পুরুষের বীরত্ব গাঁথাও এ কবিতার উদ্দেশ্য নয়।

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধরে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।
যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশেব ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভুলি? (মণিপুব)

ঐতিহাসিক বাস্তবতাব দৃষ্টিকোণের এমন সফল কাব্যিক উপস্থাপনা বিরলদৃষ্ট। এদেশ মুষ্টিমেয় রাজবাজরা বা স্বাধীনতাকামী ভদ্রলোকের নয়, এদেশ অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের রক্ত স্বেদ দিয়ে গড়া, মৃত্যুর বিনিময়ে আগলে রাখা। অজস্র গর্বোদ্ধত দিগ্বিজযীব হাড়ে এ মাটি উবব হয়েছে, কত অত্যাচাবী বাজ্য হয়েছে উজাড়।

আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।
এ ধুলোয় প্রতিরোধ, এ হাওয়ায় ঘৃণিত চাবুক,
এখানে নিশ্চিহ্ন হল কত শত গর্বোদ্ধত বুক।
এ মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধরে
রেখেছি মাটির মান কতবার কত যুদ্ধ করে। (মণিপুর)

সুতরাং সেই সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষ জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযানে আরেকবাব মাথা তুলে দাঁড়াক। জাতীয়তাবাদী নেতারা দ্বিধান্বিত, অনেকে নিষ্ক্রিয় বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিংবা শত্রুর দাসত্বকামী। কবির তাই আস্থা নেই এই সব নেতাদের প্রতি, কবির বিশ্বাস কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতি, যারা যুগে যুগে দেশের মাটিকে রক্ষা করেছে শত্রুর করাল গ্রাস থেকে।

এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,

এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।
দাসত্বের ধূলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,
ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ। (মণিপুর)

অগ্রগতির পাশাপাশি ফ্যাসিবাদের পরাজয় শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সাল থেকেই। সর্বপ্রথম রণেভঙ্গ দেন ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তির সর্দার মুসোলিনী। মিত্রপক্ষের কাছে আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান অঞ্চলের রণাঙ্গনে প্রচণ্ডভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। তারপর ১৯৪৩ সালের মার্চে সারা ইতালিতে শুরু হল শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ আন্দোলন। রোমের শ্রমিকশ্রেণী রুদ্ররোষে নেমে পড়েছে পথে পথে, অনেক রক্ত দিয়েছে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী এখন আর নয়। প্রবল সেই গণবিক্ষোভ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়ে বীরপুঙ্গব মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন। এ সংবাদ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে আনন্দের, স্বস্তির। কবি সুকান্তও আনন্দ প্রকাশ করেছেন 'রোম : ১৯৪৩' কবিতায়। কিন্তু নিছক আনন্দ নয়, সেই সঙ্গে এই জয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্যও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। ইতালির শ্রমজীবী মানুষের এই বিজয়কে তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করে শ্রেণী ঘৃণাকে ছন্দিত করেছেন।

ভেঙেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন, ছত্রপতি হয়েছে উধাও,
শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর।
'সাথী, আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়ার নাও'—
রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির।
উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুতার ব্যর্থ পরাক্রম,
মুক্তির উত্তপ্ত স্পর্শে প্রকম্পিত যুগ যুগ অন্ধকার রোম।
.. ..
ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ
বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।
যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে শৃঙ্খল
আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল।
এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে
যদিও কুয়াশা ঢাকা আকাশের নীল,
তবুও বিপ্লবী জানে, সোভিয়েট পাশে॥ (রোম : ১৯৪৩)

আরও বড় সংবাদ সৃষ্টি হচ্ছিল সোভিয়েতের রণাঙ্গনে। প্রথম আক্রমণ অভিযানের সুযোগে হিটলারবাহিনী কিছুটা সুযোগ করে নিলেও স্তালিনের নের্তৃত্বে লালফৌজের প্রতিআক্রমণ ফ্যাসিস্টদের গতিরুদ্ধ করে অটল পর্বতের মত মাথা তুলে দাঁড়াল। লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর যুদ্ধ বিধ্বংসী এবং বীরত্বপূর্ণ হয়েছিল কিন্তু স্তালিনগ্রাদের লড়াই হিটলার বাহিনীকে 'চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেনে এনেছিল। নাৎসীবাহিনী পরিবেষ্টিত স্তালিনগ্রাদের পতন অনিবার্য বলে ধারণা হয়েছিল যুদ্ধ-বিশারদদের। ১৯৭২ সালের ১৯শে নভেম্বর থেকে রুশ বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধ পাল্টা আক্রমণে রূপান্তরিত হল। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই লালফৌজের কাছে নাৎসী বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে এবং ১৯৪৩ সালের ১০ই জানুয়ারী নাৎসী অধিনায়ক পাউলাস স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে চরম পরাজয় বরণ করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। লালফৌজের এই বিজয়ে সমগ্র বিশ্বের জনগণের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। পরে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। কিন্তু এর পরেও অপর ফ্যাসিস্ট শক্তি জাপান ভারতবর্ষের চট্টগ্রাম ও আসামে বোমা বর্ষণ করে। কবি সুকান্ত সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামকে স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের বার্তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আস্থা প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রামও আবার হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে ফ্যাসিস্ট শত্রুর বুকে :

> তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
> সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দূলের ঘুম
> অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
> হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
> তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
> এখনো হয়নি নিরাপদ।
> দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
> তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
> যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
> তোমার সংকল্প স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গারদ
> এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
> তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
> আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥

(চট্টগ্রাম : ১৯৪৩)

'লেনিন' কবিতাটি সম্ভবতঃ ১৯৪৩ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিনের জন্ম-দিবস উপলক্ষে রচিত। স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের পিছনে লেনিনের শিক্ষার ফলশ্রুতি কবি লক্ষ্য করেছিলেন রুশ বিপ্লবের রূপকার লেনিনের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন বিশ্বের সমস্ত প্রত্যন্তের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে।

পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে,
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।

স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের পাশাপাশি ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির লড়াই ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠে যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় ভূখণ্ডের দেশগুলিতে। অপরদিকে পূর্ব দিগন্তের চীন, কোরিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও মুক্তি সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল।

সুকান্ত তখন রীতিমত সাংবাদিক। পার্টি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করছেন। তাঁর দৃষ্টি রয়েছে তখন সমগ্র বিশ্বের মানচিত্রে যেখানে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য মরণপণ যুদ্ধ চলছে। জয় পরাজয়ের ছোটবড় ঘটনায় তখন তাঁর হৃদয় চঞ্চল, উদ্বেগাকুল। বহির্বিশ্বের তোলপাড় করা ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁর ছোট্ট জীবন তখন ঝড়ো পাখীর মত ছটফট করছে। মালিকের বেতনভুক নির্বিকার সাংবাদিক নন তিনি, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের নবীন নায়ক। তাই দিগ্‌দিগন্ত থেকে ভেসে আসা খবরগুলো নিয়ে তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির ধারাস্রোতে সেই আনন্দ বেদনার ঘটনাগুলি তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে অসামান্য ব্যঞ্জনায়—

রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায়,
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।
অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে,
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।

কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।
তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা কখনো বা আসে গান ;

(খবর)

কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত কবি জানেন ইতিহাস সৃষ্টি করে জনগণ, ফ্যাসিস্ট দস্যুরা নয়। নির্দিষ্ট কোন একটি সময়ে অন্যায় যুদ্ধে হয়তো তারা কিছু দানবীয় কাণ্ডকারখানা করতে পারে, কিন্তু জনগণের জয় হবেই। বিশেষ করে যেখানে লেনিনের দেশ বিশ্ববাসীব ভরসাস্থল সোভিয়েত দুর্গ রয়েছে, যখন লাল ফৌজের মত দুর্দমনীয় বাহিনী রয়েছে, স্তালিনের মত দৃঢ়চেতা বিচক্ষণ নেতা রয়েছেন। পাশেই লড়াই কবছে মহান চীনের জনগণ মাও সে তুঙ ও চৌ এন লাই-এব নেতৃত্বে। সুতবাং যুদ্ধেব গতিপথ অনিবার্যভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকেই এগিয়ে চলেছে। খবরপরীরা কবি-সাংবাদিক সুকান্তব চেতনায় সেই বার্তাই বহন করে এনেছে। কবির তাই গভীর প্রত্যয়—

তাই তোমাদের আগেই খবর পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত-জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী। (খবর)

সুকান্ত ঠিকই বুঝেছিলেন চূড়ান্ত সংগ্রামে জনগণের সেই জয় আসন্ন হয়ে এসেছে। জার্মানীর প্রধান দোসর ইতালী ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। ১৯৪৪ সালে স্তালিনের পরিকল্পনা অনুসারে উপর্যুপরি সাফল্য অর্জিত হতে থাকল। রুশ বাহিনীর প্রবল আঘাতে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই ক্রিমিয়ার ইয়ালটাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন তিন মিত্রশক্তির বৈঠকে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা রচিত হল। ঐ মাসেই চল্লিশ দিন ব্যাপী এক অভিযানে শত্রুকে আরও পশ্চিমে তাড়িয়ে দেওয়ায় পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণ এবং চেকোস্লোভাকিয়ার বিরাট অংশ মুক্ত হল এবং পূর্ব প্রাশিয়া ও জার্মান

সাইলেসিয়ার অধিকাংশ অধিকৃত হল। রুশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে জার্মানীর সর্বশেষ মিত্র হাঙ্গেরি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াল। "জার্মানের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় সম্পূর্ণ করায়ত্ত" ঘোষণা করলেন স্তালিন।

স্তালিনের নির্দেশে লালফৌজ আরও অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে জার্মানীর শক্ত ঘাঁটিগুলি, এবং অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে বার্লিনের উপকণ্ঠে পৌছে গেল। "বার্লিনের বুকে বিজয় পতাকা উত্তোলন কর" কমরেড স্তালিনের এই আহ্বান রুশ বাহিনীকে করল আরও উদ্দীপ্ত। ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল বার্লিন পতনের প্রাক্ মুহূর্তে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে স্তালিন রাশিয়া ও পোলিশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২রা মে ১৯৪৫ বেতারে ঘোষিত হল জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সম্পূর্ণ দখলে এসেছে এবং লালফৌজের বিজয় পতাকা সেখানে উড্ডীন। যুদ্ধোন্মাদ ফ্যাসিস্ট হিটলারের কবর চিরতরে রচিত হয়ে গেল বার্লিনের বুকে। ৮ই মে, ১৯৪৫ জার্মান হাইকম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা বার্লিনে শর্তহীন আত্মসমর্পণের কাগজে সই করল। ৯ই মে সমগ্র বিশ্ব বিজয় উৎসবের প্লাবনে প্লাবিত হয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক দিবসে রণাধ্যক্ষ স্তালিন এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন :

"কমরেডগণ! স্বীয় দেশবাসী মহিলা ও পুরুষেরা! জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয়ের পরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী জার্মানী লালফৌজ ও মিত্র-বাহিনীর দ্বারা নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে এবং পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তারা শর্তহীন আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছে। · আমার প্রিয় সহযোগী দেশবাসী নারী ও পুরুষগণ! বিজয়ের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিশ্ব রাহুমুক্ত হল—আনন্দের জোয়ারে প্লাবিত হল কলকাতা নগরী—জনগণ আজ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী। কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হল হাজার হাজার মানুষের বিজয় মিছিল, যে মিছিলে সামিল হয়েছেন শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ। লাল পতাকার বিজয় উৎসব—ইতিপূর্বে এত বড় মিছিল কলকাতার মানুষ দেখেনি। সুকান্তর স্বপ্ন, সোমেনের হত্যার প্রতিশোধে দৃপ্ত এই অভূত-পূর্ব মিছিল গণ জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল সেদিন।

ফ্যাসিস্টদের আত্মসমর্পণের দিনটি ছিল ৮ই মে—রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। স্বভাবতই সেই দিনটিতে সুকান্তর মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথকে, যাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রথম কৈশোরে তাঁর চেতনায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীতি জন্মেছিল। তাঁর স্মরণে এসেছে রবীন্দ্রনাথের সেই কালজয়ী মহাবাণী—

দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এল
ঝড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,—

অনেক অপব্যয়ের পর সেই নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় কবি সুকান্ত লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী
অকস্মাৎ করে কানাকানি
'দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা
এল ঝড়ো যুগের মাঝে।'
... ...
ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বালিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।
রামরাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারত জটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।
পূর্বাচল দীপ্ত করে বিশ্বজন সমৃদ্ধ সভায়
রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।
এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে
যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

যুদ্ধাহত, মৃতপ্রায়, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক ভারতবর্ষে যুদ্ধ শেষে নতুন সংগ্রাম শুরু হবে এবার। সেই সংগ্রামের পুরোভাগে যে কবি তাঁর চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর। সে-কবি রবীন্দ্রনাথের নবজন্মে সম্ভাবিত কবি সুকান্ত। বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিটি রণাঙ্গনে যে কবি সতর্ক প্রহরীর মত দৃষ্টি রেখেছেন, সৈনিকের বেশে লড়াই করেছেন তাঁর যাত্রা আজ স্বদেশের

সীমানার দিকে। 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় সুকান্তর সেই নতুন দায়িত্বের ঘোষণা। যুদ্ধশেষে রণক্লান্ত ভারতীয় সৈনিকের মনে পড়েছে প্রেয়সীকে, তাই ঘরে ফেরার তাড়া। সে জানেনা তখনও তার প্রেয়সী বেঁচে আছে কি নেই—'দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে' তাও জানে না। নিজের ঘর নিজের দেশ নিষ্কণ্টক করতে এবার সে দেশের উদ্দেশে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'প্রিয়তমাসু।' প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ না পেলেও সৈনিক কবি সুকান্ত এখানে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সৈনিক সাহিত্যিক কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, ফেলিসিয়া ব্রাউন প্রমুখের সঙ্গে একাত্ম। তাঁর হৃদয় মন সমান্তরালভাবে যুদ্ধ করেছে বিশ্বের সমস্ত রণাঙ্গনে। আজ যুদ্ধ শেষে তাই তাঁর দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানর পালা। মর্মস্পর্শী বর্ণনা ও আবেগ নির্ঝরে কবিতার শেষে কবি বলেছেন :

> আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
> যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেবে
> অথচ নিজের ঘবে নেই যার বাতি জ্বালাব সামর্থ্য,
> নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকাব।

কোন কোন সমালোচক এই কবিতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা থেকে জাতীয়তায় সুকান্ত মানসের প্রত্যাবর্তন আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা ভুলে যান যথার্থ কমিউনিস্টের চেতনায় জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা সমার্থক। আন্ত-র্জাতিকতা বর্জিত জাতীয়তা যেমন সংকীর্ণতা ও উগ্রতার জন্ম দেয় তেমনি জাতীয়তা বর্জিত আন্তর্জাতিকতা ছিন্নমূল। যেমন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টি স্বার্থ রক্ষা করা যায় না তেমনই ব্যষ্টির মঙ্গল ছাড়া ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করা যায় না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু একজন কমিউনিস্টেব কাছে সেটাই তো শেষ যুদ্ধ নয়—যুদ্ধকে জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি যুদ্ধে সম্প্রসারিত করতে হবে। ভারতবর্ষের পিঠে তখনও জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জনগণের উপর অব্যাহত রয়েছে দেশী বিদেশী শোষণ। ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে জমে রয়েছে দুঃসহ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের নদী পেরিয়ে আলোর পথে সমুদ্র যাত্রা—সুকান্ত দেখেছেন সেই স্বপ্ন। 'দিন বদলের পালা' কবিতায় কবি সুকান্ত সেই পালা বদলের সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামের অগ্রচারী কবি এবার শুরু করলেন দেশের স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্তির সংগ্রাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও সুকান্তর কবিতা

বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশকে যে বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের সূচনা হয়েছিল তাতে সাহিত্য জগতের ভৌগোলিক সীমানা খানিকটা বিস্তৃত হলেও কিংবা জনজীবনের অনালোকিত অংশের উপস্থাপনা ঘটলেও মূলত মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অগভীরতার দরুণ জনমনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি। যদিও প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে ওঠার মাধ্যমে সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াব ধারার বিরুদ্ধে সচেতন শিল্প প্রয়াস শুরু হয়েছিল কিন্তু চল্লিশের দশকের পূর্বে তা প্রকৃত অর্থে সাহিত্য আন্দোলনের রূপ নেয় নি। এর জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিমণ্ডল প্রয়োজন হয় তার অভাব ছিল। তাই তিরিশের দশকে সাহিত্যে অবহেলিত মানুষের জীবনায়ন হলেও বহুক্ষেত্রে যৌনতা ও বীভৎসরস প্রকটিত হয়ে এক নঙর্থক দিকেরও সূচনা হয়। সেদিক দিয়ে চল্লিশের দশক বাঙলার জীবনে এক দুর্যোগপূর্ণ ও ঘটনাবহুল সময়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাপানী দস্যুদের প্রতিরোধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিপর্যয় থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার প্রয়াস এক উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই ব্যাপক-ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আন্দোলন-সংগ্রাম চল্লিশের দশকে জীবনবাদী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির স্বর্ণযুগ রচনা করে। শুধু অবিভক্ত বাংলাদেশে নয়। সমগ্র ভারতবর্ষেব শিল্প-সাহিত্যব ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক সংগ্রাম নবচেতনায় সঞ্চার করে।

ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ও পঞ্চাশেব মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় চল্লিশের দশকে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকাংশের এক গণ-মোর্চা গঠিত হয় যা সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ, পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘের সংগঠনগত রূপ পরিগ্রহ করে। বিশেষ করে শেষোক্ত দুটি সংগঠন তখন বহু সৃষ্টিশীল লেখকের জন্ম দেয় এবং অনেক বর্ষিয়ান লেখক শিল্পীর সৃষ্টির মানস পটভূমি প্রস্তুত করে। তৎকালীন অন্য অনেক শিল্পী সাহিত্যিকের মতই স্রষ্টা সুকান্তকেও এই ফ্যাসিস্ট ও মন্বন্তর বিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে এই সংগ্রামের প্রতিফলন ও রূপায়ন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামের পটভূমিতে সুকান্ত কবিতার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য পর্যায়ে মন্বন্তর কিভাবে সুকান্তর সৃষ্টি

মানসে ঢেউ তুলেছিল এবং তিনি তাব ভাষারূপ দানে কতখানি সফল হয়েছিলেন—সেই আলোচনা কবা যেতে পাবে। প্রাসঙ্গিকতার কাবণে একালের পাঠকের সুবিধার্থে পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র কিছুটা স্মরণ করা যেতে পারে।

তেরশো পঞ্চাশ বা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের আঘাত ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন কোন অংশে পড়লেও মূলত বাংলাদেশেই চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির রুগ্ন চেহারাটি প্রকটিত হয়ে ওঠে এই মন্বন্তরের মধ্য দিয়ে। দেশ বিভাগেব পূর্বে বিশ শতকে বাংলাদেশেব সমাজ জীবনে এতবড় বিপর্যয় আব আসে নি। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সরকারী ও বেসবকাবী সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ-দুর্ভিক্ষ মনুষ্য সৃষ্ট। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রশাসন একটু সচেষ্ট হলেই লক্ষ লক্ষ মানুষেব প্রাণহানি থেকে দেশকে বক্ষা করা যেত। ১৯৪১ সালেব আদম সুমাবী থেকে দেখা যায় বাংলার সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভব পবিবাব ছিল ৭৫ লক্ষ। এব মধ্যে প্রায ১০ লক্ষ পবিবাব ছিল প্রধানত বর্গাদার এবং প্রায ২০ লক্ষ পবিবাব ছিল ক্ষেত মজুব। এক কথায় প্রায় অর্ধেক পরিবার ছিল হয ভূমিহীন বা ২ একবের জমির মালিক। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে প্রাকৃতিক সম্পদেব স্বতঃস্ফূর্ততাব উপবই মূলত নির্ভর কবা হতো, কোন উন্নয়নের প্রয়াসই করা হয় নি। সেচ ব্যবস্থাও প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে একই পর্যায়ে চলে আসছিল। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি বা পরিকল্পিত সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের কোন কার্যকর অগ্রগতি ঘটানব প্রচেষ্টাও ছিল না। এর সঙ্গে অব্যাহত ছিল চিরাচরিত সামন্ত শোষণ যা কৃষি অর্থ-নীতির অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। খরা ও বন্যা তো বাংলার প্রায় নিত্যসঙ্গী।

এই সমস্ত কাবণেব ফলশ্রুতিতে খাদ্য ঘাটতি চলে এসেছে বিশেব দশক থেকেই। বছবেব ৫২ সপ্তাহেব মধ্যে ১৯২৮ সালে খাদ্যের যোগান ছিল ৪৫ সপ্তাহের, আব ১৯৪১ সালে ৩৯ সপ্তাহেব। ১৯৪২ সালেও ফসল ভাল হয়নি। ঐ বছরেই মেদিনীপুব ও দক্ষিণ চব্বিশ পবগণায় প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যার দরুণ ক্ষয়ক্ষতিব ফলে ২৫ লক্ষাধিক মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রায় চার হাজার বর্গ মাইল এলাকার ফসল নষ্ট হয়। ফ্যাসিবিবোধী জনযুদ্ধেব নীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষকসভা অধিক ফসল ফলানোব কর্মসূচী গ্রহণ করে। যদিও এই কর্মসূচীর দ্বারা লক্ষ্যনীয় কিছু উন্নতি ঘটেনি তাসত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে যে ফসল হয় তাতে ৪৩ সপ্তাহের প্রয়োজন মিটতে পারত।

এছাড়া সরকারী ভাণ্ডারে ৬ সপ্তাহের সঞ্চয় ছিল। সুতরাং প্রকৃত ঘাটতি ছিল মাত্র ৩ সপ্তাহের। তবুও দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে।

যুদ্ধে জাপানের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থনীতিও ক্রমশ যুদ্ধমুখী হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় টাকার খেলা এবং যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার পরিবেশে মজুতদার, কালোবাজারী ও ব্যবসাদাররা মরণ ব্যবসায় মেতে ওঠে। বার্মার চাল আসা বন্ধ হওয়ায় তারা যেন হাতে আরও স্বর্গ পেল। ১৯৪২ সালের শেষ থেকেই চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে আমন ধান ওঠা সত্ত্বেও দাম কমার পরিবর্তে প্রচণ্ডগতিতে বেড়েই গেল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় যেখানে চালের মন ছিল ৬ টাকা ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে সেখানে ৪০ টাকা হয়ে যায়। মফস্বল জেলাগুলিতে চাল ৮০ থেকে ১০০ টাকা মণ দরে বিক্রী হতে থাকে। স্বভাবতই অনুমান করা যায় এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি দেশের দরিদ্র, ক্ষেত মজুর, ছোট চাষী, নিম্ন আয়ের মজুর শ্রেণীর মানুষকেই নিদারুণ ভাবে আঘাত করবে। হলও তাই। গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ একমুঠো খাবারের আশায় শহরের দিকে ছুটে এল।

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করে রজনী পাম দত্ত India Today গ্রন্থে লিখেছেন :

"The bankruptcy of the Indian agricultural economy was revealed in all its nakedness when after the entry of Japan into the war, the imports of rice from Burma were stopped. It immediately created a situation of scarcity of foodgrains and rising prices in India, which could have been met firstly by an intensive drive to increase the production of foodgrains by relieving the burden on the tenant and by supplying him the necessary irrigation and other facilities; secondly, by control of prices and overall rationing; and lastly, by effectively checking the hoarding and blackmarketing by landlords and traders. Instead of this the imperialist Government, intent on financing the war by the exploitation of the common people, relied upon inflation, high price, and used hoarders

to obtain its food supplies for the military without caring to organise equitable distribution of food for the people. The result was that though the total deficit of foodgrains in the year 1943 was only 1,400, 000 tons, a minor fractions of India's needs, vast parts of the country were plunged into a famine which resulted in mass deaths" (পৃ: ২৬২)

সরকার, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও কালোবাজারীদের সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষে সরকারী দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আর অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বেসরকারী তদন্ত কমিশনের হিসেবে দেখা যায় ৩৫ লক্ষেরও বেশী মানুষ দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের অনুসঙ্গ মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা কিন্তু ১৫০ কোটিরও বেশী টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক স্থায়ী সংকটের বীজ উপ্ত করে।

তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর জন হারবার্টের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে। বাঙলাদেশের প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক সাহেবকে গভর্ণর জোর করে পদত্যাগ করান ১৯৪৩ সালের ২৮শে মার্চ এবং ২৪শে এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দীনেব নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই নতুন মন্ত্রীসভাকে ক্রীড়নক করে গভর্ণর আমলাতন্ত্রের সহায়তায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা কর্তৃক নির্ধারিত চাল ও গমের সর্বোচ্চ মূল্য তুলে দিয়ে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়। ধান চাল ক্রয় ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকার মাত্র কয়েকটা বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী এজেন্ট নিযুক্ত করে। হক্ সাহেবের মতে "প্রধানত একচেটিয়া ব্যবসাদারদের মারফতে মফস্বলে এই বেপরোয়াভাবে খাদ্য ক্রয় করার কারণে" দুর্ভিক্ষ ঘটে ছিল। রজনীপাম দত্তের পর্যালোচনায়ও এর স্বীকৃতি রয়েছে: "The famine was a 'man-made' famine. The shortage in Bengal was only a shortage of six weeks' supplies, and could have been made up by imports and equitable distribution. But over one-third of the population of Bengal was hit by the famine. The entire stocks had been cornered by the big zamindars and traders, and the corrupt bureaucracy rather than force stocks out of

their hands helped them to shoot up prices and play havoc with the lives of millions of people." (India Today পৃ; ২৬৩)।

এই দুর্ভিক্ষ যে শুধু লক্ষ লক্ষ প্রাণই নিয়েছে তা নয় বাংলাদেশের সমাজ জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। দুচার বিঘে জমি যাদের ছিল তারা অভাবের তাড়নায় সে সব বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিল জমিদারদের কাছে। তার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও ভারসাম্যহীন হয়ে গেল। সহস্র সহস্র নারী মান ইজ্জৎ হারিয়ে বারবণিতার জীবন গ্রহণে বাধ্য হল। এক মুঠো চালের চেয়ে নারী-দেহ অনেক সস্তা হয়ে গেল, অবাধে চলতে থাকল নারী কেনা বেচা। ঘাস পাতা খেয়েও যখন প্রাণ ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ল শহরের পথে পথে তখন বুভুক্ষু মানুষের মিছিল, রাস্তার ধারে ধারে মৃত মানুষের শব, ফ্যান দাও ফ্যান দাও চীৎকারে গ্রাম শহরের বাতাস হয়ে উঠল আরও ভারী। বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক চরম বিপর্যয়।

একদিকে ফ্যাসিবাদ, অপরদিকে মন্বন্তর-এই উভয় দানবীয় মূর্তির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে মরণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামে অগ্রগণ্য ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিলেন সেদিনের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনসমাজ। মন্বন্তরের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে মন্বন্তব সৃষ্টিকারী মানবতার শত্রুদের চিহ্নিত করা এবং তাদের রাজনৈতিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করাও প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিকরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অসহায় মানুষদের রক্ষাকল্পে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ যেমন সেবাব্রত গ্রহণ করেছিল তেমনি গল্প কবিতা উপন্যাস ও-নাটক গানে শ্রেণীশত্রুর নগ্ন চেহারাটি উদ্‌ঘাটিত করে মানুষের মনে আশার বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও কথাশিল্পীরা অজস্র গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের অসহায়তা ও বাঁচার সংগ্রামকে ভাষারূপ দিয়েছেন। এই সব সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

শিল্পীদের অবদানও কম নয়। হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের পরিচালনায় গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের নিয়ে সংগঠিত। 'ভয়েস অব বেঙ্গল' দল সে সময় শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতে তোলপাড় করেছিল। বাংলার আর্তরূপটি তাঁরাই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে

দিয়েছিলেন। কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বে, লাহোর প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠান করে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে শিল্পীরা পীপলস রিলিফ কমিটির তহবিলে জমা দেন সেবা কাজের জন্য। এই সময়েই সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠিত হয় এবং বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৪ সালের ১৫ থেকে ১৭ই জানুয়ারী ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও কমিউনিস্ট বিদ্বেষের প্রভাবে অতুল চন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ সংগঠন ছেড়ে গেছেন কিন্তু এগিয়ে এসেছেন আরও অনেক খ্যাত-নামা শিল্পী সাহিত্যিক। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকরা পেলেন অনেক নতুন শিল্পীকে। এখানেই শোনা গেল উত্তরবঙ্গের লোক কবি নিবারণ পণ্ডিতের পাঁচালী গান। পানু পাল-এর 'মহামারী নৃত্য', 'অনু দাশগুপ্তের চা-বাগিচানৃত্য,' বিনয় রায়ের 'মাঁ।য় ভুখা হুঁ' নাটিকা গণশিল্পের দিগন্ত উন্মোচন করে। এই সময় শিল্পীরা শুধু নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, গণ চেতনার পাঠ গ্রহণ করেছেন শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামের ময়দান থেকে। প্রখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকরা সোৎসাহে যোগ দিয়েছেন কৃষক সভার সম্মেলনে, সেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন লোক সুর, জীবনরস আর তাদের দিয়েছেন নাগরিক সংস্কৃতির উপহার। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে জনজীবনের এই মেল বন্ধন সৃষ্টিতে সে কালের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই সম্ভব হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নব জীবনের গান' এবং বিজন ভট্টাচার্যের কালজয়ী নাটক 'নবান্ন'।

১৯৪৫ সালের ৩রা থেকে ৮ইমার্চ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর পরবর্তী সম্মেলন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মণ্ডলীতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ডঃ ধীরেন সেন, লোক কবি শেখ গোমহানী প্রমুখ। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল যুদ্ধ ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে অতুল বসু, রমেন চক্রবর্তী, জয়নুল আবেদিন,

বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, শৈল চক্রবর্তী, রথীন মৈত্র, মণি রায় প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের আঁকা স্থান পেয়েছিল। সম্মেলন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের লোককবি রমেশ শীল ও শেখ গোমহানীর কবির লড়াই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। এরই কয়েকমাস আগে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'নবান্ন' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। 'নবান্ন' আবার অভিনীত হয় এই সম্মেলনে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় শান্তিবর্ধনের পরিচালনায় 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যনাট্য যুগ ও কালের সমাজসত্যটি অপূর্ব শিল্পময় ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করে। এই সম্মেলন থেকেই 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' রূপান্তরিত হল 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে।

যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই সংগ্রামের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শরিক কবি সুকান্ত। শুধু স্রষ্টা হিসেবে নয় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে সুকান্ত তখন মন্বন্তর পীড়িত মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ের কবি—বাংলার মন্বন্তর শুধু তাঁর অনুভব নয় তাঁর অভিজ্ঞতায় পরিব্যাপ্ত। বহু যৌবনকে তিনি লঙ্গর খানায় লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষয় হতে দেখেছেন : এই মরণোন্মুখ মানুষগুলির মর্মবেদনা তাঁর সত্তায়, তাঁর অনুভূতির স্তরে স্তরে সঞ্চারিত। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সঙ্গে কবি তাই অভিন্ন সত্তা :

> আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
> প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
> আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,—
>
> (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

'ইউরোপের উদ্দেশে' কবিতায় কবি যুদ্ধ পরবর্তী শান্তির পরিবেশে ইউরোপের পুনর্গঠনের সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা করে বলেছেন :

> অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
> চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে ;
> এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
> অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
> বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ—
> তোমাদের দেশে মে মাস ; এখানে ঝোড়ো বৈশাখ ॥

পঞ্চাশের মন্বন্তরের বাংলাদেশের কাব্যচিত্র ধরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তখন

কবিরা একটি কাব্য সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন। সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় কনিষ্ঠতম কবি সুকান্তর উপর। ১৩৫১ সালে প্রকাশিত 'আকাল' নামের এই সংকলনের 'কথা মুখ'-এ সুকান্ত লিখেছেন : "তেরোশো পঞ্চাশ সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেননা তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রাম-ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।" এই দুর্ভিক্ষ লাঞ্ছিত বাংলাদেশের হৃতশ্রীতা এবং বিপন্ন মানুষের বেদনা কবি সুকান্ত ব্যক্ত করেছেন অসীম মমতায়, তীব্র যন্ত্রণায়, আত্মীয় সুলভ সহমর্মীতায় :

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,

প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল
আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ ,
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দুপাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্তমুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দর মহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল ;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে। (বিবৃতি)

'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে'—এই আত্মলীন আবেগ যেন কতকালের কত যুগের নাড়ীর সম্পর্কে বিজড়িত। সাধারণী জীবনযাত্রার আটচালা থেকে দূরে ভদ্রাসনে বসে লোকমুখে শুনে বা কোন এক উপলক্ষ্যে

গ্রামে গিয়ে চোখের দেখার তাৎক্ষণিক আবেগে লেখা কবিতা নয়। অথচ পাশাপাশি অগ্রজ-প্রতিম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই দূরানুভবের পরিচয় :

শুনেছি একদা সোনালি ধানে
আকাশ তপ্ত সূর্য আনে,
বিকালে হালকা হাওয়ার নাচে
হৃদয়ে স্ফূর্তি হয় ছোঁয়াছে।
সম্প্রতি গ্রামে আছি, কোথাও
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা
উপবাসী চাষা, ধান উধাও
মহাজনদের পন্থা জানা। (গ্রাম্য)

'চাষা' শব্দটি একজন মার্কসবাদী কবির কলমে বড় বেমানান, মধ্যবিত্তসুলভ উন্নাসিকতার পরিচায়ক। অসতর্ক ব্যবহারও হতে পারে। অথচ কিশোর সুকান্ত লিখেছেন 'মজুর ভাই', 'অভুক্ত কৃষক'।

এই সব ভ্রষ্ট নীড়, নিরন্ন প্রাণ, কঙ্কালসার লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্লিষ্ট জীবনের গাথাকাব্য রচনাতেই কবির দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। সমাজ দায়িত্বে অন্বিত কবির কাজ এই সব ছিন্নমূল হতাশ মানুষের বুকে সাহস জাগানো, বাঁচার ছন্দ রচনা, লোভী কুচক্রী শোষকদের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কবি সুকান্তর কণ্ঠে আজ সেই জেহাদ ঘোষণা :

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।
আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যেন,
এদেশে ভাণ্ডার ভরে দেবে জানি নতুন যুক্রেন।
নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন মত্ত চঞ্চল ধমনী :
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক

আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা॥" (বিবৃতি)

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ইত্যাদি ঘটনা কবি সুকান্তর মার্কসবাদী বিচারে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশী বিদেশী শোষক শ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন চক্রান্তের একটি ঘটনামাত্র। তাই কবি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন রেখেছেন সমস্ত বিবদমান রাজনৈতিক চিন্তার মানুষের কাছে "কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?" আজ বাহান্ন সালের সূচনায় কি তাব উত্তর দেবে?" বাহান্ন সালে দাঁড়িয়ে কবি ভাবতে বলেছেন সকলকে অনৈক্যের পথে হেটে শুধু আত্মহননেই ব্যাপৃত থাকবে না নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে শোষণ মুক্তির ধ্রুবপথ গ্রহণ করবে। কবি সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে ৪২-৪৩ সালেব রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক দলবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাংলাদেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, শোষণমুক্তির লড়াই পিছিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে, সমস্ত আর্ত মানুষকে দলমত নির্বিশেষে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই মানুষগুলো প্রকৃত মুক্তির লাইনে সামিল হতে এখনও শেখেনি। কবি সুকান্ত সেই লক্ষ্যের দিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন:

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিষের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।
(ঐতিহাসিক)

শুধু খাদ্যদ্রব্যের আকাশছোয়া মূল্য বৃদ্ধি নয় সেই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং কালোবাজারী ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসে এ সময়। এক কথায়

এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, যে অবস্থার মধ্যে অতিলোভী মুনাফা শিকারীরা ব্যবসা করে সম্পদের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, অপরদিকে সীমাহীন শোষণে মানুষ আরও নিঃস্ব হয়েছে। 'ভেজাল', 'ব্ল্যাক মার্কেট' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় সুকান্ত শোষণের সেই চূড়ান্ত অমানবিক দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। এই জাতীয় রাজনৈতিক ছড়া রচনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। যেমন :

(১) হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীবচাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো। (ব্ল্যাক মার্কেট)

(২) ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়। (ভেজাল)

দুর্ভিক্ষ-মহামারী কবলিত বাংলার আন্তরিক চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি কবি সুকান্ত প্রতিরোধের আহ্বানও জানিয়েছেন। এ আহ্বান নৈতিক কর্তব্যবোধের মধ্যে সীমায়িত নয়, কমিউনিস্ট পার্টি, সংস্কৃতি কর্মীরা এবং কৃষক সভা একযোগে নিরন্ন মানুষের সেবায় দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল, জমি-জমা হারানো মানুষদের পুনর্বাসন, ক্ষুধার জ্বালায়, আত্মীয় পরিজন রক্ষার তাড়নায় আত্ম-বিক্রীত মহিলাদের সমাজে পুনর্প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানকল্পে সংগঠিতভাবে পার্টির কর্মীদের ও গণসংগঠনগুলিকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। দিনাজপুরের ফুলবাড়ি বন্দরে অনুষ্ঠিত (২৯শে ফেব্রুয়ারী– ২রা মার্চ ১৯৪৪) প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবল থেকে গ্রাম বাংলাকে রক্ষা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্য ও ওষুধের বণ্টনের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি চরমে উঠেছিল। সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুসারে দাবী করা হয় : "সরকারকে পাঁচকোটি মণ চাল কিনতে হবে, সমস্ত শহরে রেশনিং চালু করতে হবে, কুইনিনের চোরা কারবার বন্ধ করতে হবে এবং পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন বণ্টন করতে হবে। দুঃস্থদের জন্য কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির রেশনিং ব্যবস্থা করে ফুড কমিটি মারফত বণ্টন করতে হবে, দুর্ভিক্ষের বছরে কৃষকদের যেসব জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল তা ফেরত দেওয়াতে হবে।" (কৃষক সভার ইতিহাস পৃঃ ১৩২ —আবদুল্লাহ রসুল)। চিনি কেরোসিন ও লবণ নিয়েও প্রচণ্ড চোরাকারবার চলতে থাকে। গ্রামে

গঞ্জে এই চোরাকারবারের বিরুদ্ধে এবং অভাবের জ্বালায় জলের দামে বিক্রী করে দেওয়া কৃষকের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষক সভার কর্মীদের সংগঠিতভাবে সংগ্রাম করতে হয়। মানুষের মনে আশা জাগানো, মৃত্যুভয়কে দূরে সরিয়ে বাঁচার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান তখনকার কবি শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রেখেছিলেন এবং তার প্রভাবও সুদূর প্রসারী হয়েছিল।

সুকান্তও বারবার তাঁর বিভিন্ন কবিতায় সেই সংঘবদ্ধ বাঁচার সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস করেছেন এবং জনতার সেই প্রতিরোধ সংগ্রামকে কাব্যে ধরেও রেখেছেন :

সহসা জানলায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে ;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান॥ (মৃত্যুজয়ী গান)

বাঁচতে চাওয়া ও বাঁচার সংগ্রামই মানব ধর্ম। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বারবার একদল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষ ব্যাপকতর জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে সভ্যতার নকল প্রাসাদ গড়ে তোলে। স্বভাবতই দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘর্ষ-রক্তক্ষয়, অবশেষে হিংস্র শোষকগোষ্ঠীর পরাজয় বা পিছুহটা, অনেক ক্ষয়ক্ষতির কালরাত্রি শেষে জীবন প্রত্যুষের আবির্ভাব। আবার চক্রান্ত-আবার সংগ্রাম-চূড়ান্ত মুক্তির জন্য সংগ্রাম-অবিরাম পথ চলা চঞ্চল পায়ে। এই পথ চলা নিরঙ্কুশ নয়, নিরন্তর ভালবাসার বা উদার নৈতিকতার নয়। তাই বাঁচার সংগ্রামের মূলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণা অনিবার্য অনুসঙ্গ। কোন কোন কবির মধ্যে সেই ক্রোধ, ঘৃণা হয়তো কম কিন্তু সংগ্রামের বিকল্প পথ সম্পর্কে সজাগ। যেমন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়—

শত কোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ-সন
ছিটে ফোঁটাও ধান নেই।
... ...
এ দুর্দিনে পাওনা আদায়

বন্ধ রাখুন মহারাজ
ভিটেতে হাত না দেয় যেন
পাইক-বরকন্দাজ।

হাজার খানেক প্রজা আছি
আমরা এই মৌজায়
সবাই মিলে ঠিক করেছি
কেমন করে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে ?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে॥ (চিত্রকূট)

সেকালের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি সমর সেনের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে একই সুর তবে উপস্থাপনায় নাগরিক নির্লিপ্তি এবং বই পড়া সচেতনতা।

অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
বড়লোকে আস্থা নেই আর,
দেখেছি দেশের দুর্যোগে
কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ুদত্ত করে।
মাঠে মাঠে সোনার ধান,
কোথায় ধান।
সোনা জমে তাদের ভাণ্ডারে।
... .
অকাল মরণ শেষে একাল সমরে!
তোমাকে জানাই বন্ধু :
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুণ ধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার। (গৃহস্থ বিলাপ)

গার্হস্থ বিলাপ শেষে মধ্যবিত্ত কবি বাঁচার উপায় খুঁজে পেয়েছেন স্ব শ্রেণী চ্যুতির মধ্যে। যথার্থ পথ সন্দেহ নেই। কিন্তু সুবিধামত সময়ে বিপ্লবী শ্রেণীর

মিছিলের শেষে দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যবিত্ত সুলভ চাতুর্য যথেষ্ট নয়, নিজেকে শ্রেণী ঘৃণায় উদ্দীপ্ত করে শোষক শ্রেণীর মুখোমুখি সংগ্রামে নেমে পড়ার মধ্যেই প্রকৃত বিপ্লবী চেতনার পরিচয়। হুজুরের কাছে আবেদন নয়, যুগ যুগ সঞ্চিত বঞ্চনার অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া সচেতনতা নিয়ে শ্রেণী যুদ্ধ ঘোষণা করাই নভেম্বর বিপ্লবোত্তর পৃথিবীর মানুষের কাজ, বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যিকের কর্তব্য। বয়সে কনিষ্ঠ হলেও কবি সুকান্ত সেই দুর্লভ বৈপ্লবিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বহু কবিতায়, বিশেষ করে মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত 'বোধন' কবিতায়। শুধু প্রতিরোধ নয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণ হরণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার তাঁর কণ্ঠে।

শোন্ রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সেকথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি।
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার। (বোধন)

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত, আবার শুরু হয়েছে পুনর্গঠনের কাজ। বীজ ধান, লাঙল, গরুর জন্য কৃষক সভা আন্দোলন করছে, তাদের দাবী সরকারকে এসব যোগাতে হবে। সৃষ্টির উৎসব আবার গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে। এবার কৃষক সজাগ, সতর্ক তাদের সংগঠন, জমিদার মজুতদারের ঘরে সমস্ত সোনার ধান যেন না চলে যায়। তাই সর্বত্র সতর্ক প্রহরা। প্রহরী কবিও। চাষীর ফসল বোনার, ফসল তোলার সংগ্রামের পাশে তিনি দর্শক নন, সৈনিক কবি সুকান্ত লিখলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "ফসলের ডাক : ১৩৫১"। অসাধারণ এর বিষয়বস্তু, অসামান্য এর কাব্যিক সাফল্য। শুধু সহমর্মীতা

নয়, সহযোদ্ধা, অগ্রগামী সহযোদ্ধা কবি চাইছেন হাতিয়ার-কাস্তে-যা নিয়ে সামনের সোনালী সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন। এ কবির রোমান্টিক ভাববিলাস নয়, জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম অনুভব সঞ্জাত দায়িত্ববোধ।

আমার পুরানো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর—
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে,
যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো।

(ফসলের ডাক : ১৩৫১)

নতুন কাস্তে চাই কবির, পুরনো মরচে পড়া চেতনার হাতিয়ার নয়, যুদ্ধ-মন্বন্তর পরবর্তী নবচেতনার প্রখর কাস্তে। যে কাস্তে শ্রেণী শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর বাংলার জীবনে ও চেতনায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিশ শতকে বাংলার জীবনে এত বড় তোলপাড় করা ঘটনা তখন পর্যন্ত আর ঘটেনি। এই বিপর্যয় যেমন জীবন যাত্রার পুরনো ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে, মূল্যবোধগুলো ভেঙে চুরে দিয়েছে, গ্রামের হাজা-মজা শ্লথ গতি জীবনে গতি এনে দিয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণে অনিবার্য ভাবে নতুন চিন্তা এনে দিয়েছে। এ এক নতুন দেশপ্রেম। অরূপ দেশ মাতৃকার ভাবোন্মাদ বন্দনা বা আত্ম প্রবঞ্চনা নয়, দেশের মানুষের মুক্তির বন্দনা, সে মুক্তি শুধু বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি নয়, দেশী বিদেশী শোষণ থেকে মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি। তাই নতুন দিনের এই নতুন সংগ্রামে কবি শুধু কৃষকের শহরবাসী বন্ধু নন, কৃষকের লড়াইয়ের স্বীয় ক্ষেত্রে সহযাত্রী, সতীর্থ। মারী ও মরণ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে, আবার তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাই কবির চাই হাতিয়ার :

পরাস্ত অনেক চাষী, ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ—
জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল পড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূর সন্ধানী
তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপি চুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,

সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত,
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে॥
(ফসলের ডাক : ১৩৫১)

অন্যত্র কবি কণ্ঠে শোনা যায় ফসল ফলানোর শপথ সেই মাটিতে যে মাটি আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ্যা। ম্রিয়মাণ মধ্যবিত্ত চেতনায় যখন হতাশা, এদেশের মাটিতে বিপ্লবের সম্ভাবনায় যখন বিশ্বাসের অভাব, যখন কোনক্রমে দিনাতিপাত তখন কবি সুকান্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলিষ্ঠ চেতনা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ঐতিহাসিক বার্তা। শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নেতিবাচক ক্রোধ বা বিক্ষোভ নয়, সৃষ্টির ইতিবাচক উদ্যোগ তাঁর বলিষ্ঠ বাহুতে, সুতীক্ষ্ণ চেতনায় জীবনের জয়গান। শ্রমশক্তির ছন্দিত রূপায়ণে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উদ্বোধন।

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এই বার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
... ...
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি?
(গোপন একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
... ...
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥ (কৃষকের গান)

মন্বন্তরের দুঃসহ স্মৃতি ভুলে থাকা যায় না কেননা 'গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন, / পথে প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন' তথাপি কবির নিশ্চিত আশা :

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—

পৌষ পার্বণে প্রাণ কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।

(এই নবান্নে)

দুর্দশা ও হতাশার আলেখ্য রচনায় হয়তো মানবতাবাদী কবির দায়িত্ব ফুরোয় কিন্তু তিনিই বিপ্লবী কবি যিনি মানুষকে দুঃখময় জীবন অতিক্রমণের মন্ত্র শোনাতে পারেন, স্বশক্তিতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন, প্রাণে আশাবাদ জাগাতে পারেন। সে কবিতা আপাত দৃষ্টিতে স্বপ্নময় বা romantic মনে হলেও তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (socialist realism)। কবি সুকান্ত 'চিরদিনের' কবিতায় গ্রাম জীবনের সেই মিষ্টি মধুর ছবি এঁকেছেন—যে ছবি আপাত বাস্তব হয়তো নয় তবুও আকাঙ্ক্ষিত। এমন এক সার্থক কবিতা চল্লিশের দশকে বিরল দৃষ্ট। মন্বন্তর বিপর্যয় এনেছে কিন্তু পারে নি গ্রামের মানুষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করতে। অপরাজেয় মানুষ আবার ধীরে ধীরে ফিরে গেছে তাদের জীবনে, শুরু হয়েছে নতুন করে ঘর গোছানো, সকাল সন্ধ্যের কর্মব্যস্ততা। এমন এক গ্রামের মমতাময় আন্তরিক ছবি এঁকেছেন কবি সুকান্ত স্বল্প কয়েকটি আঁচড়ে, গাঢ় কোন রঙ ব্যবহার করেন নি, কিন্তু প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। অনাড়ম্বর শব্দ ব্যবহারে ছন্দের মৃদু মন্দ দোলা ও সঙ্গীত-ময়তায় ও ভাবের সরলতায় এ কবিতা অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। এক 'বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ে' কবি পথ হাঁটছেন যেখানে পথ নেই তবে 'সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে।' 'পচা জল আর মশায়' আকীর্ণ, পাশ দিয়ে যার বয়ে গেছে মজা নদী সেই গাঁও আজ 'নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।' স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে সেখানে রাত্রি আসে, আল পথ বেয়ে কিষাণ ঘরে ফেরে। তারপর 'বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে / সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত'। অপূর্ব কাব্যিক ব্যবহারে কবি বুঝিয়ে দিলেন শ্রমক্লান্ত মানুষ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে গ্রামের বট-তলায় বসে পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে নিজেদের মতামত গড়ে তোলে—'সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।" দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে গ্রামের মানুষ কাজ করছে, কৃষক বঁধূরা ধান ভানছে। অন্ধকার দাওয়ায় বসে 'ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে, / কেমন করে সে আকালেতে গতবারে / চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।' সেই গাঁয়ে আজ বাঁচার সমারোহ, মানুষের শ্রমে আর স্বেদে সুবর্ণ যুগের ইশারা।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে জোটে,

সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনমতে
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে ॥ (চিরদিনের)

বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ের গাথা কাব্য রচনায় কবি শেষ চার পঙক্তিতে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন তা তুলনাহীন। বিগত দুর্ভিক্ষের বছরে কত কৃষক-বধূ পেটের জ্বালায় স্বামী পুত্র হারা হয়ে গ্রাম থেকে শহরের পথে হারিয়ে গেছে, 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'তে পরিণত হয়েছে, আর আজ এক কৃষকবধূ জল আনার এক চিলতে অবকাশে বাইরের পৃথিবীর দিকে এক পলক তাকিয়ে বিস্মিত, পুলকিত—সামনে তার আশা ভরসা—সবুজ ফসলে সুবর্ণযুগের পদধ্বনি। কৃষক রমনীর ডাগর চোখে যে সুবর্ণযুগের আলপনা কবি আঁকলেন তা যুগ-সত্য না হলেও যুগ-সম্ভাবিত সত্য। শ্রমজীবী মানুষের বলিষ্ঠ বাহুর এই সৃষ্টিই পারে সাধারণ বঞ্চিত মানুষের জীবনে সুবর্ণ যুগ নিয়ে আসতে। কিন্তু সবুজ ফসল ফলালেই হবে না তাকে রক্ষা করতে, সুবর্ণ যুগকে বাস্তব করে তুলতে গেলে দিতে হয় রক্ত, লড়তে হয় অনেক লড়াই। দুর্মদ সেই বাংলা দেশের প্রতি কবির গভীর আস্থা।

গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।

'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়:
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ॥ (দুর্মর)

সুকান্তর এই বাংলা দেশ আজও লড়াই করে চলেছে স্বর্ণযুগ সম্ভাবিত করবার উদ্দেশ্যে, মৃত্যুর ভয় সে জানে না। অনেক আগুনে সে জ্বলেছে, আবার জ্বালিয়েছেও অনেক আগুন। এ বাংলাদেশ অগ্নিশুদ্ধ ইস্পাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংগ্রামের দিন পঞ্জিকা : সুকান্ত কবিতা

ঐতিহাসিক বিচারে মানব সমাজ কতকগুলো স্তরে ক্রমবিকশিত। আদিম যুগ, সামন্ত যুগ, ধনতন্ত্রের যুগ, সমাজতন্ত্রের যুগ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত যুগ ও কালের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেখানে শিল্পী সাহিত্যিকদেরও কিছু না কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। কেননা সামাজিক সত্তাতেই স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাঁর চিন্তা চেতনা কল্পনা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে নিয়ন্ত্রিত হয়। কবি তাই যে কথার মালা সাজান, ভাবের সংসার রচনা করেন তা অভিজ্ঞতার সাজঘর থেকে বাছাই করা। কবির শিল্পকর্ম স্বকীয় ব্যাপার হলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন নন। সমাজের অন্তঃস্থিত ঘাত প্রতিঘাতে তিনি সর্বদাই দোলায়িত।

শিল্প-সাহিত্য সমাজের শ্রেণী চৈতন্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। যে আলোক প্রতিমা রচিত হয় শিল্প সাহিত্যের চিক্কণ প্রতিফলনে তার অবয়বের অন্তর্লোকে প্রবাহিত হয় মানবধারার কলকল্লোল, ধমনীতে শ্রেণীর পদধ্বনি, চৈতন্যে সংগ্রামের কণ্ঠ। এ কণ্ঠ কার? মানুষের। কোন মানুষের? শ্রেণী মানুষের। শ্রেণী বিষম রাষ্ট্রে শিল্প-সাহিত্যের ধারাও দ্বিস্তর। একটি রাষ্ট্রের অনুগামী, অন্যটি জনতার আশ্রয়ে। এ বন্ধন দার্শনিক সম্পর্কের বন্ধন। যে দার্শনিক সম্পর্ক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রন করে, অর্থনীতিকে শাসন করে, মানব ও সমাজকে ভিন্নমুখী শ্রেণীতে বিন্যাস করে, শিল্প-সাহিত্য তারই জো-হুজুর। তাই শিল্প সাহিত্যের সমস্যা দার্শনিক সমস্যা, সাহিত্যের সংগ্রাম দর্শনের সংগ্রাম, সাহিত্যের বিদ্রোহ দর্শনের জগতে ঘূর্ণি ঝড়, সাহিত্যের রূপান্তর দর্শনের বিপ্লব।

কবি সুকান্ত হলেন এই দার্শনিক সংগ্রামের অন্যতম ঋত্বিক। তাঁর যুগ ও কালের দার্শনিক সংগ্রাম, জীবনের লড়াই তাঁর কাব্যে সাজানো রয়েছে থরে বিথরে। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন সে যুগটা হল সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ী ভূমির উপর নবোদ্ভূত ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার যুগ। সামন্ততন্ত্র ভাঙছে কিন্তু তার শিকড় তখনও বেশ দৃঢ়, পাশা পাশি ধনতন্ত্রও জাঁকিয়ে বসতে চাইছে, তাকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। এর উপর রয়েছে দুশো বছরের ব্রিটিশের দেওয়া পরাধীনতা। সুতরাং এই রাজনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একজন সমাজ-সচেতন লেখকের কাছে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমান

গুরুত্বপূর্ণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান, দ্বন্দ্ব, এবং কোন্ শ্রেণীটি বিকাশমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধ্যানধারণা নিয়ে সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হওয়া। সুকান্তর সৃষ্টি কালের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ও তার বিরুদ্ধে লড়াই। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে সুকান্তর ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই সমগ্র যুগের সংগ্রামের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সাহিত্য সমালোচক রালফ ফক্স বলেছেন :

Man today is compelled to fight against the objective, external horrors accompanying the collapse of our social system, against fascism, against war, unemployment, thedecay of agriculture, against the domination of machine, but he was also to fight against the subjective reflection of all these things in his own mind. He must fight to change the world to rescue civilization and he must fight also against the anarchy of capitalism in the human spirit." (Novel and the People)

এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুকান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কাব্যের আয়ুধ হাতে নিয়ে। বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি জানানোর সূচনা সাহিত্যে বহুপূর্বেই ঘটেছিল। এক ধরণের লেখক আছেন যাঁরা শোষিত শ্রেণীর সচেতন পক্ষপাতী না হয়েও মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনার ছবি আঁকেন, দরদ দিয়েই আঁকেন। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। প্রথমে সেবা মূলক মনোভাব নিয়েই মজুর কৃষকের মঙ্গল প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল দেশে দেশে, কিন্তু অচিরেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে বঞ্চিত মানুষের মঙ্গল করা যায় না। তার জন্য সমাজটা বদলের প্রয়োজন এবং তা শোষিত মানুষের সপক্ষে। আর এই সমাজ বদলের কুশীলব অগণিত শোষিত মানুষ। কিন্তু সমাজ বদল ব্যাপারটা সহজ নয়, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি। শ্রেণী সচেতন লেখক সমাজবদলের এই বিশাল কর্মকাণ্ডে সংগ্রামী মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক মহলের বিরুদ্ধে কবিতায় কামান দাগেন। আর প্রতিক্রিয়ার দুর্গের ধ্বংসসাধনে এই সাহিত্যিক আক্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। কবি সুকান্ত তাঁর সমকালের এই মুক্তি সংগ্রামের অগ্রচারী সৈনিক। তাঁর কাব্যের এক একটি গোলায় যেমন দোদুল্যমান মানুষের চেতনা হয়েছে তীক্ষ্ণ, বুকে ফিরিয়ে দিয়েছে সাহস তেমনি প্রতিক্রিয়ার দুর্গে সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক। সমকালীন প্রতিটি সংগ্রামের ঘটনা

তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত, সংগ্রামী মানুষের বীরত্ব তিনি মহিমান্বিত করেছেন তাঁর লেখনীতে।

আশ্চর্য এক স্বচ্ছদৃষ্টি লাভ করেছিলেন সুকান্ত অতিকৈশোরে। তাঁর যুগের অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-কামীতার দ্বন্দ্ব তাঁর কাব্যে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে তবে ভাবোন্মাদ উগ্রজাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিতে নয়। তিনি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ৪৫-৪৬ সালে মিথ্যা কুৎসার অন্ত ছিল না—"আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,/অনেকে বিরূপ, কানে দেয় হাত চাপা,/তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা?" তবে কবির স্থির বিশ্বাস একদিন এই মিথ্যার কুহক জাল ছিন্ন হয়ে যাবে কমিউনিস্ট-দের সততা ও রাজনৈতিক মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হবে। ততদিন প্রাণ দিতে কমিউনিস্টরা কুণ্ঠিত নয়। কবির ভাষায়:

কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ॥ (বিক্ষোভ)

সেকালে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচার ছিল 'জন যুদ্ধ'-এর শ্লোগানের আড়ালে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে যেতে চাইছে। কবি সুকান্ত এর জবাব দিয়েছেন 'দিন বদলের পালা' কবিতার শেষ তিন পঙক্তিতে। যুদ্ধ শেষ-এবং এর বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব বা জয়মালা তিনি মিত্রপক্ষের শরিকদের দিতে চান না। ব্রিটিশের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন:

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা:
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এই জয় মালা;
জানো না এখানে যুদ্ধ—শুরু দিন বদলের পালা॥

এই দিন বদলের পালার সার্থক কবি সুকান্ত। আর এই দিন বদল নিরুপদ্রবে শান্ত গৃহকোণ থেকে হয় না—এর জন্য চাই ভাঙার উদ্যোগ। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মতই সুকান্ত বন্দনা করেছেন যৌবনের, কেননা 'জরাগ্রস্ত সভ্যতার হৃৎপিণ্ড জর্জর, / ক্ষুৎপিপাসা চক্ষু মেলে / মরণের উপসর্গ যেন।' তাই তাঁর আহ্বান:

নেমে এসো—হে ফাল্গুনী,
বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
ক্লান্ত ভুবাহু তব লৌহময় হোক
বয়ে যাক শোণিতের মন্দাকিনী স্রোত ;
মুমূর্ষু পৃথিবী উষ্ণ, নিত্য তৃষাতুরা,
নির্বাপিত আগ্নেয় পর্বত
ফিরে চায় অনর্গল বিলুপ্ত আতপ।" (সব্যসাচী)

কবি যৌবনের উপাসক কেননা তাঁর 'নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে', মোহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। যুগ যুগ বিস্তৃত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন যতবার পৃথিবীতে গড়ার চেষ্টা হয়েছে ততবার 'উদ্ধত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।' সুতরাং অন্যায়ের সেই দুর্গ আজ ভাঙতেই হবে নতুবা সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হবে, নতুন শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যাবে না—আপোষের পথে, সংস্কারবাদের পথে তা সম্ভব নয়। তাই কবি সুকান্তর কণ্ঠে ভাঙার গান :

আজকে ভাঙাব স্বপ্ন,—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙাব,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
তাই তো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধ বন্দী কক্ষ ভেঙে মেলে দিই আকাশের নীল।
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে॥

(অনন্যোপায়)

যুদ্ধ শেষে পরাধীন ভারতবর্ষে শুরু হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে স্বাধীনতা আন্দোলন। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মহামারী, মজুতদারী ও কালো-বাজারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিমধ্যেই এক গণ-ভিত্তি লাভ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এই গণ প্রতিরোধ সংগঠিত করে এক জঙ্গী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল। কিন্তু কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জনগণের এই মেজাজকে উপেক্ষা করে এ্যান্টনি ওয়াভেলের আপোষ-নীতিকেই স্বাধীনতা লাভের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই নির্বীর্য আপোষ-পন্থার প্রতি বিদ্রূপ করেই বোধ করি সুকান্ত 'মীমাংসা' কবিতায় বলেছিলেন :

ভাঙাচোরা এক তলোয়ার আছে, (নয় দুধারী)
তাও হ'ত তবে পক্ষীরাজেরই অভাব ভারি।
তাই ভাবি আজ, তবে আমি খুঁজে নেব কৌপীন
নেব কয়েকটা বেছে জানা জানা বুলি সৌখীন ॥

ইতিমধ্যে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নেতা শাহ্‌নওয়াজ খান, সায়গল, ধীলন প্রমুখ নেতার বিচার শুরু হয়। রাজনীতিতে নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলার যুব সমাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ল। কবি সুকান্ত তখন প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী। যেখানে মানুষের দুঃখকষ্ট, আর্তি, যেখানে সংগ্রাম আন্দোলন সেখানেই সুকান্ত মানুষের পাশে উপস্থিত। মারী ও মন্বন্তরে কলকাতায় যখন হাহাকার, মৃত্যুর মিছিল, তখন তিনি সারাদিন সেবা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর ধর্মতলায় যে মিছিল হয় তিনি তখন তাতে সামিল। লাঠি, গুলি, বেয়নেটকে উপেক্ষা করে ছাত্রসমাজের জঙ্গী বিক্ষোভ সমাবেশের উপর ইংরেজ পুলিশ গুলি চালায়। সুকান্ত সে সময় শহীদ রামেশ্বর ও আবদুস সালামের পাশে। পরবর্তী দু'দিন সারা কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে অভিনন্দন না জানিয়ে কমিউনিস্টদের উস্কানি ও গুণ্ডামি বলে অভিহিত করে এক ঘৃণিত ভূমিকা নিলেন। হাজার হাজার মানুষের এই দুর্বার স্রোতের মুখে, রক্ত ঢালা কলকাতার বুকে, শহীদের নিহত শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে কবি সুকান্তর জঙ্গীকাব্য :

মুখে-মৃদু-হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের। (ডাক)

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের তথাকথিত অহিংস রাজনীতির অজুহাতে জনগণের এই দুর্বার তরঙ্গকে গুণ্ডামি বলে আখ্যা দেওয়ার মধ্যে যে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তার বিরুদ্ধে প্রশ্নের আকারে কবি আহ্বান জানিয়েছেন :

হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল ?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল ;
তুমি কোন দলে ? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
'গুণ্ডা'র দলে আজো লেখাও নি নাম ? (ডাক)

সারা দেশব্যাপী ছাত্রযুবদের এই রক্তঝরা আন্দোলনের পটভূমিতেই ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত প্রমুখ এসেছিলেন সম্মেলনে যোগ দিতে। ছাত্র নেতা অন্নদা ভট্টাচার্য সুকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন কবিতা লিখে এনেছেন কিনা। কেননা সুকান্তর কবিতা দিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল। সুকান্ত ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলেন 'হবে।' তারপর মঞ্চের পিছনে বসে লিখে ফেললেন কবিতা 'ঠিকানা'। সম্মেলনের প্রাঙ্গণে জনৈক প্রতিনিধি তাঁর ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন সেই সূত্র ধরেই কবিতা সৃষ্টি হল। সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল ঢোল বাজিয়ে গান ধরলেন :

> "তোমরা শুনছনি খবর ?
> গুলি কইবা মানুষ মারে কইলকাতা শহর।" ইত্যাদি।

তারপর আবৃত্তি করা হল 'ঠিকানা'। আবৃত্তি শেষ হতে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হান। 'ঠিকানা'র সমতুল কবিতা দুর্লভ। এখানে কবি দৈনন্দিন সংগ্রামের লিপিকার, কালজ্ঞ পুরুষ এবং সংগ্রামী চেতনার একজন সতর্ক সচেতক। এ কবিতায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের মুক্তির লড়াই। কবি এখানে স্বদেশী, আবার সমভাবে আন্তর্জাতিক। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে লড়াই সেখানেই কবির মর্ম-উপস্থিতি। সর্বহারার বিপ্লবের ব্রতধর কর্মীর ঘরই বা কি, দেশই বা কোথায়। তিনি যেন পূর্ত বিভাগের কর্মী, চারদেওয়ালের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন কর্মক্ষেত্র নেই যেখানেই নির্মাণের কাজ সেখানেই তাঁর উপস্থিতি। "আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি/হাজার জনতা যেখানে, সেখানে আমি প্রতিদিন ঘুরি,"—এই যাযাবরতা ভ্রাম্যমাণতা নয় বা বোহেমিয়ানের নয়, বিশ্ববিপ্লবীর। এ লেনিন, স্তালিন, মাও সে তুঙ, হো-চি-মিন, চেগুয়েভারা প্রমুখ বিশ্ব পথিকের প্রসারিত শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার চেতনার যথার্থ অনুসরণ। দেশ কালের সীমানা প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়, সামান্য খড়ির গণ্ডী। এই আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক চেতনা থেকেই কবি বলতে পারেন :

> আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
> সূর্যোদয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া,
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে। (ঠিকানা)

আশ্চর্য দক্ষতায় কবি ফ্যাসিবাদ ও বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমন্বিত করেছেন। একমাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীরাই বুঝতে চান না আজকের দুনিয়ায় কোন দেশেরই মুক্তি সংগ্রাম একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, তার আন্তর্জাতিক সাপেক্ষতা রয়েছে। এই চেতনার অভাব ঘটলেই পথ ভুল হয়, দেখা দেয় সংকীর্ণতা, জন্ম নেয় উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নানা ভেদবিভেদ। আর এই সব ঐক্য বিরোধী প্রবণতাই খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে, অনৈক্যের ফাটল ধরেই দেশী বিদেশী শোষক-শাসকদের আক্রমণ বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বুকে মানুষ গণবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রাম নগর জনপদ! তাই কবি ছাত্র সম্মেলনে উপস্থিত কর্মী ও নেতাদের সতর্ক করে দিলেন :

বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে,
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি একা ভুল করে।
বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল। (ঠিকানা)

সুতরাং পরিস্থিতি যখন অনুকূল, পরিবেশ যখন প্রস্তুত, এমনকি নীড়ের পাখির মনে, নদীর শান্ত বুকেও যখন অস্থিরতা, সমুদ্রের চঞ্চলতা, তখন পথ ও লক্ষ্য সম্পর্কে, গন্তব্যস্থলের নিশানা ও ঠিকানা নির্ধারণে ভুল ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। ঠিকানা তো নির্দেশিতই আছে :

জালিয়ানওলায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,

দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে। (ঠিকানা)

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালায়, চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ও ১৯৪৫ সালের ধর্মতলার পথে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলে আসছে সে পথেই এগুতে হবে লক্ষ্যের দিকে, স্বদেশের মুক্তি অর্জনের দিকে।

১৯৪৬ সালের প্রারম্ভেই ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আই এন. এ. সেনাপতি আবদুর রশীদের দণ্ড মকুবের দাবীতে ব্রিটিশের অত্যাচারের মুখোমুখি কয়েকদিনের জন্য কলকাতার মানুষ জীবনযাত্রা অচল করে দেয়। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) শহীদ সুরাবর্দীও বাধ্য হলেন জনতার এই রোষের মুখে মিছিলে এগিয়ে আসতে। ঐ মাসের শেষেই বোম্বাই ও করাচী বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং কামানের গোলা ঘুরিয়ে দিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শোষণের ভিত্তিমূলে। ২৯শে জুলাই শুরু হয়ে গেল সারাভারতব্যাপী ডাক ও তার ধর্মঘট। স্তব্ধ হয়ে গেল পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ধর্মঘটের সমর্থনে সারা দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এ এক নতুন ঢেউ বাঙলার বুকে, ভারতবর্ষের জলেস্থলে। সূচনা হল সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের—বাংলার লেখক শিল্পীরা এই মহালগ্নে নির্বিকার থাকেন নি। বরং সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে লেখনী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন লড়াকু মানুষের পাশে। '৪৫-৪৬-এর রক্ত রাঙা দিনগুলি জীবন্ত হয়ে আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' ও তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসে, গোপাল হালদার, সুশীল জানা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে।

বিশেষ করে বন্দী মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য সেকালে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সুমহান কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে। ইতিপূর্বে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের পর্বে অন্যতম অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক যোদ্ধা সুধী প্রধান ১৯৪২ সালের ১লা মে সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'বন্দী মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে বন্দী মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে শ্রী প্রধান লেখেন :

"আমরা ইংরেজ ধনীদের শোষণ ও শাসনের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই। উহার জন্য যে-কোনো প্রকারের দুঃখ সহিতে আমরা

পেছপাও হইব না। ইংরেজ ধনীদের হাতে যে অনেক জ্বালা আমরা সহিয়াছি সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই নাই এবং কোনো দিন ভুলিবও না। কিন্তু নিজেদের নাক কাটিয়া ইংরেজ ধনীদের যাত্রাও আমরা ভাঙিতে চাই না। জাপানের নিকট ভারতবর্ষকে বেচিয়া দিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। কাজেই আমাদেব এই অতি আদবের দেশকে আমরা পশু ও বর্বর জাপানের দখলে যাইতে দিতে পারি না। আমরা আমাদের সকল শক্তি দিয়া জাপানেব বিরুদ্ধে লডিব। তাহারই জন্য আজ আমরা আমাদের মজুর ও কৃষক নেতাদের ফিরাইয়া চাই, আর ফিরাইযা চাই আমাদের দেশ প্রেমিকদের।

'৪২ এর রাজনৈতিক পরিবেশ, ৪৬-এ অনেকটা পরিবর্তন হলেও গুণগত ভাবে একই পর্যায়ে ছিল। বিশেষ করে বন্দী মুক্তির প্রশ্নটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী লডাইয়েব শেসে আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। শুধু কমিউনিস্ট বন্দীদেব মুক্তি নয়, সর্বস্তবেব বন্দীদেব মুক্তির প্রশ্নেই বাংলাদেশ উত্তাল সমুদ্র। কবি সুকান্তব ভাষায়:

> ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়!
> নিদ্রায়, কাজকর্মের ফাঁকে
> ওরা দিন রাত আমাদের ডাকে
> ওদের ফিরাব কবে?
> কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
> কোটি মানুষের দুর্বার চাপে
> শৃঙ্খল গত হবে?
> কবে আমাদের প্রাণ কোলাহলে
> কোটি জনতার জোয়ারের জলে
> ভেসে যাবে কাবাগাব! (জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী)

কোটি জনতার জঙ্গী ঐক্য বিধান তখন কমিউনিস্ট পার্টির সামানে লক্ষ্য। প্রগতি সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনেব কর্মীরাও সে কাজে এগিয়ে এসেছেন। '১লা মে-র কবিতা ৪৬'-এ কবি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে জনগণকে ঐক্যের পবিত্র শপথে উদ্দীপিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভয় ভীতি ক্লীবতার কোন অবকাশ নেই, নতুন জোয়ার এসেছে বশ্যতাকে অস্বীকার করতে হবে-দুশো বছরের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে

হবে। তার জন্য চাই অদম্য মনোবল, অসীম সাহস, সিংহের শক্তি। কেননা সমগ্র বিশ্বে লাল রক্তে লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কবির ভাষায় তাই তীব্র শ্লেষ, তীব্র অঙ্কুশ :

লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে ?
... ...
তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥ (১লা মে-র কবিতা ৪৬)

শুধু ভীরুতার অবসান নয়, নামতে হবে সংগ্রামের ময়দানে, সামিল হতে হবে বিদ্রোহে। কেননা সময়ের ঘড়ি বেজে উঠেছে চতুর্দিকে। গৃহ কোণে আবদ্ধ থাকার লজ্জা নয়, মুমূর্ঠো দাক্ষিণ্যের অন্ন নয় এমন কি আপোষের পথে খ্যাতির পথ সন্ধানও নয় কবি সুকান্ত চান মৃত্যুপণ লড়াই। কবির লেখনী মুখে উৎসারিত জন্নীকাব্য, অগ্নিগর্ভ বানী—

মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার ?

রুটি দেবে নাকো ? দেবে না অন্ন
এলড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন ?
চোখ রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,

ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খল দড়ি,
মৃত্যুপণ।

দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্ব কোণ। (বিদ্রোহের গান)

১৯৪০ সালে যে কবি ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভূত হয়ে হিসেবের খাতায় শুধু 'রক্ত খরচ'ই দেখেছেন, 'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু' পেয়েছেন সেই কবিই ১৯৪৬-এ পৌঁছেছেন সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভবে। কলকাতার পথে পথে, বস্তিতে বস্তিতে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে পথ যুদ্ধ, ১৯৪৬-এর জুন জুলাইতে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট, ডাক ও তার ধর্মঘট কেন্দ্রিক বারবার সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র নৌ বাহিনীর বিদ্রোহ, বিভিন্ন স্থানে পুলিশী ধর্মঘট ও হরতাল প্রভৃতি ঘটনা স্বাধীনতা যুদ্ধের চারণ কবি সুকান্তের সৃষ্টিশালায় একের পর এক সাক্ষর রেখে গেছে। তারই দিন পঞ্জিকা রচনা করেছেন কবি :

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ ;
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে। (অনুভব)

বিদ্রোহ ধর্মঘটে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার এসেছে ঠিকই কিন্তু তার পরিণতিমুখী গতি অবাধ ছিল না। নীচের স্তরে কংগ্রেস মুসলীম লীগ কমিউনিস্ট কর্মীদের

ঐক্য সৃষ্টি হলেও নেতৃমহলে ঐক্য ছিল না। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। উভয় দলের নেতারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক চালাতে থাকেন। ইংরেজ সরকার এই অনৈক্যের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে থাকে।

নৌবিদ্রোহ এবং তার সমর্থনে সারাভারতব্যাপী আন্দোলন ধর্মঘটের জোয়ার বিশেষ করে সাধারণ মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত করেছিল। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও জঙ্গী স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে জনগণের অংশ গ্রহণে। পুরণো পথ বাতিল, নতুন পথে মানুষের স্বপ্ন নিয়ে মিছিল। সুকান্তর ভাষায় :

> কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল,
> মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই দোলে মিছিল।
> দুঃখ-যুগের ধারায় ধারায়
> যারা আনে প্রাণ, যারা তা হারায়
> তারাই ভরিয়ে তুলেছে সাড়ায় হৃদয়-বিল।
> তারাই এসেছে মিছিলে, আজকে চলে মিছিল ॥ (আমরা এসেছি)

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত কবিতা 'একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬'-এ কবি বিগত এক বছরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম স্মরণ করে আরও দুর্বার সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ যে ইংরেজ গ্রহণ করছে কবি সে বিষয়েও সচেতন—'এক পা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর/আমরা করেছি পণ/ঠকে শিখলাম/তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন।' কবির কণ্ঠে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা—'বিদেশী কুকুর! আবার এসেছে একুশে নভেম্বর।' হতাশার কোন অবকাশ নেই, কবির বিশ্বাস আবার অনৈক্য দূর হয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মিল হবে, আর সে মিল সৃষ্টি করবে জনগণের সংগ্রাম। সেই পরম আত্মবিশ্বাসে কবির প্রত্যয়ী ঘোষণা :

> আবার আসছে তেরোই ফেব্রুয়ারী,
> দাঁতে দাঁত চেপে
> হাতে হাত চেপে
> উদ্যত সারি সারি,
> কিছু না হলেও আবার আমরা
> রক্ত দিতে তো পারি ?

পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারি।
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি ॥

(একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬)

নৌবিদ্রোহ সমগ্র বোম্বাই শহরকে মাতিয়ে তুলেছিল। শহরের শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট করায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নিদারুণ অত্যাচার চালায় এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ফলে কয়েকশত মানুষের মৃত্যু হয়। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রমজীবী জনগণ যখন বিদ্রোহী নৌসেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই ব্রিটিশের সহায়তায় এগিয়ে এল। রজনী পাম দত্ত লিখেছেন :

But now when the masses were really in movement, when Hindu-Muslim Unity was being realised and practised, when the armed forces had united with the civilian population in the common national movement and when the real struggle for freedom had opened the gates of British Rule, the attitude of the upper leadership of the national movement revealed a marked change. The upper class leadership of the Congress and Muslim League found themselves in opposition to the mass movement and aligned with British imperialism as the representative of law and order against the people. A whole series of statements and denunciations were issued condemning the 'violence', not of the imperialist authorities whose ruthless firing had slaughtered hundreds in three days, but of the unarmed people who had been the objects of military firing."

(India To-day. P. 583-84)

কংগ্রেস মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ শুধু যে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের সমর্থনকারীদের বিরোধীতাই করেছিলেন তাই নয় বিদ্রোহ দমনে সরাসরি ব্রিটিশকে সাহায্য করেন। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ঘোষণা করেন :

"Strikes, hartals and defiance of temporary authority of the day are out of place. No immediate cause has arisen to join issue with the foreign rulers who are acting as caretakers."

(India To-Day. P. 584)

১৯২২ সালের চৌরিচৌরার জঙ্গী আন্দোলনের বিরোধীতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা যে বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা হয়েছিল এ ক্ষেত্রে তা এক লজ্জাজনক রূপ নিল। এতদিন তাঁরা যে ব্রিটিশকে অত্যাচারী বলে এসেছেন এখন তাকে care taker বলতে দ্বিধা করলেন না। দেশের বিভিন্ন স্থানে গণ আন্দোলনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মধ্যে এই বিদ্রোহ যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তা অধিকদূর অগ্রসর হতে পাবে নি। এমন এক পরিস্থিতিতে ইংরেজের বিভেদপন্থা কূট কৌশলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতপার্থক্যকে এত দূর বিস্তৃত করে দিল যার পরিণতিতে সম্প্রদায়গত দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। ভ্রাতৃঘাতী এই দাঙ্গায় রক্তের বন্যায় কলংকিত হল কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার মাটি। বাংলার মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক মানুষ এবং লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্বার গণসংগ্রামের মূল ভিত্তিভূমিতে পড়ল কুঠাবাঘাত। দাঙ্গার অন্ধকার দিনগুলির মানসিকতা কবি সুকান্ত ব্যক্ত করেছেন 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতায়। রাজ-বন্দীরা যখন মুক্ত হলেন দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তখন তাঁদের সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয় 'উত্তরা' প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে স্বতন্ত্র কোন অভিনন্দন পত্রের পরিবর্তে সুকান্তর এই কবিতা পড়েই অভিনন্দিত করা হয় মুক্ত বন্দীদের। এ কবিতা শুধু অন্তরেব উচ্ছ্বাস বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই নয়, কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মুক্ত বীরেরা এসেছেন 'যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।' কিন্তু সেদিনের অর্থাৎ বছরের শুরুর বন্দীমুক্তি আন্দোলনেব দিনগুলিতে 'হেঁট হয়েছিল অত্যাচারী ও দাম্ভিকের মাথা।' কিন্তু আজ ভিন্ন চিত্র, দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায় সেই ইংরেজরাই পরিত্রাতা। সরকারের সেনা বাহিনী টহল দিচ্ছে দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলিতে। দাঙ্গা বাধিয়ে দাঙ্গার পরিত্রাতা। কবির তাই যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি—'জানি বিকৃত আজকের কলকাতা / বৃটিশ এখানে জনত্রাতা।' মুক্ত বীবদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কবি লজ্জা বোধ করছেন, সংগ্রামের পীঠস্থান কলকাতা আজ অন্ধকারময়। এ ব্যর্থতার জন্য কবি ক্ষমা করেননি নিজেদের।

> গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—
> ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বাণ ;
> সে দিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্ খান্।
> দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙিন উত্তত ;

তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।

(মুক্ত বীরদের প্রতি)

কিন্তু বিপ্লবীরা কোন পরিস্থিতিতেই হতোদ্যম হন না। তাঁদের কাছে অন্ধকার নিতান্তই সাময়িক, বিভ্রান্তি কয়েক মুহূর্তের, বিভেদকামীতা শত্রুর চক্রান্ত। সুতরাং আবার আলো জ্বালাতে হবে, মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে হবে। মুক্তির শেষ দরজায় যে পৌঁছতেই হবে। বিপ্লবীর চেতনায় প্রতিটি সংগ্রামই এক একটি উৎসব এবং সে উৎসবে অনেক রক্ত দিতে হয়। আর রক্ত ও প্রাণের উৎসর্গ দানে বিপ্লবীরা কখনও ভীত নয়। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্গাতা ও বিপ্লবী শিক্ষার চারণ কবি সুকান্তর বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা—

আজ তোমাদের মুক্তি সভায় তোমাদের সম্মুখে,
শপথ নিলাম আমরা হাজার মুখে :
যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান,
আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।
অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।
তবুও আজকে ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,
তোমরা রয়েছ এদেশের নিঃশ্বাসে।

তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়,
উদ্দাম জয়যাত্রার পথে জেনো ও কিছুই নয়।
তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।
আবার জ্বালাব বাতি,
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষ যুদ্ধের সাথী।

(মুক্ত বীরদের প্রতি)

'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতায়ও দাঙ্গা কবলিত কলকাতার নিখুঁত বর্ণনা। শহর জীবন মূর্ছিত, সন্ধ্যা হলে গ্রামের মতো জনহীন হয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ, দোকান পাঠ বন্ধ, ট্রাম বাস নেই—এ শহরে শুধু আতঙ্ক। 'সারি সারি বাড়ী সব / মনে হয় কবরের মতো / মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে / চুপ করে সভয়ে নির্জনে।' মাঝে মাঝে শুধু মিলিটারী গাড়ী ও বুটের শব্দ। অসহ্য

এই আতঙ্ক ও নিস্তব্ধতার যন্ত্রণা ছাপিয়ে কবির কানে বাজে মিছিলের কোলাহল। কবির বিশ্বাস :

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥ (সেপ্টেম্বর '৪৬)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রেণী চেতনায় উদ্দীপ্ত কবিতা

"আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।" আঠারো বছর বয়সের কিশোর সুকান্ত একটি পত্রে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট কবি অর্থাৎ মার্কসবাদী। আমরা সকলেই জানি মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন খুব সহজ কাজ নয়। সমাজবিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান, প্রকৃতি ও ব্যক্তি মানসের বিকাশের তত্ত্ব, অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তিক কাঠামোর সাংস্কৃতিক উপরিতল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে মার্কসবাদের সত্যোপলব্ধি হয় না। এর জন্য যে পঠন-পাঠন, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন স্বল্পকালীন জীবনে সুকান্ত সে সুযোগ কতটুকুই বা পেয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি তা আয়ত্ত করেছিলেন শুধু তাই নয় নিপুনভাবে প্রয়োগও করেছিলেন। সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্বগুলিকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে স্বীয় অবস্থান নির্ধারণ করে সংগ্রামের বিকশমান ধারাটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। শোষিত মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত বিক্ষোভকে ছন্দে ভাষায় মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টির দর্পণে শুধু সমকালই প্রতিফলিত নয়, প্রতিফলিত সম্ভাব্য আগামীকালও। তাই বাঙলার আন্দোলন-সংগ্রাম-বিদ্রোহ-বিপ্লবময় ইতিহাস বহু প্রবীণ কবির সৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেছে নতুন যুগের নবীন কবি সুকান্তর ক্রমশ ব্যাপ্ত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর সৃষ্টিকে।

"সুকান্তর কাল ছিল সাম্রাজ্যবাদের পতনের কাল, সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার কাল। সুকান্তর কাল ছিল উপনিবেশের অন্তিম কাল, জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক রূপান্তরের কাল। ...সুকান্তর আগে জীবননিষ্ঠ বা কমিটেড কবিতা লেখা হয়নি, এমন নয়। সাম্যবাদকে স্বীকার করে, শ্রেণী সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে লেখা কবিতার অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু সুকান্তর বিস্ময়কর সার্থকতা ছিল অকল্পনীয়। সুকান্তর মধ্যে যুগের আশা ও স্বপ্ন, সফলতা আর ব্যর্থতা প্রতিবিম্বিত। এমন প্রতিভাস আর কারো ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়নি।" (কবি রাম বসু—আজকের কবিতা ও সুকান্ত)।

সৃষ্টির এই যুগান্তরতাই লেখকের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয় যা

কাল থেকে কালান্তরে পরিব্যাপ্ত। সুকান্ত কৈশোরেই সেই দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তাই সমকালের সমষ্টি চিন্তায় ভারাবনত হৃদয়ে সুগভীর দায়িত্ব-গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। 'ছাড়পত্র' কবিতা কবির সেই মহিমময় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানব সমাজে পুরনো ও নতুনের মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে, প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির মধ্যে দ্বন্দ্ব নিত্য ক্রিয়াশীল। আর সেই দ্বন্দ্বের সমাধান প্রাচীনের বিদায়ে নতুনের স্থান গ্রহণে, প্রতিক্রিয়ার অবসানে প্রগতির জয়যাত্রায়। প্রকৃতির রাজত্বে এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয় কিন্তু এখানে তৃতীয় শক্তির ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানব সমাজের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা থাকলেও ব্যক্তি বা সংগঠিত শক্তি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে' সে 'নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার / জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।' কবি কিন্তু শিশুর দুর্বোধ্য চীৎকারকে করুণা বা উপেক্ষা করেন নি কারণ তিনি নতুনের আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং নতুন কালের ভাষা বুঝতে পেরেছেন। নতুনকে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে মঞ্চ ছেড়ে দিতেই হবে। কবির ভাষায়:

> এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
> জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস-স্তূপ পিঠে
> চলে যেতে হবে আমাদের।

আশ্চর্য নির্বিকার বৈজ্ঞানিক চেতনা। স্বভূমির সংস্কার নিয়ে নতুনের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্বে কবি অবতীর্ণ হতে চান না বরং নতুনকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী। ত্রিকালজ্ঞ প্রবীণের এমন মুক্ত দৃষ্টি কৈশোরে তিনি কোন যাদুবলে অর্জন করলেন ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। নিজের জীবন, নিজের সমাজ, নিজের সংস্কার সম্পর্কে এতটুকু মমতা নেই, বিন্দুমাত্র পিছুটান নেই। বরং আছে আত্মদানের উদারতা, বৈপ্লবিক কর্তব্যবোধ।

> চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
> অবশেষে সব কাজ সেরে,
> আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
> করে যাব আশীর্বাদ,
> তারপর হব ইতিহাস।

নতুনের জন্য অবাধ বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জঞ্জালমুক্ত অর্থাৎ শোষণ নিপীড়নহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রাণপণ প্রয়াসের প্রতিশ্রুতি কবি ঘোষণা করেছেন। এযেন সংসার সীমান্তে সন্তান বৎসল পিতার এবং বৃহত্তর সমাজ-ক্ষেত্রে জাতির পিতার দায়িত্ববোধ। নবজাতকের অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের সুস্থ সুন্দর বিকাশের উপযুক্ত সমাজ গঠন তো ঐতিহাসিক দায়িত্ব, সে দায়িত্ব যিনি বা যে শক্তি পালন করতে পারেন তিনিই তো ইতিহাসের স্রষ্টা, ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনিই তো বলতে পারেন 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।'

কবি সুকান্তর এই সামাজিক দায়িত্ববোধদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আর এক সুমহান প্রকাশ 'আগামী' কবিতায়। একটি প্রাণময় সত্তার ভ্রূণাবস্থা থেকে আত্মপ্রকাশ পর্ব, আত্মপ্রকাশ পরবর্তী অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং সবশেষে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সীমানা পেরিয়ে বহুজনের সমাজে যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন—এই ক্রমান্বয় বিবর্তন কবিতার বিষয়বস্তু। 'জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ / আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ'। যদিও এই অঙ্কুর আজ তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে, কিন্তু সে শিখেছে বাঁচার কৌশল। তাই তার প্রত্যয় 'শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা' কিংবা 'আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে' অথবা 'ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি'। আত্মসুখে মগ্ন স্বার্থপর নয়, চারপাশের পৃথিবী থেকে সে পেয়েছে অনেক, তাই দিতেও চায় উদারভাবে :

> সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
> তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
> ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
> একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

সেদিন যারা কমিউনিস্ট কর্মীদের বিদেশী চর বা স্বদেশের মাটি থেকে ছিন্নমূল বলে কুৎসা প্রচার করেছিল, জানিনা হয়তো সুকান্ত এ কবিতায় তাদের ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে 'আমি' সুকান্ত নয় কমিউনিস্ট পার্টি বা নবীন সাম্যবাদী শক্তি। কবি বলতে চেয়েছেন এর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে এদেশেব মাটি ও জল, হাওয়ার একান্ত সম্পর্ক রয়েছে। শিকড়ে রয়েছে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামী মানুষের চেতনা ও শিক্ষা। সুতরাং এ শক্তির জয়যাত্রা অপ্রতিরোধ্য। কবি বলেছেন স্বশ্রেণীর মধ্যে যতই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হোক, আঘাত সংঘাত থাক, পার্টি সকলকেই আহ্বান জানাবে, দেবে সহায়তা।

কবি সুকান্তর শ্রেণী পক্ষপাতী চেতনার আরেকটি স্বার্থক কবিতা 'চারাগাছ'। বিরাট প্রাসাদের পাশেই কুঁড়েঘর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই বীভৎস বৈষম্যে স্বতই শ্রেণীরূপটি প্রতিভাত। কুঁড়েঘরের কবি দুচোখ মেলে প্রতিদিন দেখছেন সেই অট্টালিকা তবে বিস্ময় বা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নয়। তাঁর কাছে শ্রেণীবিষম সমাজের শোষণের চিত্রটি সুস্পষ্ট তাই অট্টালিকার কারিগরি বৈশিষ্ট বা ঐশ্বর্যে তিনি মুগ্ধ নন। এই বিশাল অট্টালিকার স্তরে স্তরে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করেছেন 'ঘামের রক্তের আর চোখের জলের' অজস্র কাহিনী। এই ক্ষুধিত পাষাণের স্তূপকেই লোকে সেলাম জানায়, বনেদি কীর্তির মহিমা কীর্তন করে।

ধনগর্বী সভ্যতার এই ঔদ্ধত্বের বিকট চেহারা কবির কাছে অসহনীয়। অজস্র সৃষ্টির মধ্যে কবি এর অবসানের আগমনী রচনা করেছেন। 'আগামী' কবিতায় অঙ্কুরিত বীজকে আবার তিনি প্রত্যক্ষ করলেন প্রাসাদের কার্ণিশের ধারে অস্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা অশ্বত্থ গাছের মধ্যে। চারাগাছের মধ্যে কবি আগামী বিপ্লবী শক্তির প্রতীকিত রূপ লক্ষ্য করেছেন।

> মনে হয়, এই সব অশথ-শিশুর
> রক্তের ঘামের আর চোখের জলের
> ধারায় ধারায় জন্ম,
> ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।

'আগ্নেয়গিরি', 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে নিপীড়িত সর্বহারা শক্তির প্রতিরোধ থেকে প্রতিহিংসা গ্রহণের বৈপ্লবিক স্তরে উন্নয়ন ঘটেছে। সিঁড়ি কবিতায় রয়েছে সতর্কীকরণ—'একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন' কিন্তু 'সিগারেট' ও 'দেশলাই কাঠি' প্রতিশোধ গ্রহণের কবিতা। এখানে মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাচিত্ততার লেশমাত্র নেই, রয়েছে শ্রেণী হিংসা। শোষণভিত্তিক সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থ ও শোষণ ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের দুর্নিবার ঘোষণা রয়েছে এই কবিতাগুলির মধ্যে। যেমন—

> (ক) আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
> বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি। (আগ্নেয়গিরি)

> (খ) আমরা বেরিয়ে পড়ব,
> সবাই একজোটে, একত্রে—
> তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে

জলন্ত আমরা ছিটকে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এত কাল ॥
(সিগারেট)

(খ) অস্ত্র ধরেছি এখন সম্মুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই, (প্রস্তুত)

শোষণভিত্তিক সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সুকান্ত কাব্যের অনন্যতা এই সব প্রতীকি কবিতাগুলির মধ্যে প্রতিভাত। যে শিল্পী পৃথিবীকে দেখেছে 'লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ' হিসেবে, 'তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যুপ্রবৃত্তি' যার শ্রেণী চরিত্র, তাকেই 'ফুটপাতে মুখ গুঁজে পড়ে' থাকতে দেখে কবির স্বস্তি। শিল্প সাহিত্যকে সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলাই সমাজ-সচেতন স্রষ্টার কাজ। এই মৌল দায়িত্বটি কবি সুকান্ত জীবনের স্বল্প পরিসরেও যথার্থভাবে পালন করেছিলেন, 'কলম' কবিতাটিতেও রয়েছে তার পরিচয়। কলমকে দাস্যতা পরিহার করে বিদ্রোহের ঝর্নাধারা প্রবাহিত করে দিতে কবির আহ্বান :

কলম ! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে ,
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে ॥ (কলম)

জীবনের পথে পথে নিত্যদৃষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে বহু অকাব্যিক রূপকল্প আশ্রয় করে কবি সুকান্ত এই সব সার্থক কবিতা উপহার দিয়েছেন। এই ধরণের শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে মাও-সে-তুঙ বলেছেন : "লেখক আর শিল্পীদের কাজ হল দৈনন্দিন ব্যাপারকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুসংযত ভাবে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে সেটাকে একটা ঘনীভূত রূপ দান করা। এমন সাহিত্য-শিল্পই জনগণকে সচকিত করে তুলতে পারে, তাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সংগঠিত সংগ্রামের মারফত নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা দিতে পারে।" (শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা—মাও সে তুঙ-পৃঃ ২৩)

যে সব নিত্য দেখা তুচ্ছগন্ধী বিষয় সাধারণ দৃষ্টিতে মূল্যহীন, স্থূল জীবনের উপকরণ সুকান্ত সেগুলিকেই প্রতীক রূপে ব্যবহার করে সমাজের অনিবার্য

দ্বন্দ্ব ও তার অমোঘ সত্যটি ব্যক্ত করেছেন। একটি মোরগের জীবন নিয়ে যে মানব সমাজে একটি সার্থক কবিতা হতে পারে তা বোধ হয় 'একটি মোরগের কাহিনী' পড়ার আগে ভাবা যেত না। সমাজের মুষ্টিমেয় একদলের সম্পদের অট্টহাস্য যে উগ্রভাবে ঘোষিত তাই নয়, বঞ্চিত নিপীড়িত বহুজনভাগ্যে সে যে কী নিদারুণ পরিণতি সৃষ্টি করে কবিতাটিতে তারই মর্মস্পর্শী অথচ সহজ সরল উপস্থাপনা। এ কবিতায় তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের আহ্বান বা প্রস্তুতি নেই। আছে সমাজের বলবান ধনিক শ্রেণীর লোভ ক্রুরতা ও প্রাণহীনতার শিকার একটি অসহায় প্রাণের কাহিনী। মোরগটির কোন আশ্রয় নেই, যেমন নেই ফুটপাতে পড়ে থাকা অসংখ্য মানুষের। একটি মস্ত প্রাসাদের এক কোণে প্যাকিং বাক্সের গাদায় সে একটু জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত আহার মিলল না।' প্রাণ যদি আছে আহার নেই কেন, সমাজের এই অনিয়মের বিরুদ্ধে "সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে / গলা ফাটাল সেই মোরগ / ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—/ তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।" সহানুভূতি জানায়না শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। তাই তার ভরসা আস্তাকুড়। কিন্তু সেখানেও প্রতিযোগী মানুষের মত কতকগুলি জীব, পরনে তাদের ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া। সেখানেও আহারের সংস্থান বেশী দিন হল না কিন্তু ক্ষুধা তো বন্ধ হয় না। তাই চলল খাবারের অনুসন্ধান। 'প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবার।' 'বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে/প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।' বাঁচায় তাগিদে মরিয়া মোরগ অবশেষে প্রাসাদে প্রবেশাধিকার পেল 'ধপ ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে / অবশ্য খাবার খেতে নয়—/ খাবার হিসেবে॥' মোরগ এখানে সমাজের কোটি কোটি অসহায় প্রাণের প্রতীক মাত্র—যে প্রাণগুলো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে শোষণের যাঁতাকলে। মোরগ মানুষের চিরকালের খাদ্য কিন্তু সেই খাদ্য-সংস্কারের ঊর্ধ্বায়ন ঘটিয়ে কবি মোরগটিকে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানবসমাজের মমতাময় প্রতিমা রূপে গড়ে তুলতে বিস্ময়কর ভাবে সফল হয়েছেন। এ কবিতা পাঠক হৃদয়ে শুধু সহানুভূতি বা মর্মস্পর্শীতা জাগ্রত করে তাই নয়, মোরগের জীবন কাহিনীর মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করে সমাজ ভাবনায়ও পাঠককে ভাবিত করবে।

'বোধন' সুকান্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিভিন্ন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "বোধন পঞ্চাশের মন্বন্তরের মহাকাব্য।" কবিতার শুরুতে কবি 'মহামানবকে' আহ্বান করেছেন

বাংলার মাটিতে যে বাংলা দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে ছিন্ন ভিন্ন, 'নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি।' সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সংকট মুক্তি করে জীবনশেষে রবীন্দ্রনাথ যে মহামানবের আগমনী গান রচনা করেছিলেন ফ্যাসিবাদের তাণ্ডব নৃত্য ও মন্বন্তরের করালগ্রাসে মূর্চ্ছিত বাংলায় দাঁড়িয়ে কবি সুকান্ত সেই মহামানবকেই জাগরণের মন্ত্রোচ্চারণে আবাহন করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ কবি নিছক মহাশক্তির বন্দনা করেন নি এই কবিতায়। কেননা তিনি জানেন সামাজিক মানুষের মিলিত শক্তি ছাড়া মধ্যবিত্তসুলভ নিশ্চেষ্টতা থেকে কোন মহাশক্তির উপর নির্ভর করা পলায়নপরতার নামান্তর। তাই তিনি সমালোচনায় কঠোর, কঠিন। নিপীড়িত মানুষের যুগযুগ ব্যাপী অন্যায়কে মেনে নেওয়ার অভ্যাস, পুরুষানুক্রমিক সহ্যশক্তি এবং পেটি-বুর্জোয়া ক্ষমাসুন্দর মনোভাবের সমালোচনা করেছেন—'ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের গ্রাস / তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।' অন্যায় অবিচারকে সহ্য করার মধ্য দিয়েই তা আরও বড় হয়ে ওঠে। বারবার কপালে করাঘাত করে বা অভিশাপ দিয়ে যখন বঞ্চিত মানুষ অনাহার ক্লিষ্ট প্রহর গোনে তখন 'তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি।'

কিন্তু নতুন কালের মুক্তি সংগ্রামের ব্রতধর কবি সুকান্ত নিজেই এগিয়ে এসেছেন মারণমন্ত্র নিয়ে 'দুনিয়াদার'দের মুখোমুখী :

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজাড় গ্রাম !
সুদে ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।

সাধারণ মানুষকে প্রতারিত, বিভ্রান্ত করাব জন্য শোষকদের ছড়িয়ে রাখা অজস্র লোভের সামগ্রী রয়েছে, রঙিন স্বপ্ন বিলাস আছে, আছে তথাকথিত সর্বমানবতার দর্শন। এ সবই যুগযুগ ধরে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার আগুনে জল সিঞ্চিত করেছে, ক্ষুধিত ক্লান্ত মানুষকে অলীক স্বপ্নে বিভোর করেছে, ভাগ্য, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী করে শোষণের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। তবে আর নয়। আর প্রতারিত হওয়া নয়। এবার ভূমিকা গৌতম বুদ্ধের নয়, বিপ্লবী লেনিনের—কেননা রুশ বিপ্লবোত্তর পৃথিবীর এটাই অমোঘ পথ নির্দেশ। কবির তাই জাগরণ মন্ত্র 'লোভের মাথায় পদাঘাত হানো / আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো।' গরীব মানুষের রক্তের কালিন্দী পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে কিন্তু এবার রক্তের ভাগীরথীর প্রাণ প্রবাহ বাংলার

অসংখ্য নির্জীব, মৃত, নির্বিকার সগর পুত্রের দেহে বৈপ্লবিক চেতনা এনে দেবে। তাদের হাতেই নির্ধারিত হবে শোষকশ্রেণীর ভবিষ্যত, রক্তের ঋণ রক্তেই শোধ হবে এবার। 'আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়' কেননা 'দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়।' কবির তাই সময়োচিত আহ্বান 'দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা।' প্রতিশোধের লড়াইয়ের সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজন হল বঞ্চিত মানুষের অগ্নিগর্ভ চেতনা ও সংহতি। কবির তাই ডাক :

> টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
> অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
> শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
> একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

এই বিদ্রোহের ভূমিকায়, কালান্তরের সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের প্রতি কবির ঘৃণা, তারা দেশদ্রোহী। ভারতবর্ষে তাদের স্থান নেই। নানা ভাব নানা ছন্দের এমন একত্র সমাবেশ সুকান্তব অন্য কবিতায় বিরল। কখনও ছবি এঁকেছেন, কখনও রুদ্র কণ্ঠে অভিশাপ হেনেছেন কখনও বা বজ্রকণ্ঠে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। গদ্যে পদ্যে মিলে এর কাঠামো গঠিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আবৃত্ত হতে হতে শ্বাসাঘাতের ধাক্কায় গতিবেগ লাভ করে তান প্রধানে সমাপ্ত। এ কবিতায় রয়েছে নানা ছন্দের তালফেরতার বৈচিত্র্য, কড়ি ও কোমল শব্দ ব্যবহার, ভাবের তারুণ্য ও সম্মোহন—আর এ সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আবৃত্তি-সফল বাংলা কাব্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ফসল।

'রানার' বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিতার অন্যতম। সলিল চৌধুরীর সুরারোপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হয়ে গান হিসেবে এটি এত জনপ্রিয় হয়েছে সুরের পোষাকে যে কবিতাটির পৃথক সত্তা প্রায় চাপা পড়ে গেছে। গ্রামের ডাক হরকরার জীবন নিয়ে যে এমন মর্মছোঁয়া অথচ দার্শনিক কবিতা রচিত হতে পারে বাংলা সাহিত্যে তা অভাবিত ছিল। গ্রামের রানারকে প্রত্যহ রাতে দীর্ঘপথ হেটে শহরে ডাক পৌছে দিয়ে আসতে হয়—বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ভোর হওয়ার আগেই পৌছান চাই। এ তার নিত্যনৈমিত্তিকতা। নির্জন রাতে খবরের বোঝা কাঁধে ছুটে চলার মধ্যে কবি শুধু একজন রানারকে দেখেন নি। সমাজের দায়িত্বভার কাঁধে বয়ে চলা সমগ্র শ্রমজীবী মানুষকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে সে সব হারিয়ে গেছে 'তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন।' কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ শত বঞ্চনা, শত হারানো স্বপ্নের বিনিময়েও সামাজিক

দায়িত্ব পালন করে—"এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে/পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রাণার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।" কিন্তু সমাজের এই সব পিলসুজের গার্হস্থ্য জীবনের খবর কেই বা রাখে অর্থাৎ পরশ্রমজীবী সমাজ অভিভাবকরা রাখে না। 'ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে', 'ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া। পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এ টাকাকে যাবে না ছোঁয়া'। বুদ্ধদেব বসু মশাই এই কবিতার অর্থ বা তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে মন্তব্য করেছেন, "সে কাঁদছে ডাকঘরের রানারের দুঃখে—'পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' (ছুতে পারলে কি ভালো হতো?" শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখতে শিখলে এই ধরনের অশ্রদ্ধেয় বক্রোক্তি সম্ভব। পিঠের থলির টাকা আত্মসাৎ করতে পারলেই রানারের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এমন কথা সুকান্ত বলতে চান নি—এটা বুদ্ধদেব বাবুর উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার বা উগ্র শ্রেণীবিদ্বেষের অন্ধতাজনিত উন্নাসিক স্থূলতা। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষ নিজের শ্রমশক্তিতে যে সম্পদ সৃষ্টি করে তাতে তার অধিকার নেই। তার শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যে মালিক ও ব্যবসায়ীরা যে মুনাফা করে তার শিকার শ্রমিককেই হতে হয়। যে মজুর সারাদিন মজুতদারের গোলায় ধান তুলে দেয় সেই দুবেলা দুমুঠো ভাত পায় না। যে কর্মচারী মালিকের গদীতে বসে সারাক্ষণ টাকা গোনে, সে-ই মাস গেলে যে বেতন পায় তাতে তার মাসের অর্ধেক দিনও চলে না। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই যে পরিহাস তা বুদ্ধদেব বাবুদের শ্রেণীর কাছে সামাজিক নিয়ম কিন্তু রানারদের কাছে নিদারুণ বঞ্চনা। সমগ্র সমাজের পটভূমিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের এই যে বৈপরীত্য তাই সুকান্ত প্রকাশ করেছেন এই ছন্দে। এ রানারের জীবনের হতাশা বা হতাশ্বাস নয়। কেননা সমাজের পালাবদল ঘটবেই, দুঃখের কালরাত্রি পেরিয়ে আলোর স্পর্শে নতুন জীবনের উদ্বোধন ঘটবেই—এ কবির বিশ্বাস। শোষণাবসানে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুপ্রভাতের বাণী রানার পৌঁছে দেবে। সেই তো নতুন দিনের বাণীবাহক—"পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে'।" নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই রানার আর সাধারণ ডাক-হরকরা নয়, সে অগ্রদূত—তার 'দুর্দম' গতিবেগ এখন স্বর্গের জগতের উদ্দেশে।

সৃষ্টির কাজে সুকান্তর সততা, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুশীলন ও পর্যালোচন প্রক্রিয়া তাঁকে ক্রমশ শ্রেণীপক্ষপাতী করে তুলেছে ফলে তাঁর সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিকর্মের সমস্ত রূপ রস গন্ধ নিয়োজিত হয়েছে সাধারণ মানুষ,

মজুর চাষী আর সমাজ-বিপ্লবীদের মহিমা বর্ণনায়। তাঁর স্বপ্নদৃষ্টিতে নতুন নতুনতর এক বিশ্ব বাস্তব হয়ে উঠেছে। কবিতার লাবণ্যময় শরীরে তিল তিল করে ডাকের সাজ পরিয়ে কবি সুকান্ত বাংলা কাব্যের জগতে এক নন্দনতাত্ত্বিক বিপ্লবের প্রস্তাবনা করেছেন। অনাগত ভাবীকালের পূর্ণতম সৌন্দর্যরূপ সৃষ্টির কাজে কবি নিজে কুশীলব কেননা বিশ্বজুড়ে তখন চলছে মুক্তির অগ্নিতপস্যা। ভারতবাসীর পক্ষেও আর দেরী করা চলে না - প্রস্তুত হতেই হবে—ইতিহাসের সেটাই গতি নির্দেশ। কবির কথায়ঃ

আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন॥ (ঐতিহাসিক)

এই পঙক্তিগুলির মধ্যে কোন কোন কাব্য সমালোচক শাশ্বতভাবের চিরন্তনতা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কবি আশ্চর্যজনকভাবে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক সূত্রের অনুসরণে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি ও সমাজ বিবর্তনের ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসবাদের এই দুরূহতত্ত্বের এমন কাব্যিক রূপায়ণ বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর ভাষায়ঃ "এখানে 'ধ্রুবনক্ষত্র' বলতে বোঝাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী প্রত্যয়; নদীর ধারায় গতির নির্দেশ' বলতে বোঝাচ্ছে ইতিহাসের অনন্ত প্রবহমানতা, 'অরণ্যের মর্মর ধ্বনি' বলতে বোঝাচ্ছে কবির নিজেরই কথায় 'আন্দোলনের ভাষা' অর্থাৎ শ্রেণী আন্দোলনের ভাষা, আর 'পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন' বলতে বোঝাচ্ছে ইতি-নেতি-সংস্থিতির কম্বুভঙ্গিমায় ইতিহাসের চিরজঙ্গমতা। অর্থাৎ মার্কসীয় ডায়লেকটিক্স তত্ত্বই এই কয়টি পঙক্তির মূল উপজীব্য। এর ভিতর ভাববাদীসুলভ 'চিরন্তনতা'র মহিমা আবিষ্কার করতে যাওয়া বৃথা।"

সামান্যকে অসামান্য করা, প্রচ্ছন্নকে ভাস্বর করা, কখনও বা প্রকটকে প্রচ্ছন্ন করে অধিকতর বাস্তব করা কবির কাজ। কবি মাত্রেই কল্পনাশ্রয়ী কিন্তু তিনিই মহৎ কবি যিনি কল্পনার উদ্ভটত্ব বর্জন করে বস্তু-সাপেক্ষ কল্পনা-লোকের দ্বার উন্মোচন করে দেন পাঠকের কাছে। বস্তুবিবর্জিত কল্পনালোকে সুকান্ত কোনদিন বিহার করেন নি। জীবন ও কাব্য তাঁর কাছে সমার্থক বিসম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবন যখন শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট তখন সেই রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত জীবনের বহিরঙ্গে চন্দনের পলেস্তারা লাগানোয় কবি

ছিল বিতৃষ্ণা। তাঁর কাছে কাব্য অবসর সময়ের বিলাস বা স্রষ্টার নৈরাজ্যিক লীলা নয়—তাই তথাকথিত পেলব কবিতাকে তিনি ছুটি দিয়েছেন—'পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার' মুছে দিয়ে 'গদ্যের কড়া হাতুড়িকে' আহ্বান জানিয়েছেন উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের জন্য। কারণ :

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

আজীবন সুকান্তর সামনে ছিল একটি দর্শন—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন এবং এক নেতা—কমিউনিস্ট পার্টি। আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং যৌবনের স্বভাবসুলভ উদ্যম ও সততা সুকান্তর ভাবনা ও সৃষ্টিতে কোথাও দোদুল্যমানতার অবকাশ রাখে নি। তাই পাঠক পেয়েছেন তাঁর কাব্যে সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং উজ্জ্বল ও অনুকূল ভাবীকালের আশ্বাস। বাংলা কাব্যে নজরুল যে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, সুকান্ত তার গায়ে সর্বহারা বিপ্লবের শীলমোহর অঙ্কিত করেছেন। তাই সুকান্ত-কাব্য সমকালের ভেলায় চেপে মহাকালের সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। যুগ ও সময়ের পট পরিবর্তনে, সংগ্রামের নিত্য নতুন ধারায় রাজনৈতিক পালাবদলের কোলাহলে তাঁর সৃষ্টি সঞ্জীবনী মন্ত্রে মানুষকে বেশী বেশী করে উজ্জীবিত করে চলেছে। সৃষ্টির এমন সার্থকতা মহৎ কবির রচনাতেই সম্ভব।

নবম পরিচ্ছেদ

গল্পলেখক সুকান্ত

চল্লিশের দশক সমগ্র বিশ্বের জীবনে এক ঘটনাবহুল ও দ্রুত পট পরিবর্তনের কাল। যুদ্ধের তাণ্ডব, শোষণের মহোৎসব, বৃহৎ শক্তিগুলির শিবির বিন্যাস গোটা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। সভ্যতার এই মহাসঙ্কটকালে পৃথিবীর বয়স যেন কয়েক যুগ বেড়ে গিয়েছিল। কোন গৃহকোণই এই সময় শান্ত থাকেনি। কোন ভূখণ্ডই নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনি। বাংলা দেশ তখন কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্য ক্ষেত্রে অস্থির, সংক্ষুব্ধ, কোলাহলপূর্ণ। কেননা বাংলা দেশ সে সময় ভারতাত্মা—ভারতবর্ষের প্রাণভূমি। রাজনীতি সমাজনীতির এমন জটিলতা আর কোথাও অতখানি তীব্র ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সবকটি পরস্পর বিরোধী ধারা এখানে শুধু সক্রিয় নয়, একে অপরের মুখোমুখী। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী আন্দোলনের অগ্রগতি এর সঙ্গে নতুন dimension যুক্ত করেছে। 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' ও অব্যবহিত পরে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে লেখক, শিল্পী বুদ্ধিজীবীরাও এক অসামান্য ভূমিকা এই দশকে পালন করেন বাংলা দেশে। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর যুদ্ধের সহযোগী হিসেবে বাংলার জনজীবনে চরমতম সঙ্কট ডেকে আনে। সুতরাং এই দশকটিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জটিলতম সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু সময় যত ভয়ানক, যত প্রতিকূলই হোক না কেন সেকালের সজাগ মানুষ নীরবে সঙ্কটের বোঝা মাথা পেতে নেয়নি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সমস্ত আঘাত ও আক্রমণের মোকাবিলা করেছে সচেতনভাবে—এত লড়াই, এত ধর্মঘট, এত বিদ্রোহ ইতিপূর্বে কখনও সীমিত এক সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। জনযুদ্ধের আহ্বান তখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, পাল্টা শুরু হয়েছে এখানকার ফ্যাসিবাদী শক্তির উগ্র জাতীয়তাবাদী আক্রমণ, যার শিকার হয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন ঢাকা শহরে তরুণ কথাশিল্পী সোমেন চন্দ। একদিকে রাজশক্তির চণ্ডনীতি কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদীদের উপর নেমে এসেছে, অপর দিকে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের অপপ্রচার ও সন্ত্রাস তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। পরিস্থিতি ভয়ানক, পথে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মিছিল, মৃত শবের সারি, নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন ভেঙে শহরাভিমুখী; অথচ সংগ্রাম অগ্রসরমান।

জনজীবনের দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলনের চাহিদা এই দশকে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন রেখেছিল সৃষ্টির ধারাস্রোত নিয়ে এগিয়ে আসার। তাই ভারতবর্ষের জীবনের এই ক্রান্তিকাল লেখক শিল্পীদের তুলি কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সভাসমিতি, পোস্টার প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে চতুর্দিকে এক সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এই সময় প্রগতিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকা এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 'পরিচয়' ও 'অরণি' এই দুটি পত্রিকাই যেমন অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রকাশস্থল তেমনি আবার বহু নতুন লেখকের উন্মেষ পর্বের আধার। ফ্যাসিস্টবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সৃজনশীল শিল্প সাহিত্যেরও প্রকাশ স্থান ছিল এই দুটি মুখপত্র। তথাপি এই দুই পত্রিকার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য স্বীকরণ, য়ুরোপীয় সাহিত্যের অ‌নুসরণ, আঙ্গিক চর্চার মাত্রাবোধ, শিল্প-সাহিত্যে রাজনীতির সোচ্চার অনুপ্রবেশের সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি প্রশ্নে প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও প্রকাশ্যে মতান্তর বা বাদানুবাদ প্রগতিশীল ও ফ্যাসিস্তবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ক্ষতি না করে বেগের-ই সঞ্চার করেছিল। 'পরিচয়' পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকদের মধ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ প্রসারে আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও শিল্পসাহিত্যের সারস্বত মূল্যের উপর অধিক ঝোঁক দেওয়া হয়। অরণি সেক্ষেত্রে একটু সোচ্চার এবং সরাসরিভাবে জনজীবনের মধ্যে প্রবেশের প্রয়াস করেছে। 'জনযুদ্ধ' প্রকাশের আগে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার ও ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল 'অরণি' পত্রিকা।

এই 'অরণি' পত্রিকাতেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ পাঁচটি গল্পের মধ্যে তিনটিই প্রকাশিত হয় 'অরণি' পত্রিকায়—২ এপ্রিল ১৯৪৩ সংখ্যায় 'ক্ষুধা', ২৮ মে ১৯৪৩ সংখ্যায় 'দুর্বোধ্য' এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সংখ্যায় 'ভদ্রলোক'। 'দরদী কিশোর' ও 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প দুটি ছাপা হয়েছিল জনযুদ্ধ পত্রিকার কিশোর বিভাগে যথাক্রমে ২৮ এপ্রিল ১৯৪৩ এবং ৬ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখের সংখ্যায়। এই গল্প দুটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা শ্রীসুধীপ্রধান উদ্ধার করে সারস্বত লাইব্রেরীকে প্রকাশের জন্য দিয়ে লোকচক্ষুর সামনে এনে দিয়েছেন। এ ছাড়া শিশু ও কিশোরদের জন্য কয়েকটি শিক্ষামূলক অনুবাদ ও মৌলিক গল্পও তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন: হরতাল, লেজের কাহিনী, ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা, দেবতাদের ভয়, রাখাল ছেলে ইত্যাদি।

সুকান্ত মূলত কবি, ছোটগল্প তাঁর সৃজন ক্রিয়ার গৌণ ফসল। বাংলা সাহিত্যে কবি-গল্পকার হিসেবে আমরা বেশ কয়েকজনকে পেয়েছি যাঁরা সব্যসাচীর মতো দুটি আঙ্গিকেই শতপুষ্প প্রস্ফুটিত করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তো বাংলা ছোট গল্পের ভগীরথ, যিনি ছোট গল্পের প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের উচ্চকোটিতে আসন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রধারার সার্থক উত্তরাধিকারী কবি সুকান্তও কাব্যের পাশাপাশি ছোট গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যদিও তাঁর সৃষ্টির স্ফূর্তি দেখা দিয়েছিল প্রধানত কাব্যেই। কিন্তু মাত্র সতের বছর বয়সে গল্প রচনায় যে সিদ্ধির পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাও অসামান্য। কয়েকটি স্ফুলিঙ্গই বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ হয়ে রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকও গল্পকাররূপে সুকান্তর মধ্যে ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"ছোট গল্পে ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তরুণ লেখককে প্রশংসা করেছি, উৎসাহ দিয়েছি; সুকান্তকে কবিতার প্রশংসা শোনানোর সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম। কাব্য সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি আমার জানা নেই, বিচার বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে খানিকটা হাওয়ার তারিফ শোনাতে ইচ্ছা হত না। তাছাড়া, নিজে থেকে সে যে কঠিন সংগ্রাম গ্রহণ করেছিল, যে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বিকাশলাভ করেছিল তার প্রতিভা, তাতে তাকে উৎসাহ দেবার প্রয়োজনও ছিল না কিছুমাত্র। (কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ, স্বাধীনতা ১৮ মে ১৯৪৭)

গল্প লেখায় ক্ষমতার সন্ধান পেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তিনি যে আরও অনুশীলন করার সুযোগ পেলে গল্পকার হিসেবেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারতেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে জল্পনা কল্পনার অবসান করে দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় সুকান্ত যে কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন সমকালীন সমাজ-সচেতনতায় তা ভাস্বর। কবিতার মতো গল্পেও তিনি বিষয়ভাবনায় আশ্চর্যজনকভাবে পরিণত চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন, যদিও ছোটগল্প-শিল্পী হিসেবে রঙ তুলির কাজে পরিপক্কতা তখনও তেমন করে আসেনি। কিন্তু কোথাও কোথাও চমকে দেবার মত কাজও আছে। তাই ছোটগল্প সুকান্তর সৃষ্টিজগতের গৌণ ফসল হলেও উপেক্ষণীয় নয়, শ্রদ্ধেয় অভিনিবেশের দাবি সে করতে পারে। সুকান্তর সৃষ্টি নিয়ে বহু বিচিত্র আলোচনা ইতোমধ্যে হলেও তাঁর গল্পগুলি আলোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে সাহিত্যে উপেক্ষিত হয়ে আছে। অথচ কবি ও গল্পকার সুকান্ত অভিন্ন এবং তাঁর প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ণে গল্পগুলি মূল্যবান উপাদান।

'সুকান্ত সমগ্র'-এ গল্পগুলিকে 'অপ্রচলিত রচনা' বিভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের বিভাগ নির্দেশ বিচিত্র। যে সৃষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছে সেগুলি প্রচলনের সুযোগ কোথায়। মুদ্রিত আকারে পাঠকের সামনে উপস্থিত হলে তবেই তো তার প্রচলন হবে। একটি স্থায়ী সংকলনে এই জাতীয় নির্দেশ সম্পাদকের অবিবেচনার পরিচায়ক। বিভাগটি 'ছোট গল্প' শিরোনামাঙ্কিত হলেই যথার্থ হত।

'দরদী কিশোর' ও 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প দুটি জনযুদ্ধ পত্রিকায় কিশোর বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ ঐ পত্রিকাব পাতায় সম্পাদকেব আবেদনে বলা হয়, "ছোটদের জন্য লেখা চাই ও খবর চাই—দেশেব কাজে আজ ছোট ছেলেমেয়েদেদ অবদান কম নহে। তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের রূপ দিতে হইবে। তাহাদের সজীব মনে সত্যিকাবেব দেশপ্রেমেব বীজ বপণ করিতে হইবে।" এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনযুদ্ধ পত্রিকাব ২৮ এপ্রিলের সংখ্যায় 'দরদী কিশোর' এবং ৬ অক্টোবরের সংখ্যায় 'কিশোরের স্বপ্ন' মুদ্রিত হয়। সুতরাং স্পষ্টতই গল্প দুটি প্রয়োজন-সাধক, এবং প্রচারধর্মীও বটে। শিল্পমূল্যে গল্প দুটি খুব একটা উন্নত মানেব নয়, অবকাশও হয়তো কম ছিল। কেননা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কিশোব সম্প্রদায়কে দেশেব কাজে, সমাজেব নিপীড়িত শোষিত মানুষের পাশে সমাজকর্মী হিসেবে সচেতনভাবে সামিল করার দায়িত্ববোধে এই গল্প। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই গল্প দুটি সহজ সবল ও শিক্ষামূলক।

'দরদী কিশোব' একটি সচ্ছল পবিবাবের কিশোর ছেলে শতদ্রুব উন্নত সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মীতে রূপান্তরিত হওযাব কাহিনী। দুবেলা পেটভরে খেতে পাওযা তথাকথিত ভাল ছেলে শতদ্রু মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হল যখন সে দেখল তাদেবই বাডিব পাশেব বস্তিতে ভুখা মানুষেব নিবন্ন আর্তনাদ, সহপাঠী শিবুর ক্লিষ্ট চেহাবা। "জানালা দিযে সে দেখতে পায তাদেব বাডির সামনের বস্তিটার জন্যে যে নতুন কন্ট্রোলেব দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভীড, আর চালেব জন্যে মাবামাবি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আব মূর্ছিত হওয়ার খববও পাওয়া যায়! সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তবু সে নিরুপায়, বাড়ির কঠোব শাসন আর সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু কবা অসম্ভব। যারা চাল না পেয়ে ফিবে যায তাদের হতাশায় অন্ধকার মুখ তাকে যেন চাবুক মারে, এদের দুঃখ মোচনেব জন্য কিছু করতে শতদ্রু উৎসুক হযে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে মনেপ্রাণে। তারই সহপাঠী শিবুকে সে পড়া ফেলে প্রতিদিন চালের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে

দ্যাখে, বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনোদিন চাল না পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালি গালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায়।" পারিপার্শ্বিকের এই চাপ শত্রুঘ্ন মানসলোকে নিয়ে এল এক ঝড়। আর পাঁচটা ছেলের মতো খেলাধুলোয় আর তার মন নেই। ধীরে ধীরে 'শত্রু', কমরেড শত্রুঘ্ন রায়তে পরিণত হল। তার জন্য তাঁকে অনেক পারিবারিক লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়। তাই সমাজদ্রোহের প্রস্তুতি হিসেবে 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠক শত্রুঘ্ন নিজের বাবার মজুত চাল উদ্ধার করে নিরন্ন মানুষের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ঘটনার ঘনঘটা না থাকলেও সাদা-মাঠা কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি কিশোর চিত্তের নবদীক্ষায় সুস্থিতির গল্প রচনায় সুকান্ত সার্থক।

'কিশোরের স্বপ্ন' যথার্থ অর্থে গল্প নয়—একটি আবেগাতিশয্যময় স্বপ্নচিত্র। কিন্তু এখানে লেখকের মুন্সীয়ানা হল সমকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে চার পৃষ্ঠার এই গল্পের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। "রবিবার দুপুরে রিলিফ কিচেনের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে জয়দ্রথ বাড়ি ফিরে 'বাংলার কিশোর আন্দোলন' বইটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল, পড়তে পড়তে ক্রমশ বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে এল, আর সে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেল।" একটি লাইনে গল্পের নায়ক জয়দ্রথের পরিচয় পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়—অর্থাৎ সে বাংলার কিশোর আন্দোলনের একজন সচেতন কর্মী, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে ত্রাণকার্য করে ঘরে ফিরেছে। এই কিশোরের চিন্তায় চেতনায় সর্বক্ষণের জন্য যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত বাংলা মায়ের হৃতশ্রী রূপটি জাগরুক। সুতরাং তার স্বপ্নে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রটি উদ্ঘাটিত হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। সুকান্তর কর্মজীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠক জয়দ্রথের মধ্যে তাঁকে সহজেই প্রত্যক্ষ করবেন। জয়দ্রথের স্বপ্নে বাংলা মা উপস্থিত হয়ে তার দুঃখের কথা বিবৃত করছে—যার মধ্য দিয়ে বাংলার তৎকালীন রাজনীতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

জয়দ্রথের প্রশ্ন : সরকার কী তোমায় কিছু খেতে দেয় না?

বাংলা মা'র উত্তর : কোনদিন সে দিয়েছে খেতে? আমাকে খেতে দেওয়া তো তার ইচ্ছা নয়, চিরকাল না খাইয়েই রেখেছে আমাকে, আমি যাতে খেতে না পাই, তার বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি না পাই, সেজন্যে সে আমার ছেলেদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে তাকে টিকিয়েই রেখেছে। আজ যখন আমার এত কষ্ট, তখনও আমার উপযুক্ত ছেলেদের আমার মুখে এক ফোঁটা

জল দেবারও ব্যবস্থা না রেখে আটকে রেখেছে তাই সরকারের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় কষ্ট দিও না…।

জয়দ্রথের আবার প্রশ্ন : উঃ কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তোমার। আচ্ছা তোমার দিকে চাইবার মতো কেউ নেই দেশের মধ্যে ?

উত্তর :—না বাবা। সুসন্তান বলে দুটি অন্ন দেবে বলে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মন্ত্রী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে, আমি যে এদিকে মরে যাচ্ছি, সেদিকে নজর নেই, চিতার ওপর বোধহয় ওরা মন্ত্রীর সিংহাসন পাডবে ·।

এখানে লেখক ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনভার প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরবর্তী কালের মন্ত্রিসভার স্বার্থান্বেষী ও জনবিরোধী কার্য-কলাপ, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ এবং বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ ও কুৎসার ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের প্রতিও ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে : "হঠাৎ বাংলার ক্লান্ত চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললে : —জাপান। ··খিদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচতুম; কিন্তু এর হাত থেকে বোধ হয় বাঁচতে পারব না।" শুধু বাংলা মায়ের আর্তনাদ ও করুণ চিত্রেই গল্পের শেষ নয় সেই সঙ্গে রয়েছে শপথ গ্রহণ। বাংলা মায়ের কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে জয়দ্রথ বলে : "তুমি কিছু ভেব না। বড়রা যদি না করে তো আমরা আছি।" অর্থাৎ স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা যদি কিছু না -ই করে তাহলে কিশোর ও যুবসমাজ এগিয়ে আসবে এবং তাদের পাশে যে শ্রমিক ও কৃষক ভাইরাও থাকবে তার প্রতিশ্রুতি ঘোষণাও রয়েছে এই গল্পে।

'ক্ষুধা' ও 'দুর্বোধ্য' গল্প দুটিও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত তবে পত্রিকার কোন নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য লিখিত নয়। মন্বন্তর নিয়ে সেকালে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের মধ্যে সৃষ্টির বাঁধভাঙা জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভিক্ষবিরোধী রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক অসামান্য ভূমিকা তৎকালে পালন করেছিল যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব উত্তরকালের প্রগতি-শীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনে গভীরভাবে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর বাংলার জীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, দেশ বিভাগের আগে এমন আঘাত আর আসেনি। 'অরণি' পত্রিকায় 'কথা প্রসঙ্গে' ফিচারে 'অনামী' ছদ্ম-নামে কথাসাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য কলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষের নির্মম চিত্র উপস্থিত করেছেন : "বুভুক্ষু পল্লী চোখের সামনে নেই। সহর থেকে চলতে একটু আধটু যা চোখে পড়ে তাই যথেষ্ট। সকাল থেকে কন্ট্রোলের দোকানের

কাছে নানান বয়সী মেয়ে, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সুদীর্ঘ সার বেঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, ধুলো খায়, দাঁড়াবার জায়গা নিয়ে গালাগালি করে, চুলোচুলি করে—অবশেষে পয়সা দিয়ে ভাগের ভাগ চাল নিয়ে শ্রান্ত দেহে ঘরে যায়, কেউবা খালি হাতেই বাসায় ফেরে নিষ্ফল আক্রোশে কিংবা দুর্বোধ্য নৈরাশ্যে।··· ডাস্টবিনে আজকাল আর উচ্ছিষ্টের দাক্ষিণ্য নেই।··· উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাজধানীর ফুটপাথের উপর রাত্রিবে কখন যে মানুষ মরে পড়ে থাকে কে জানে।"

যুদ্ধ ও মন্বন্তরপীড়িত বাংলাকে রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এগিয়ে এলেন। সংস্কৃতি আন্দোলন বহুমুখী ধারায় উৎসারিত হল—অসংখ্য প্রতিভাধর প্রবীণ নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক সমবেত হলেন গণনাট্য সংঘের পতাকার পাশেপাশে। 'নবান্ন'র মতো অসাধারণ নাটক এল যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতিপথ নির্ধারিত করে দিল—যে পথে আজও প্রগতি নাট্যধারা প্রবাহিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পগুলি, সোমনাথ লাহিড়ী, সুশীল জানা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প-উপন্যাস যুদ্ধ আর মন্বন্তরের অসামান্য স্থিরচিত্র হয়ে রয়েছে। এই সংগ্রহশালায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' ও 'দুর্বোধ্য' গল্প দুটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

'ক্ষুধা' গল্পের ঘটনাস্থল একটি বস্তি এবং পটভূমিতে রয়েছে আগ্রাসী মন্বন্তর। ভিড় করেছে অনেকগুলি চরিত্র—যার মধ্যে রয়েছে মাক্ষদামাসী বিনয়, মায়া প্রভৃতি। আর কেন্দ্রে রয়েছে হারু ঘোষ ও নীলু ঘোষের দুটি শ্রমিক পরিবার। নীলু ঘোষ একটি প্রেসের পনের টাকা মাইনের কম্পোজিটার এবং হারু ঘোষ চাকরি করে চটকলে, মাইনে পঁচিশ টাকা। থাকে একই বাড়িতে পৃথকভাবে। গল্পের কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে নীলুর স্ত্রী যশোদাকে কেন্দ্র করে। চালের প্রত্যাশায় কন্ট্রোলের দোকানে দোকানে ধর্না দিতে গিয়ে কাজে ঠিকমত হাজিরা দিতে না পারায় নীলু তার চাকরিটাও হারিয়েছে। সুতরাং অনশন আর বুক-ফাটা চীৎকার নীলুর পরিবারের একমাত্র সম্বল। নিরুপায় যশোদা তাই পথে বেরিয়েছে দুমুঠো চালের সন্ধানে। খুব স্বল্প কথায় লেখক মা যশোদার মানসিক যন্ত্রণা এঁকেছেন: "যশোদার যা কিছু গোপন সম্বল ছিল তাই দিয়ে গত দুদিন সে তিনুর ক্ষুধাকে শান্ত করেছে আর কোলের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বুকের পানীয় দিয়ে। কিন্তু আজ? আজ তার সম্বল ফুরিয়েছে, বক্ষস্থিত পানীয়ও নিঃশেষিত, আর নিজে সে তীব্র বুভুক্ষায় শীর্ণ এবং দুর্বল। অনশন করে সে নিজের প্রতিই যে শুধু অবিচার করেছে, তা নয়, অবিচার করেছে আরেকজনের

প্রতি—সে আছে তার দেহে, সে পুষ্ট হচ্ছে তার রক্তে, সে প্রতীক্ষা করছে এই আলো-বাতাসময় পৃথিবীতে মুক্তির। তার প্রতি যশোদার দায়িত্ব কি পালিত হল? ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় সে চোখ বুজল, কোলের শিশুটাকে নিবিড় করে চেপে ধরল আতঙ্কিত বুকে। যশোদা ভেবে পায় না কী প্রয়োজন এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে ভীত একটি নতুন শিশুর জন্ম নেবার? অথচ তার আত্মপ্রকাশের দিন নিকটবর্তী।"

কিন্তু এই নিদারুণ অবস্থা তো শুধু যশোদার পরিবারের নয়, তাদের মত আরও অজস্র মানুষেরও। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের বৌ যশোদা এই প্রথম পথে বেরিয়ে হাজির হয়েছে খাদ্যান্বেষী মানুষের মিছিলে: "সে ঘোমটার অন্তরালে আত্মরক্ষা করতে করতে কন্ট্রোল দোকানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দুজন নয়, শত শত এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, আব্রু নেই, সংযম নেই, নেই কোনো কিছুই, শুধু আছে ক্ষুধা আর আছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহার্য চায়, তারো বাঁচবার অদম্য লিপ্সা।"

বাঁচার উপকরণ নাগালের বাইরে তবুও সাধারণ পরিবারগুলির মধ্যে কত বিচ্ছিন্নতা, সামান্য অহমিকা নিয়ে কত মানসিক জটিলতা। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, কোন সংস্কার, কোন অভিমান সে মানে না, মানুষগুলোকে ভেঙে-চুরে একাকার করে দেয়। ভাসুর হারু ঘোষ ভ্রাতৃবধূ যশোদাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে এসে স্বাভাবিক মমতায় খানিকটা চাল দিয়ে পুরানো পারিবারিক ঝগড়ার রেশ টেনে মন্তব্য করতেও ছাড়েনি: "যে-পুরুষমানুষ বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।" এমন অপমানকর উক্তি কানে শুনেও সন্তানদের বাঁচাবার জন্য চাল কটা না নিয়ে পারেনি যশোদা। আবার বুকের কোণে বিঁধে থাকা কথাটা স্বামীকে না বলেও থাকতে পারেনি। ফলে তারই কপালে জুটেছে নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা। "নীলু যশোদাকে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আর যশোদা অত্যন্ত সাবধানে এবং নীরবে এইটুকু সহ্য করল। বারান্দায় ভিজে মাটির ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের অজস্র তারাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যশোদার চোখ জলে ভরে এল, ঠোঁট থর থর করে কেঁপে উঠল।"

এখানেই শেষ নয়, কারণ মন্বন্তর তো এটুকুতেই থেমে থাকেনি, লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে তার দাপাদাপি শান্ত হয়েছিল। এই গল্পেও কয়েকটি জীবনের আত্মাহুতি লক্ষ্য করা গেল। নিদারুণ খাদ্যাভাব মনুষ্যত্বটুকুও চেটে পুটে নিঃশেষ

করে নেয়। এক সীমাহীন সঙ্কটের আবর্তে পড়ে মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে যায় তখন তার মধ্যে পশুত্বই প্রাধান্য পায়। কয়েকদিন কোনক্রমে চলার পর হারু ও নীলু দুই ভাই-ই বেরিয়েছে সাতসকালে চালের সন্ধানে। ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে যশোদা হারুর স্ত্রীর কাছে কেঁদে পড়ে কোনমতে শেষ সম্বল এক মুঠো চাল নিয়ে ঘরে গেছে। যে হারু ভ্রাতৃবধূকে এর আগে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে ঘরের চাল তুলে দিয়েছিল সেই যখন রিক্তহস্তে বাড়ি এসে শুনল শেষ সম্বলটুকুও নেই তখন রাগে ভাই-এর প্রতি কটূক্তি করতে দ্বিধা করল না। সঙ্গে সঙ্গে হারু ঘোষের স্ফুলিঙ্গ নীলু ঘোষের বারুদে সঞ্চারিত হল। পশুর মতো রাগে জ্ঞানহারা নীলু অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে প্রচণ্ড লাথি মারল। যশোদা বিকট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। যশোদাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল বস্তির প্রতিবেশীরা, সেখানে তার মৃত্যু হল।

যশোদা-শূন্য ফাঁকা ঘরে সম্বিৎ ফিরে আসতে নীলুর মানসিক অবস্থা বিবৃত করে লেখক বলছেন : "ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর নীলুর মন কেমন যেন শূন্যতায় ভরে গেল, আস্তে আস্তে মনে পড়ল একটু আগের ঘটনা। একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল যশোদার পরিত্যক্ত জীর্ণ বিছানায়, যশোদার চুলের গন্ধময় বালিসটাকে আঁকড়ে ধরল সজোরে।···সমস্ত আশা এবং সমস্ত অবলম্বন আজ দারিদ্র্য ও অনশনের বলিষ্ঠ দুই পায়ে দলিত, নিঃশেষিত।" ঘটনার গতিতে পাশের ঘরে হারু ঘোষও বিপর্যস্ত। নিপুন শিল্পীর মতো লেখক সুকান্ত সেই মানসিক যন্ত্রণার ভাষারূপ দিয়েছেন : "অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে হারু ঘোষ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে অনুভব করতে থাকে কিসের যেন অশরীরী আবির্ভাব। সন্ত্রস্ত ভীত, অত্যন্ত অসহায়ভাবে তাকায় আকাশের দিকে, সেখানে লক্ষ লক্ষ চোখে আকাশ ভর্ৎসনা জানায়—ক্ষমা নেই। হারু ঘোষ উন্মাদ হয়ে উঠলো—আকাশ বলে ক্ষমা নেই, দেয়ালের ছায়া বলে ক্ষমা নেই, তার হৃদস্পন্দন দ্রুতস্বরে ঘোষণা করতে থাকে ক্ষমা নেই। তার কানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বরে ধ্বনিত হতে থাকে—ক্ষমা নেই···।" পরদিন সকালে বস্তির সকলে দেখল—"হারু ঘোষ বারান্দায় আর নীলু ঘোষ ঘরে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে চিরকালের মতো ব্যঙ্গ করে বীভৎসভাবে ঝুলছে, যেন জিভ ভেঙাচ্ছে আসন্ন দুর্ভিক্ষকে।"

সমস্ত বস্তিতে শোকের ছায়া নেমে এল কিন্তু সে নিতান্তই সামান্য সময়ের জন্য। একটু বেলা বাড়তেই দেখা গেল সেই মানুষের ভিড় কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে। স্মৃতিকে ধীরে সুস্থে নাড়াচাড়া করে শোক করবার সময় ক্ষুধার্ত

মানুষের নেই। "ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে না পৃথিবীর যে-কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর।" গল্পটি এখানে শেষ হলে শিল্পসম্মত হত, বাকি অংশ অর্থাৎ মানুষকে সংগঠিত করার অঙ্গীকার ঘোষণা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়ভাবে রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত করেছে। বক্তব্যের অসাধারণ জীবনমুখীনতা সত্ত্বেও সাবিক বিচারে গল্পটি একটু ঢিলেঢালা। স্থানে স্থানে ভাষার আড়ষ্টতা ও বর্ণনা বাহুল্যও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বিনয় ও মায়া চরিত্র দুটির গল্পে তেমন প্রয়োজন ছিল না।

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে রচিত 'দুর্বোধ্য' অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন গল্প এবং অনেক বেশী পাকা হাতের কাজ। 'অবণি' পত্রিকায় এটিকে চিত্রগল্প রূপে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একে কেন চিত্রগল্প বলা হল তা বলা কঠিন। এটি একটি সত্যিকারের সার্থক গল্প। দুর্ভিক্ষের বাংলা দেশে এক নিঃসঙ্গ অন্ধ ভিক্ষুকের সামগ্রিক সমাজবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার ট্রাজেডি। শহর ছাড়িয়ে রেল স্টেশনের দিকে ধাবিত পথের ধারে এক তেঁতুল গাছের তলায় প্রতিদিন ভোরবেলা সে ভিক্ষে করতে বসে। পৃথিবীর রূপ রস থেকে সে বঞ্চিত, চোখের সামনে কী ঘটে চলেছে সে জানতেই পারে না, আন্দাজ করে নেয় কানে-আসা লোকজনের কথাবার্তায়। এই কথা শোনাই তার লাভ। নিস্তব্ধতা তার কাছে ক্ষুধার চেয়েও যন্ত্রণাময়। তার ছোট্ট পৃথিবীতে একমাত্র অবলম্বন ছিল একটি নরম হাত—যে হাতে ভর করে সে রোজ এখানে এসে বসত এবং ঘরে ফিরে যেত। ভিক্ষুকের এই বৈচিত্র্যহীন রোজনামচায় নিদারুণ বৈচিত্র্য নিয়ে এল দুর্ভিক্ষ। না চেঁচিয়েই যেখানে বাঁচার মতো ভিক্ষে মিলত সেখানে চিৎকার করে অনুনয় বিনয় করেও "দিনের শেষে যখন কাপড় হাতড়ে সে শুকনো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পায় না, তখন সারাদিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে তার আহত অবরুদ্ধ মন বিপুল বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-শক্তি কোথায়?" শূন্য কাপড় হাতড়ে দুর্দিনকে মর্মে মর্মে অনুভব করে, আর কান পেতে থাকে পথচারীর কথাবার্তার দিকে। ফেণীতে বোমা পড়ার ঘটনা বৃদ্ধের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না কেননা তার বিশ্বটা ঐ তেঁতুলতলা ও সামনে ছড়ানো কাপড়টার উপর সীমাবদ্ধ। কিন্তু চিন্তিত হয় চাল না পেয়ে ঘনশ্যামের বউ-এর জলে ডুবে মরার ঘটনা কানে আসতে। লেখক সুন্দরভাবে এই বৃদ্ধের অসহায়তার বিবরণ দিয়ে বলেছেন: "কে এই অন্ধ বৃদ্ধকে বোঝাবে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি? শুধু বৃদ্ধের মনকে ঘিরে নেমে আসে আশংকার কালো ছায়া। আর দুর্দিনের দুর্বোধ্যতায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে দিনের

পর দিন। অজন্মা নয়…প্লাবন নয়…তবু ভুভিক্ষ? শিশুর মতো সে অবুঝ হয়ে ওঠে; জানতে চায় না, বুঝতে চায় না—কেন দুর্দিন, কেন দুর্ভিক্ষ—শুধু সে চায় ক্ষুধার আহার্য।"

এমনি করে এমন একদিন এল যেদিন সেই নরম হাত আর তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এল না। শূন্যতা, অসহায়তা বৃদ্ধকে গ্রাস করে ফেলল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহ দুদিন এইভাবে চলার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন তার কানে ভেসে এল বহু মানুষের চিৎকার—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই। হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেল, এক অজ্ঞাত আবেগ তার সারা দেহে বিদ্যুতের মতো চলাফেরা করতে লাগল। নিরন্ন মানুষেব মিছিল চলেছে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চাল আনতে। "অবশেষে সে বিপুল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে পারল না, কেবল একবার মাত্র তাদের সঙ্গে 'অন্ন চাই' বলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।"

একটি ভেঙে-পড়া, অশক্ত, অনিকেত, অবসন্ন, মৃতপ্রায় জীবনকে মিছিলেব হাতছানিতে যেভাবে নিপুণ শিল্পীর মতো জীবনবোধে শেষ মুহূর্তেব জন্য উত্তরণ ঘটিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। 'ক্ষুধা' গল্পের শেষাংশের প্রচারমূলকতার স্থূলত্ব এ-গল্পে সূক্ষ্ম শিল্প হয়ে উঠেছে। শেষ তিনটি লাইনে দারুণ মোচড় দিয়ে গল্প শেষ করেছেন লেখক। বিন্দুতে সিন্ধুর দ্যোতনা সৃষ্টি প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্পের যে প্রাণধর্ম এই তিনটি লাইনে তার সার্থকতম দৃষ্টান্ত। "সেই রাত্রে একটা নরম হাত বৃদ্ধের শীতল হাতকে চেপে ধরল, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে তার কোঁচড়ে ভরা চাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।" সারা গল্পে না বলা অনেক কথা এই একটি বাক্যের মধ্যে লেখক বললেন। এ যেন কবির পরিমিতি বোধ, শিল্পীর তুলির আঁচড়—যা দুয়েকটি রেখায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। যে চরিত্রটি গোটা গল্পে অশরীরী ছায়ার মত শুধু থেকেছে, গল্পের শেষে দেখা গেল সে বৃদ্ধকে অসহায়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করতে চায়নি। তাকে বাঁচাবার জন্যই চাল সংগ্রহ করতে গেছে, তাই দুদিন আসতে পারেনি। আর এই চাল সংগ্রহের জন্য তাকে কী মূল্য দিতে হয়েছে তাই বা কে জানে। লেখক এখানে নীরব থেকে পাঠকের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাঁচার সামগ্রী নিয়ে এসে যখন বৃদ্ধের মৃতদেহ স্পর্শ করল তখন দুর্দিনের অমূল্য সম্পদ চাল কটি নিদারুণ মর্মবেদনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। জীবনকে বাঁচাতে জীবন হারিয়ে যায়। এক অসাধারণ তাৎপর্যময় গল্পের করুণ পরিণতি।

'ভদ্রলোক' সুকান্তর জীবনশেষের রচনা। একটি অল্পশিক্ষিত যুবক সুরেনের

ভদ্রলোকের সমাজ থেকে ছোটলোকের সমাজে অবনমন তথা উত্তরণের কাহিনী অর্থাৎ declassed চেতনায় পৌঁছনোর গল্প। সুরেনের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে লেখক সামান্য কয়েক লাইনে এক নির্মোহ চিত্র এঁকেছেন : "দুমাস আগেও সে বাসে চড়েছে কন্‌ডাক্টর হয়ে নয়, যাত্রী হয়ে। দু'মাসে সে বদলে গেছে। খাকির জামার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারাটা। বাংলার বদলে হিন্দী বুলিতে হয়েছে অভ্যস্ত। হাতের রিস্টওয়াচটাকে তবুও সে ভদ্রলোকের নিদর্শন হিসাবে মনে করে, তাই ওটা নিয়ে তার একটু গর্বই আছে। যদিও কন্‌ডাক্টরী তার সয়ে গেছে, তবুও কিছুতেই সে নিজেকে মজুর বলে ভাবতে পারে না। ঘামে-ভেজা খাকির জামাটার মতোই অস্বস্তিকর ঐ 'মজুর' শব্দটা।"

নিজেকে মজুর ভাবতে সুরেনের আপত্তি, মধ্যবিত্ত মানসিকতার পিছুটান। সুকান্ত পাকা গল্পকারের মতো তার সেই তথাকথিত ভদ্রমানসিকতাকে তিল তিল করে ভেঙেছেন ছোট ছোট পারিপার্শ্বিকের আঘাতে। শেষ আঘাত যা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল—সেটি এল তার প্রেমিকার কাছ থেকে। গৌরীকে ভালবাসতে গিয়ে মামার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কন্‌ডাক্টরের ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়েছিল জীবনে দাঁড়াবার তাগিদে। সেই গৌরী তারই বাসে উঠে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল যেন চেনেই না। লেখকের ভাষায় সুরেনের প্রতিক্রিয়া : "গৌরীর বিমুখ ভাব সুরেনের শিরায় শিরায় বইয়ে দিল তুষারের ঝড়, দ্রুত অত্যন্ত দ্রুত মনে হল বাসের কাঁপুনি দেওয়া গতি। বহু দিনের রক্ত জল-করা পরিশ্রম আর আশা চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে কাঁপতে লাগল স্পিডোমিটারের মতো। একটু চাহনি, একটু পলক-ফেলা আশ্বাস, এরই জন্যে সে কাঁধে তুলে নিয়েছিল কণ্ডাক্টরের ব্যাগ।" ধূলিসাৎ হয়ে গেল সুরেনের সমস্ত মধ্যবিত্তসুলভ অভিমান। নিষ্করুণ সমাজ সুরেনকে গ্রাস করে নিল। সে আজ 'সৌখিন ভদ্রসমাজ থেকে ঘা-খাওয়া ছোটলোকের সমাজে' পৌঁছে গেল। গল্পটার বুনোনিতে বাস্তবতার সুতোর কাজ নৈপুণ্যের সঙ্গে করা হলেও জীবন সত্য নির্ধারণে যান্ত্রিকতার ছাপ রয়েছে। সব দিক দিয়ে 'দুর্বোধ্য'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প।

'হরতাল' সঙ্কলনে প্রকাশিত গল্পগুলিকে গল্প না বলে শিশুকাহিনী বলাই সঙ্গত। তাই এর আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে হওয়া উচিত। তবে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, লেখক সুকান্ত শিক্ষামূলক এই গল্পগুলির মাধ্যমে ছোটদের জীবন বহির্ভূত কল্পলোকে নিয়ে যাননি বরং বাস্তবানুগ ছোট ছোট দৃষ্টিগ্রাহ্য দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে সহজভাবে রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন। এখানেই সুকান্তর কৃতিত্ব।

কবি সুকান্তর পাশে গল্পকার সুকান্ত নিশ্চয়ই ম্লান। জীবনের যে কয়েকটা বছর তিনি হাতে পেয়েছিলেন কবিতা চর্চাতেই বেশী আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই কাব্যে যে সিদ্ধিতে তিনি পৌছেছিলেন ছোট গল্পে তা সম্ভব ছিল না। তবে গল্পকার হিসেবে সৃজন ক্ষমতার যে ইঙ্গিতটুকু তিনি রেখেছেন তাতে সম্ভাবনার চেয়ে প্রতিশ্রুতির পাল্লাই ভারী। আরও বেশী গল্প তাঁর কাছ থেকে পেলে উত্তরকালের মানুষই লাভবান হতেন, কিন্তু তার জন্য আক্ষেপের কারণ নেই। যা পাওয়া গেছে তার উপযুক্ত মূল্য একালকে দিতেই হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

সুকান্ত কাব্যের শিল্প মূল্য

সুকান্ত-কাব্যের প্রশ্নাতীত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিদগ্ধ মহলের একাংশের প্রচার রয়েছে 'কবি হবার জন্যেই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হতে পারার আগে তার মৃত্যু হলো।' তাঁরা সুকান্তকে মার্কা দিয়েছিলেন জাত-কবিদের ক্লাশে কিন্তু সুকান্ত তাঁদের হতাশ করেছেন রাজনৈতিক কবিতা লিখে। এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। বলা বাহুল্য বুদ্ধদেব বাবুরা রাজনীতি বলতে বোঝেন নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের সপক্ষতা অবলম্বন। তাঁর মতে, "তার (সুকান্তর) কবিতা পড়ে মোটের উপর একথাই মনে হয় যে তার কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবিতা-গুলি যেন সেই মতবাদের চিত্রণ মাত্র, জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না হয়ে খবর-কাগজের প্যারাগ্রাফ হলেই যেন মানাতো।...সৈনিক পঙ্‌ক্তিতে বন্দী হলে, কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ কী-ভাবে অবরুদ্ধ হয় তারই উদাহরণ সুকান্ত।.. যূথের কাছে ব্যক্তির সর্বস্ব সমর্পণের সমীকরণে তার কবিত্বে কুঁড়ি ধরেই ঝরে গেলো।" (সুকান্ত বিচিত্রা পৃঃ ৯-১১)।

বুদ্ধদেব বাবুর, এই অভিমত তাঁর ব্যক্তিগত হলেও একটি দৃষ্টিকোণের নগ্ন প্রকাশ। একদল মানুষ আছেন যাঁরা সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বনকে সংকীর্ণ রাজনীতি বলে মনে করেন, যূথের কাছে ব্যক্তির সর্বস্ব সমর্পণ বলে বিশ্বাস করেন। বহু জনের জীবনের ভালমন্দের পাশে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির অর্ঘ্য নিবেদন যদি রাজনীতি হয় তাহলে মুষ্টিমেয় জনের স্বার্থবাহী শিল্পসাহিত্য রচনা রাজনীতি নয় কেন এ উত্তর কে দেবে? আসলে বুদ্ধদেব বাবুদের ক্রোধ ভারতবর্ষের নিপীড়িত শ্রেণীর অসংখ্য মানুষের বিকাশমান বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে। তাঁরা সমাজকাঠামোর স্থিতি স্থাপকতায় বিশ্বাসী। সুকান্তর মতাদর্শ, জীবন-বোধ সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির। তাঁর সাধনা, তাঁর যুদ্ধ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, নতুনতর এক সমাজ নির্মাণের সপক্ষে, যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণ থাকবে না। বুদ্ধদেব বাবুদের আপত্তি রাজনীতিতে নয়, বিশেষ রাজনীতিতে অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষের রাজনীতিতে। সুকান্ত কিন্তু খোলা মনেই বিশ্বাস ঘোষণা করতেন: "আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয়

তাহলেই আমি খুশি কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এদেশের অধিকাংশ হবে।" সুতরাং সুকান্তর বিশ্বাসে কোথাও খাদ ছিল না।

তাঁর কাব্যে শ্লোগান আছে, জেহাদও আছে, সোচ্চার ভাবেই আছে। এখন প্রশ্ন তাঁর এই মতাদর্শ ভিত্তিক সৃষ্টি সম্ভার সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে কিনা। যদিও উন্নত মানের কাব্য পাঠে অভ্যস্থ বাঙালী পাঠক সমাজে সুকান্ত-কাব্যের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করছে কাব্য-সর্তে তাঁর সৃষ্টি নিশ্চিত ভাবেই পাঠক হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছে। বরং বুদ্ধদেববাবুদের মত তথাকথিত বিশুদ্ধ কাব্যের রচনাকারদের পাঠক ভুলতে বসেছে। বিদগ্ধ সমালোচকদের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধে বা গবেষণা গ্রন্থে বর্ণাঢ্য প্রচার করেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বরং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সম্পর্কে বীতস্পৃহ পাঠক সমাজকে কবিতামুখী করতে সুকান্তর অবদান সর্বাধিক। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়: "সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ পারে নি, সুকান্ত একা তা করেছে—আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বার বহুজনের জন্যে সে খুলে দিয়ে গেছে। কবিতা বিমুখ পাঠকদের কবিতার রাজ্যে জয় করে আনার কৃতিত্ব সুকান্তর। তারই সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।" (সুকান্ত সমগ্র'র ভূমিকা)।

শুধু কাব্য বিষয় নয়, পরিবেষণ ভঙ্গিও ছিল তাঁর হৃদয়গ্রাহী। তাই শ্লোগানে যাঁদের আতঙ্ক তাঁরাও সুকান্ত কাব্য উপেক্ষা করতে পারেন নি। বরং দ্বিধা দোলাচলতা সত্ত্বেও উচিত মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। সুকান্তর মৃত্যুর পর অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন: "যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি। শৌখীন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহ মন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।" কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী হয়েও অধ্যাপক ভট্টাচার্য সুকান্তকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অগ্রজ কবি গোষ্ঠীর অন্যতম কবি অজিত দত্ত সুকান্তর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন:—"সুকান্তর কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেটা কাম্য হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রচনায় আছে সেই শিল্পীর যাদু-স্পর্শ যার দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ সুকান্তর রচনার ছন্দ এতো স্বচ্ছন্দ, ভাষা এতো বলিষ্ঠ, রচনা-

শিল্প এতো পুষ্ট যে, বয়সের অনুপাতে এরূপ রচনা বিস্ময়কর ও অসাধারণ।" (স্বাধীনতা। ১৮ই মে ১৯৪৭)।

রবীন্দ্রোত্তরযুগের বিদগ্ধ কবি সমাজের অন্যতম প্রথম সারির কবি অজিত দত্তর এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব বাবুদের উন্নাসিকতার যথাযোগ্য জবাব। সুতরাং পাঠক সাধারণের হৃদয়ের আতিথ্য লাভের পাশাপাশি বিদগ্ধ কবি সমালোচকদের কাছে নিছক কবি হিসেবেও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি সুকান্ত পেয়েছেন। কবি বিষ্ণুদের ভাষায় রয়েছে আরও বড় স্বীকৃতি: "আশ্চর্য হয়েছিলুম, সুকান্তর কবিপ্রতিভা প্রকাশিত হলো প্রতিশ্রুতিতে নয়, একেবারে পরিণতিতে; তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার কবিতা পড়েছি। অক্লান্ত কর্মীর আত্মত্যাগের অবসরহীন মানস কিন্তু সুলিখিত কবিতা। একাধারে তার এই পরিণত কবিত্ব এবং মার্কসিস্ট তত্ত্বের জনগাম্ভীর্য বারবার বিস্মিত করেছে—ভেবেছি এ ছেলেটি প্রৌঢ়ত্বে আর কি লিখবে, এর বিস্ময়কর প্রতিভার কি বিকাশ সম্ভব?" (স্বাধীনতা ১৮ই মে ১৯৪৭)।

স্বল্পকালীন জীবনের সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়েও সুকান্ত কবি হিসেবে এই স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞানপত্র অর্জন করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহ্যসচেতন ও যথার্থ আধুনিক। কাব্যের সুপ্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নতুন অনুভবের চর্চা তিনি করেছেন। ভাব ও বিষয়ে তিনি যুগন্ধর আবার শিল্পশৈলীতে ঐতিহ্যানুসারী স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সমস্ত রূপ রঙ রস সংগৃহীত হয়েছে প্রবীণ বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশালা থেকে। রবীন্দ্রকর্মশালায় একলব্যের মতো পাঠ গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরিণত শব্দচেতনা, নিখুঁত ছন্দে সুবিন্যস্ত কবিতার প্রতিমা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুকান্তর শব্দচয়ন ও ধ্বনিবোধে পারিবারিক সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চার প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল এমন বিশ্বাস করারও কারণ আছে। বিস্ময়কর ধ্বনিগত শুদ্ধতা ও শব্দগাম্ভীর্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর উন্মেষ পর্বের বহু রচনায়। যেমন:

বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত,
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।—ইত্যাদি।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অন্ত্য ও চরণের অভ্যন্তরে মিলের যাদুস্পর্শে এ কবিতা অসামান্য সফলতা পেয়েছে। এমনই আরেকটি দৃষ্টান্ত:

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,

বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে,
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার অঞ্জন।
(আমার মৃত্যুর পর)

আঠারো অক্ষরের পয়ারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিখুঁত প্রয়োগ হয়েছে এই কবিতায়। লক্ষ্য করার বিষয় সুকান্তর কাব্যের ধ্বনিচেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে আবেগের প্রগাঢ়তা। ভাব ও রূপকল্প তাঁর কবিতায় যেন হরগৌরী মিলনে আবদ্ধ। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর ভাষায়: "ভাবকে বাদ দিয়ে রূপের আশ্রয় নেই। রূপের মূলে ভাবের দ্যোতনা অবশ্যই থাকা চাই, তা নয়তো রূপ দাঁড়াতে পারে না, খুলতে পারে না। সুকান্তর কবিতায় আবেগ যেন থমথম করছে, আর সেই গভীর ভাবাবেগই কাব্যভাষায় পরিস্রুত হয়ে ধ্বনিগত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করেছে। এই মানদণ্ডে বিচার করে বলতে হয় তাঁর কাব্যের অসামান্য শব্দচেতনা, ছন্দ ও মিলের কারুকার্য, শিল্পশৈলীর পারিপাট্য ও খুঁতহীনতা, এককথায় তাঁর বিস্ময়কর ধ্বনিসম্পদ তাঁর অনুভব ও কল্পনার গভীরতার রূপান্তরিত বেশ মাত্র। কাব্যের 'আত্মা' এক্ষেত্রে কাব্যের উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত।" (নন্দন—আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৩)

কাব্যের পরিচ্ছদ রচনায় সুকান্তর বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি কখনও বক্তব্য বিষয় থেকে দূরে সরে গিয়ে রূপচর্চা করেন নি। পরিচ্ছদ কখনও কাব্যশরীরকে উৎকট করে তোলে নি বরং লাবণ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলি আবেগ-মথিত, রূপ তাড়িত নয়। রূপচর্চায় সুমিতিবোধের এমন সার্থক অনুশীলন রবীন্দ্র ভাবশিষ্যের পক্ষেই সম্ভব। কবিতার শরীরে ইতস্ততঃ চিত্রকল্প ও প্রতীকের যথাযোগ্য ব্যবহার করেও অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় কবিতার শেষ চরণগুলিতে তিনি এমন চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেন যা সাধারণীকৃত হয়ে বক্তব্যবিষয়কে ঘনীভূত করে তোলে। যেমন:

(ক) বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন॥ (লেনিন)

(খ) আমি যে পুরোনো অচল দীঘির জল
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া॥ (রৌদ্রের গান)

(গ) আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব॥ (শত্রু এক)

(ঘ) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়!
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥ (হে মহাজীবন)

কখনও বা আবার কবিতার মধ্যপথে উজ্জ্বল চিত্রকল্পে তাঁর বক্তব্য বিষয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে যায় :

রক্তে আনো লাল,

রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল। (বিবৃতি)

ভাঙা গদ্যে লেখা সুকান্তর কয়েকটি কবিতা পুরোপুরি প্রতীক নির্ভর। অবশ্য প্রতীকের আড়ালে কবির বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সত্তা বড় স্বচ্ছভাবেই পরিস্ফুট। বস্তুজগতের তুচ্ছ, উপেক্ষিত বা কখনও স্বপ্রচলিত প্রতীকের আত্মকথনে কবি তাঁর বক্তব্য নিয়ে হাজির হন। এইসব কবিতায় কবি এতই প্রত্যক্ষ এবং তাঁর ক্রোধ, জ্বালা ও প্রতিশোধস্পৃহা এত তীব্র যে প্রতীকের সুপ্রযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন এই বাহা হয়ে যায়। প্রতীক ব্যবহারের যাথার্থ্য বিচারের চেয়ে প্রতীকমুখে ব্যক্ত বক্তব্যটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পাঠকের হৃদয়কে সম্মোহিত করে। যেমন, সিঁড়ি, সিগারেট, দেশলাই কাঠি, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি।

ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান ও স্বরাঘাতপ্রধান তিন ধরনের ছন্দেই তিনি ছিলেন বিস্ময়করবরূপে সফল। ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ছয় মাত্রার পর্বের কবিতা রচনাই তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। অথচ ছন্দের দোলা, বক্তব্য বিষয়ের গাম্ভীর্যকে কোথাও লঘু করেনি। 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের কলম, ঠিকানা, বাজার, অনুভব, আঠারো বছর, 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের বিক্ষোভ, পরিখা, বিদ্রোহের গান, অভিবাদন, জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী, আমরা এসেছি প্রভৃতি কবিতা এই ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই লেখা

তানপ্রধান ছন্দেও তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি রয়েছে। পয়ারের ট্রাডিশনাল সুর কিন্তু ভাবের ঋজুতা ক্ষুণ্ণ করে নি কোথাও। ধীরোদাত্ত ভাষা ও সংযত আবেগে কবিতাগুলি সার্থকতা পয়েছে। এই ছন্দে রচিত কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—ছাড়পত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, লেনিন, আগামী, বিবৃতি, ঐতিহাসিক, সব্যসাচী, অনন্যোপায়, দিন বদলের পালা প্রভৃতি।

বক্তব্যের সোচ্চার ভঙ্গিমা ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার অনেক সময় নজরুলের কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন :

শোন রে বিদেশী, শোন,

আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ!

আমরা সবাই অসভ্য বুনো—

বৃথা রক্তের শোধ নেব দুনো

এক পা পিছিয়ে দুপা এগোনোর

আমরা করেছি পণ,
ঠকে শিখলাম—
তাই তুলে ধরি দুর্জয় গর্জন।
(একুশে নভেম্বর, ১৯৪৬)

নিসর্গ ও নির্জনতাপ্রীতি কবির স্বভাবধর্ম। তবে জাত রোমান্টিক কবির ক্ষেত্রে তা মাত্রাতিরেকী হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক দায়িত্বে অন্বিত কবির চিন্তায় নিসর্গ ও প্রকৃতি উপপ্লবী ভাবনার সহকারীরূপে প্রতিভাত হয়। মাঝে মাঝে নির্জনতা বা প্রকৃতির উপাধানে গা এলিয়ে দিতে ভাল লাগে তবে তা নিতান্তই সাময়িক। সুকান্তরও তেমন করে ভাল লেগেছিল প্রকৃতির ঘেরাটোপ: "শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মত জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবু আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারেনি...। এখন আছি বদ্ধ দীঘির জগতে সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে মাছের মত কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে।"

কাব্যের অন্যতম অনিবার্য উপাদান নিসর্গকে কবি সুকান্ত পর্যাপ্ত ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোথাও তা প্রাধান্য পেয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষুরধারতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। নিসর্গপ্রেমের ভাবলীলায় এলায়িত হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতি তাঁর কবিতায় বৈপ্লবিক বক্তব্যের অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

ক) "মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে আন্দোলিত ঘাস" (লেনিন)

খ) "আন্দোলিত শাল, পাইন আর দেবদারুর বনে
ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি"। (কাশ্মীর)

গ) কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে ঝাঁপ দেব তাতে। (ফসলের ডাক: ১৩৫১)

ঘ) দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি,
একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—(রানার)

ঙ) তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ বুঝি হয় লাল ও-পূর্বকোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটমিট করে চায়:
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়! (ঐ)

রূপকল্পে প্রকৃতির ব্যবহারের আরেকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত:

আজ এই রাত্রিশেষে বাইরে পাখির কলরবে
রুদ্ধ ঘরে বসে ভাবি, হয়তো কিছু বা শুরু হবে,

হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল ; (জনরব)

সমাজ ও রাজনীতিব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘনঘটার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুকান্ত যেমন ঋজু, বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়সিদ্ধ কবিতা লিখেছেন তেমনি শিশু ও কিশোরদের জন্যও লিখেছেন বেশ কতগুলি ছড়া ও কবিতা। শিশুদের তিনি মায়াময় কল্প জগতে বা সাতসমুদ্র তেরনদী পার কবে পবীব দেশে নিয়ে যান নি, পরিচিত অতি পরিচিত শ্বাপদসঙ্কুল সমকালীন সমাজেব সঙ্গে পবিচয় কবিয়ে দিয়েছেন। .ছোটদের কবিতাতেও কবি ও কর্মী সুকান্ত একাকাব। ছেলে ভুলানো বা ঘুম পাড়ানো ছড়া তিনি লেখেন নি, তাঁর ছড়া পাড়া মাতানো, ঘুম ভাঙানো। ছড়াগুলি প্রধানত 'মিঠেকড়া' সংকলনে স্থান পেয়েছে। সংকলনের পনেরটি ছড়ার মধ্যে 'এক যে ছিল' ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত নয়, বাকী চোদ্দটি ছড়া হিসেবে সার্থক সৃষ্টি। এই সংকলনের বাইবে আরও চাবটি ছড়া রয়েছে।

'মিঠে কড়া'র চোদ্দটি ছড়ার মধ্যে 'মেয়েদের পদবী' বাদে তেরটি ছড়া এবং 'নব জ্যামিতির ছড়া' ও 'ভবিষ্যতে' তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচায়ক। মেয়েদেব পদবী, সুচিকিৎসা, পরিচয়, পত্র প্রভৃতি ছড়ার বিষয়বস্তু নিছক মজার কিন্তু লঘু বা কাঁচা হাতেব সৃষ্টি নয়। ববং বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, অনেকখানি সুকুমার রাযেব ছড়াব মত। মেয়েদেব পদবীব গোলমাল নিয়ে কবি যে কৌতুক অনুভব কবেছেন, কিশোব বন্ধুদের তাই পরিবেশন করেছেন।

'কব' যদি 'করা' হয় 'ধব' হয় 'ধরা'
মেয়েবা দেখবে এই পৃথিবীটা "সরা"।
'নাগ' যদি 'নাগা' হয় 'সেন' হয় 'সেনা',
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা॥

কিংবা 'সুচিকিৎসার'-ব বদ্যিনাথ গ্রাম থেকে সহবে এসে হঠাৎ সর্দ্দি বাধিয়ে ডাক্তারের বিবাট ওষুধের ফর্দ দেখে

পল্লী গ্রামের বদ্যিনাথ অবাক জল ভারী,
সর্দ্দি হলেই এমনতর ? ধন্য ডাক্তাবী !

কিন্তু সমকালাশ্রয়ী বিষয় ভাবনায় বিধৃত ছড়াগুলি বাংলা কাব্যে অভিনব সম্পদ। ঠিক এমনতর ছড়া সমকালে বিরলদৃষ্ট। যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক মার্কেট, অসাধু ব্যবসায়ীদের ভেজাল ব্যবসা, খাদ্যাভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ সুকান্তর ছড়ায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

'খাঁটি জিনিষ' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,

'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।

বা গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো

বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।

'পুরনো ধাঁধা' ছড়ায় শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অমোঘ প্রশ্নটি কবি ব্যক্ত করেছেন যার সমাধান সমাজকে করতেই হবে। সাবলীল এই ছড়ায় কোথাও মতবাদের গুরুভার নেই ববং প্রশ্নটি সার্বজনীন হযে গেছে।

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,

ধনীর পাযেব তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?

'হিংটিং ছট' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,

বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকেব চামড়ায়॥

এই বক্তব্যই আবও গম্ভীর মর্যাদায় ফুটে উঠেছে 'পৃথিবীব দিকে তাকাও' ছড়াটিতে। সমাজের সর্বস্তরে সাধাবণ খেটে খাওযা মানুষেব উপর শোষণেব চিত্রটি সহজ সরলভাবে যেমন উদ্ঘাটিত হযেছে তেমন আশ্চর্য দার্শনিক চেতনাব পরিচয় রয়েছে সেখানে যেখানে কবি শোষক শ্রেণীব দোসব রূপে ধর্ম ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা চিহ্নিত করেছেন।

"পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনে প্রভু

(সুতরাং চুপ . কথা বলবে না কভু)

সকলেরই প্রভু—ভালো আর খারাপেব

তাঁবই ইচ্ছায় এ , চুপ কবো সব ফের।

শিক্ষক বলে, শোনো সব এই দিকে,

চালাকি করো না, ভালো কথা যাও শিখে।

কিন্তু শুধু সমস্যার বিকট চিত্র উপস্থিত করেই কবি ক্ষান্ত হননি, তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিযাব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এব সমাধানও দেখিয়ে দিয়েছেন :

মজুরেব কত স্বাধীনতা ! আব

অজস্র অধিকার।

মজুরের ছেলে ইস্কুলে যায়

জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে,

ছোট ছোট মন ভরে নেয় শুধু

জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে।

মজুরের সেনা লাল ফৌজ' দেয়

পাহারা দিন ও রাত
গরীবের দেশে সইবে না তারা
বড়লোকদের হাত।

বর্তমানের শিশু ও কিশোর ভবিষ্যতের সংগ্রামী নাগরিক তাই 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠক সুকান্ত বালক মনকে প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে দাঁড় করাতে, সমাজ ভাবনায় ভাবিত হতে। ছোট থেকেই গড়ে পিটে মানুষ করতে চেয়েছেন ছেলেদের। ভাবতে অবাক লাগে কিশোর বয়সেই এমন দুর্লভ সামাজিক দায়িত্ববোধ তিনি কীভাবে অর্জন করলেন। কি কবিতা, গল্প বা ছড়া এখানেই কবির স্বাতন্ত্র। তাই সংগ্রামের ময়দান এদেশে যতই প্রসারিত হচ্ছে সুকান্তর সৃষ্টি ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি মানব সমাজের শ্রেণী সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার। এ হাতিয়ার যত তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার হবে ততই শত্রুর বুকে কাঁপন ধরবে এবং মিত্রর বাহুতে শক্তি জোগাবে। সুকান্তর সৃষ্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে তা কত মূল্যবান, কত যুগান্তকারী। কবিতা ছেড়ে মিছিলে বা মিছিল ছেড়ে কবিতার কল্পজগতে নয়, মানুষ কবিতার সঙ্গে মিছিলে যত বেশী করে ও বেশী সংখ্যায় হাঁটছেন তত সুকান্তর কবিতা তাঁদের সঙ্গী হয়ে উঠছে। সুকান্তর কবিতা ও মানুষের জীবন সংগ্রামের মিছিল আজ পরস্পরের সহযাত্রী। এখানেই সুকান্ত সার্থক এবং কবি হিসেবেই সার্থক।